শারীরিক শিক্ষা

ফণিভূষণ বিশ্বাস

Approved by the Education Dept., Govt. of West Bengal

শারীরিক শিক্ষা

ফণিভূষণ বিশ্বাস, এম. এ.
ডিপ্. ইন্ বেসিক্ অ্যাণ্ড ফিজিক্যাল্ এডুকেশন

অ শো ক পু স্ত কা ল য়
প্রকাশক ও পুস্তক-বিক্রেতা
৬৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

ভূমিকা

'সবার উপরে দেহ-ই সত্য'। বিশেষ ক'রে মানুষের ক্ষেত্রে। অনেকদিন পর্যন্ত এই চেতনাই ছিল শিক্ষার অনেকখানি জায়গা জুড়ে। সভ্যতার ইতিহাসে তার নজির আছে। দেহীর কাছে দেহটাই যথাসর্বস্ব, সেটাই ছিল স্পার্টান্ শিক্ষা-নীতি। শরীরটা যে মনের বাহন, সেই মনকে বাদ দিয়ে দেহের কথা ভাবা যায় না। এ তথ্য এথেন্সবাসীরাই প্রথম প্রচার করেছিলেন। শিক্ষার ক্ষেত্রে দেহ-মনের এই যে স্বীকৃতি, সেটাই হচ্ছে যুগান্তকারী চিন্তা-বিপ্লব—ঐতিহাসিক বিবর্তন।

দেহ-মন নিয়েই মানুষ পরিপূর্ণ। দেহটা মনের ধারক হ'লেও, তার চালক কিন্তু মন। এই মনের তালেই দেহ চলে। কাজেই, দেহ-মনকে পৃথক ক'রে কোন শিক্ষাই হ'তে পারে না। এই দেহের সঙ্গে আনুষঙ্গিক অনেক বিষয় জড়িয়ে আছে। সেটা দেহ-মনের ভালো-মন্দের কথা। শারীরতত্ত্ববিদ্‌রা যাকে বলেছেন জীবনের অপরিহার্য তথ্য, শাস্ত্রকাররা তাকেই বলেছেন প্রাণের সম্পদ্। স্বাস্থ্যবিদ্‌রা বলেছেন স্বাস্থ্যতত্ত্ব। এবংবিধ তত্ত্বের বিশ্লেষণ, বিচার-বিবেচনা এবং ঐতিহাসিক আলোচনা আছে গ্রন্থটির মধ্যে।

এ ছাড়া আছে খেলার তত্ত্ব, মনস্তাত্ত্বিক পর্যালোচনা, প্রয়োগ-পদ্ধতির কথা, এমন কি শৈত্য-ক্রীড়া-কৌশলের আলোচনা, পাঠ-পরিকল্পনা, শ্রেণী-পরিচালনা, প্রাথমিক চিকিৎসা এবং শরীর-পালনের যাবতীয় জ্ঞাতব্য তথ্য সন্নিবেশিত করা হয়েছে এই গ্রন্থটিতে।

এই পুস্তকের একাধিক প্রবন্ধ ইতোপূর্বে 'শিক্ষক', 'শিক্ষাব্রতী' প্রভৃতি মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। বাকী চোদ্দ আনাই হালের লেখা।

বাংলা ভাষায় শারীরিক শিক্ষার কোন বই নেই। দু'একটি বাংলা গ্রন্থে ব্যায়াম-তত্ত্ব এবং খেলাধূলার যে আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে, তা স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। সেই প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে গ্রন্থটি বিশেষভাবে রচিত হয়েছে। এ হেন দুরূহ গ্রন্থ প্রণয়নের যে প্রবল ইচ্ছা অনেকদিন আমার সমস্ত চিন্তা জুড়ে ছিল, সেই পুস্তক প্রকাশনের দায়িত্ব গ্রহণ ক'রে শ্রদ্ধেয় প্রকাশক মহাশয় আমাকে কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ করেছেন। সে ঋণ অস্বীকার করবার নয়।

পুস্তকটি রচনার সময় একাধিক ইংরাজী এবং বাংলা বইয়ের সাহায্য নিতে হয়েছে। তাদের তালিকা যথাস্থানে দেওয়া হ'ল।

বইখানি যদি শিক্ষণ-মহাবিদ্যালয়ের ভাবী শিক্ষকদের প্রয়োজন মেটায়, অধ্যাপনার কাজে লাগে, তবেই জানব আমার শ্রম সার্থক হয়েছে।

গ্রন্থকার

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

ধারে কাটে আর ভারে কাটে। প্রবচনটার কথা মনে পড়ছে। যে খেতাব থাকলে কেতাবের ধার বাড়ে, সেটা যখন নেই, তখন নিশ্চয় ভারেই কেটেছে। সে ভার গ্রন্থকারের নয়, খোদ প্রকাশকের। এ হেন শিক্ষার বই যে এত শীঘ্রই দ্বিজ হবে, মুদ্রণ-সূতিকাগারে পুনর্জন্ম লাভ করবে,—এ আশা করিনি। সেই সাফল্যেই আজকের এই ভূমিকার পায়ের নীচে আর সেই অনিশ্চয়তার শূন্যতা নেই, আছে প্রতিষ্ঠার ভিত্তিভূমি। এটাই এর স্বপক্ষের কথা, স্বীকৃতির স্বাক্ষর। এটা কিন্তু বইটির প্রাথমিক পরিচিতি, ঘনিষ্ঠ পরিচয় নয়। আসল পরিচয়ের সূত্র অবয়ব থেকে অন্তরের দিকে বিস্তৃত। আজকের যে মলাট, কেতাবের ললাট-লেখা, তার অবশ্য পরিবর্তন ঘটেনি। তবে আয়তনের বৃদ্ধি আর বিষয়-বিন্যাসে অনেকটা সমৃদ্ধিও ঘটেছে। পরিচ্ছদ-বিন্যাসের দিক থেকেও ঘটেছে কিছুটা রদ-বদল।

ফলে গ্রন্থটিতে যে কেবল পাঠ্য-তালিকার যাবতীয় বিষয়ই আলোচিত হ'ল তা নয়, এর ধার ও ভার বাড়ল অনেকটা। এত দিনেই এ সংস্করণের প্রকৃত সংস্কার হ'ল। আশা করি, গ্রন্থটি এবার সকল শ্রেণীর পড়ুয়াদের কেবল উপযোগী হবে না, প্রয়োজনের দিক থেকেও হবে অপরিহার্য। ইতি—

সাবড়াকোন, বাঁকুড়া
২৮-এ বৈশাখ, ১৩৬৯

বিনীত
লেখক
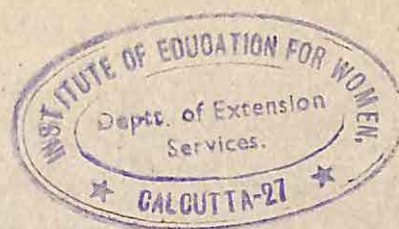
আহরণী

1. An Introduction to Physical Education—J. Sharman
2. Physical Training Programme—J. Buchanan
3. Suggestion on Health Education—His Majesty's Stationery Office, London
4. Athletes in Action—F. A. M. Webster
5. Suggestion for the Improvement of Physical Education in Schools—J. Buchanan
6. Manual of Physical Trining—Superintendent, Govt. Printing, India
7. A Treatise on Hygiene and Physical Health—P. B. Chatterjee
8. Recreation and Physical Fitness—His Majesty's Stationery Office, London
9. Anatomy and Physiology for Nurses—E. C. Pearce
10. Fitness for Elementary School Children through Physical Education—Dauer.
11. আহার ও আহার্য—পশুপতি ভট্টাচার্য
12. লাফাইবার প্রকৃত পদ্ধতি—পঞ্চানন গঙ্গোপাধ্যায়
13. নয়া শিক্ষা—ফণিভূষণ বিশ্বাস
14. শিক্ষা-বিচিত্রা—ফণিভূষণ দে বিশ্বাস
15. এডুকেশন্ কোয়াটার্লি—মার্চ, ১৯৫৮, দিল্লী
16. বিজ্ঞান-প্রবেশিকা—স্থকুমার বস্থ
17. খেলার ছলে ব্যায়াম—কে. এন্. রায়
18. সোভিয়েত ইউনিয়নে স্বাস্থ্য-রক্ষা—সোভিয়েত প্রকাশনী
19. শিক্ষক-শিক্ষণ-সহায়িকা—নারায়ণচন্দ্র চন্দ

———

সূচীপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

চতুর্থ অধ্যায়

শৈত্য-ক্রীড়া ও খেলাধূলা ঃ

———

প্রথম অধ্যায়

শারীরিক শিক্ষা কি?

উদার অর্থে শিক্ষাকে দু'ভাগে ভাগ করা চলে; যথা—শারীরিক ও মানসিক। মানসিক বিকাশ যেমন কেতাবী শিক্ষার উদ্দেশ্য, শারীরিক শিক্ষার আদর্শও তেমনি দৈহিক উৎকর্ষলাভ। শরীরটাই যদি শারীরিক শিক্ষার প্রধান অবলম্বন হয়, তবে কি শরীরী জীবের পক্ষেই শারীরিক শিক্ষা প্রযোজ্য হবে? উদার অর্থে কথাটা সত্য হ'লেও, জীবন সম্বন্ধে সচেতন ক্রমবর্ধমান জীবের পক্ষেই শারীরিক শিক্ষা বিশেষ কার্যকরী; অর্থাৎ, অনুশীলনের শক্তি যার নেই, তার কাছে শরীর-চর্চার কোন মূল্য নেই।

'Physique' অর্থাৎ ঐহিকের অনুশীলনাত্মক কলাকৌশলকেই 'শারীরিক শিক্ষা' বলা চলে। কাজেই, এই দেহের সৌন্দর্য, স্বাস্থ্য এবং শ্রীকে অটুট রাখবার জন্যই প্রয়োজন অঙ্গ-সঞ্চালনের। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যেন এই দেহ-চর্চার আর শেষ নেই—জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে প্রতি মুহূর্তেই চলেছে মানুষের বিরামহীন অঙ্গ-চালনা। এইজন্য শারীরিক শিক্ষার সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে গিয়ে একজন শিক্ষাবিদ্ বলেছেন—"জন্ম থেকে আরম্ভ ক'রে মানুষের সমগ্র জীবনের কার্যকলাপকে 'শারীরিক শিক্ষা'র অন্তর্ভুক্ত করা চলে; অর্থাৎ, ক্রমবর্ধমান শিশুর হাত-পা নাড়া থেকে শুরু ক'রে তার ভাবী জীবনের বিকাশের উপযোগী সমস্ত কার্যাবলীই এর মধ্যে এসে পড়ে।"

কেউ কেউ শারীরিক শিক্ষাকে আরও ব্যাপক অর্থে প্রয়োগ করেছেন। বলেছেন, —'শারীরিক শিক্ষা হচ্ছে সমগ্র জীবনের শিক্ষা।' বৈজ্ঞানিকরা শারীরিক শিক্ষার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন,—'শারীরিক শিক্ষাও মনের সক্রিয় প্রক্রিয়ারদ্বারা নিয়ন্ত্রিত'। সক্রিয় মানসিক প্রক্রিয়া অর্থে তাঁরা Psycho-motor-activities-এর কথা বলেছেন; অর্থাৎ, তাঁরা বলেছেন—'শারীরিকশিক্ষার মধ্যে আছে একটা আত্মিক ও দৈহিক সচল সক্রিয় পদ্ধতি।'

এই কারণে অঙ্গ-সঞ্চালনের সঙ্গে বিজড়িত হয়ে আছে একটা দৈহিক অনুভূতি, একটা মানসিক প্রক্রিয়া এবং কর্মতৎপরতা। কাজেই, যে-কোন অঙ্গ-সঞ্চালনের

সঙ্গে যখন অলক্ষ্যে এত ব্যাপার সংঘটিত হচ্ছে, তখন এই প্রক্রিয়াটি যাতে জীবনের শ্রীবৃদ্ধির সহায়ক হয়, সে-বিষয়ে ভালভাবে আমাদের অবহিত হ'তে হবে। তাই, একজন মনস্তাত্ত্বিক বলেছিলেন—'এই শারীরিক শিক্ষা-ব্যবস্থাকে জৈব বিজ্ঞান-সম্মত এমন নির্ভুল ও কল্যাণকর ক'রে তুলতে হবে যে, ব্যায়ামানুশীলনকারী-মাত্রেই যেন পরম দক্ষতার সঙ্গে সুখে-শান্তিতে জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে পারে; অর্থাৎ, বুঝা যাচ্ছে যে, এই শিক্ষা দ্বারা অনুশীলনকারী যে শুধু কাজকর্মে, দৌড়-প্রতিযোগিতায়, লম্ফনে বা নিক্ষেপণে নিজ নিজ শক্তি-সামর্থ্য বা সুষ্ঠু সামঞ্জস্যময় গতিবিধির পরিচয় দেবে, তা নয়—এই অর্জিত বিদ্যাকে প্রাত্যহিক জীবনের কাজে লাগানোর সুযোগও সে ক'রে নিতে পারবে।

আধুনিক যুগে শারীরিক শিক্ষার সংজ্ঞা পরিবর্তিত হয়েছে। আজকের শিক্ষাবিদ্‌রা শারীরিক শিক্ষার সর্বাত্মক সংজ্ঞা দিয়েছেন। তাঁরা বলেছেন, 'Physical education is the education of the physical, for the physical and through the physical.' অর্থাৎ, শারীরিক শিক্ষা বলতে তাঁরা যে অনুশীলনের আভাস দিয়েছেন, তা অনুষ্ঠিত হবে দেহের মাধ্যমে, ঐহিক কল্যাণের জন্য, দৈহিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে। এককথায়—দৈহিক শ্রম, প্রক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া—সমস্তটা মিলে যে দৈহিক উৎকর্ষ সাধন করবে, সেটাই সত্যিকার শারীরিক শিক্ষা ব'লে পরিগণিত হবে।

শিক্ষাবিদ্‌রা আবার ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে শারীরিক শিক্ষার সংজ্ঞাকে যাচাই ক'রে দেখেছেন। বলেছেন—পৃথিবীতে জীবন আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়েছে শারীরিক শিক্ষা। 'জোর যার মুল্লুক তার'—বিবর্তনবাদীদের মতে এই ছিল জীব-জগতের প্রকৃতি; অর্থাৎ, বীরের মতো যে বেঁচেথাকতে পারবে, বাঁচার অধিকার আছে একমাত্র তারই; যে পরাভূত হবে, পৃথিবীর প্রতিযোগিতায় তার কোন স্থান নেই। কাজেই, টিকে থাকার ব্যাপারে প্রতিযোগিতাই হবে অপরিহার্য। হীনবল বা দুর্বলের পক্ষে বেঁচে থাকাটাই যেন মস্ত বড় অপরাধ! ফলে, হ'ত কি, জীবন-যুদ্ধে জয়লাভ করার জন্য প্রত্যেককে ব্যায়ামানুশীলন করতে হ'ত। সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ যতদিন না গোষ্ঠী বা পরিবারভুক্ত হয়ে একত্রে বসবাস করতে শেখেনি, ততদিন পর্যন্ত এই 'মাৎস্যন্যায়' নীতিই বলবৎ ছিল। পরে অবশ্য শক্তিশালী গোষ্ঠীরা অপেক্ষাকৃত দুর্বল দলের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করেছে। ফলে, 'দেহ', 'দল' বা 'দেশ' রক্ষার জন্য ব্যায়ামানুশীলন অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল।

কাজেই এখন বুঝা যাচ্ছে যে, দেহটাই শারীরিক শিক্ষার প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়; অর্থাৎ, দৈহিক বিকাশই শারীরিক শিক্ষার লক্ষ্য। শরীর-পালনের

এই নীতিটা প্রত্যেক মানুষের ধর্মও বটে। সংস্কৃত শাস্ত্রকাররা তাই বলেছেন যে, 'শরীরমাদ্যং খলু ধর্মসাধনম্।' বেদ ও উপনিষদে শরীর-চর্চার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। আবার, বেদের মধ্যে বলা হয়েছে—'শরীরং মে বিবর্ষনম্'—অর্থাৎ, "আমার শরীরকে যেন দৃঢ় করতে পারি।" উপনিষদ্ ও শরীর-চর্চার মধ্যে মহত্তর কল্যাণকর আদর্শকে দেখেছেন। তাই আদর্শের কথা উল্লেখ-প্রসঙ্গে উপনিষদে বর্ণিত হয়েছে—'অশিষ্ঠো দ্রড়িষ্ঠো, বলিষ্ঠো, মেধাবী'—অর্থাৎ, প্রত্যেক মানুষের আদর্শে হবে বলিষ্ঠ দেহ, সুতীক্ষ্ণ হওয়া চাই তার মেধা, সমগ্র বিশ্বকে শাসন করতে পারে—এমন তেজ সঞ্চয় করা চাই। কাজেই বুঝা যাচ্ছে, শরীর-চর্চা মানুষের অবশ্যপালনীয় ধর্ম। দেহের সঙ্গে মনকেও সংযত ও নিয়ন্ত্রিত ক'রে তুলতে হবে এবং এটাও শরীর-সাধনার আর একটা দিক। বিবেকানন্দ তাই বলেছেন—'আমি চাই এমন লোক, যাদের শরীরের পেশীসমূহ লোহার মত দৃঢ় ও স্নায়ু ইস্পাত-নির্মিত হবে, আর তাদের শরীরের ভেতর এমন একটি মন বাস করবে—যা বজ্রের উপাদানে গঠিত।' দেহ ও মনের উৎকর্ষ-সাধন ছাড়াও যে শারীরিক শিক্ষার আরও গভীর লক্ষ্য আছে, সে-কথা উল্লেখ-প্রসঙ্গে ডেস্‌লার বলেছেন—'The greatest asset of an individual, as well as of the state, *is trained intelligence, controlled by high moral ideals, and made effective and sane through vigorous physical powers.*' অর্থাৎ, শরীর-চর্চার মধ্য দিয়ে দৈহিক শক্তি যখন কার্যক্ষম, তেজস্বী এবং দৃঢ় হয়, তখন শিক্ষিত বুদ্ধিবৃত্তি, উচ্চ নৈতিক আদর্শ-নিয়ন্ত্রিত চেতনাই ব্যক্তি—এমনকি রাষ্ট্রের মহান সম্পদ্ হয়ে উঠে। কাজেই, শারীরিক উৎকর্ষতার সঙ্গে নৈতিক চেতনা, দৈহিক সুস্থতা, কার্য-ক্ষমতা এবং বুদ্ধিবৃত্তি ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত। তাই, 'শারীরিক শিক্ষার লক্ষ্য কি' বিশ্লেষণ করতে গিয়ে জন লক বলেছেন যে, 'দেহকে শক্তিশালী ক'রে তোল, তবেই সে মনের নির্দেশ মেনে চলবে।' সুস্থ দেহ ও মন অর্থনৈতিক দিক থেকে যদিও সামান্য, কিন্তু সুখ-স্বস্তির মাপকাঠিতে এই অবস্থা একান্ত কাম্য ; এবং ঐশ্বর্যহীন হয়েও সেই-ই কিন্তু একান্ত সুখী। এ দুটোই যার আছে, জগতে তার আকাঙ্ক্ষার কি আছে ? কিন্তু এ দুটোর একটা যার নেই, সে যতই ঐশ্বর্যশালী হোক না কেন, জগতে তার চেয়ে অসুখী কে ? তাই তিনি মন্তব্য করেছিলেন, যার মানসিক প্রজ্ঞা সত্য পথের নির্দেশ দেয় না, সে কখনো ধ্রুব পথের সন্ধান পায় না ; আর যে দেহ দুর্বল ও পঙ্গু, তার দৈহিক শ্রীবৃদ্ধি ও মানসিক শান্তি কোথায় ? রুশো-ও লকের কথারই প্রতিধ্বনি ক'রে বলেছেন—'মনের নির্দেশ মানতে হ'লে দেহকেও শক্তিশালী ক'রে তুলতে হয়।' ভালো চাকরের ক্ষেত্রে যেমন শারীরিক উৎকর্ষই কাম্য, মানব-দেহের বেলায়ও সে-কথা খাটে। কারণ,

'Weaker the body, the more it commands ; the stronger it is, the better it obeys.' তিনি আরো বলেছিলেন যে, ছাত্রদের মেধা-শক্তিকে বাড়াতে হ'লে, তাদের অন্তর্নিহিত সুপ্ত শক্তিকে জাগ্রত ক'রে তুলতে হবে ; ব্যায়ামানুশীলনের দ্বারা শরীর যখনই মজবুত এবং নীরোগ হয়ে উঠবে, তখনই মন হয়ে উঠবে সুস্থ সবল এবং বৃদ্ধি পাবে তার জ্ঞান ও বিচার-শক্তি। তাই তিনি বলেছিলেন যে, দেহকে দাও নিরবচ্ছিন্ন কর্মতৎপরতা ও অবিরাম গতি, তবেই তো তার মননশীলতা হবে অদম্য, প্রাণ হবে অফুরন্ত শক্তির উৎস। তিনি আরও মনে করতেন যে, শারীরিক ও মানসিক শিক্ষার যোগসূত্র এমনই নিগূঢ় যে, তাদের মধ্যে ভেদরেখা টানা কঠিন। কারণ, দৈহিক অনুশীলন যে কোন্ পর্যায়ে এসে মানসিক প্রবৃত্তিতে রূপান্তরিত হয়, তা নির্ণয় করা মুশ্‌কিল ব্যাপার।

মাইকেল ডে মণ্টেজিন-ও শারীরিক ও মানসিক শিক্ষার মধ্যে কোন পার্থক্য খুঁজে পাননি। তাই তিনি বলতেন, আমরা কার শিক্ষার ব্যবস্থা করছি—দেহের, না আত্মার ? আত্মিক ও ঐহিক শিক্ষার পৃথক ব্যবস্থা করা ঠিক নয় ; কারণ, আমরা চাই সমগ্র মানুষের শিক্ষা। কাজেই দেহ ও মনের মধ্যে ভেদরেখা টানা নিরর্থক। প্লেটো-ও বলেছেন যে, দেহকে বাদ দিয়ে মন বা মনকে বাদ দিয়ে দেহের অস্তিত্ব সম্বন্ধে চিন্তা করতেই আমরা অভ্যস্ত নই। শরীর এবং আত্মা পৃথক নয়, অভিন্ন।

অনেকের মনেই শারীরিক শিক্ষার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বিশেষ কোন ধারণা নেই। কাজেই, তাঁরা ফিজিক্যাল কাল্‌চার এবং শারীরিক শিক্ষাকে অভিন্ন ক'রে দেখেন। আসলে কিন্তু ও দুটোর মধ্যে আদর্শগত পার্থক্য আছে। কারণ, ফিজিক্যাল কাল্‌চারিস্টরা মনে করেন যে, মাংসপেশী-পরিপুষ্ট বিপুল আয়তন দেহ নির্মাণ ক'রে তোলাই হচ্ছে ব্যায়ামানুশীলনের প্রধান লক্ষ্য। দেহটাকে এমনিই দর্শন-ধারী ক'রে তুলতে হবে যে, দর্শকমাত্রেই তা দেখে তারিফ করবে ; 'রামমূর্তি' বা 'গামা' হয়ে এমন শক্তির কসরৎ দেখাতে হবে যে, দর্শকদের তাক্ লেগে যাবে, তবেই না বাহাদুরি ! শারীরিক শিক্ষা কিন্তু এই ধরনের বিস্ময়কর শক্তির পরিচয় দেওয়ার কথা বলে না। কাজেই, এর মধ্যে অমন বাহাদুরির বাহুল্য নেই। শারীরিক শিক্ষা বুকের ছাতি মেপে, হাতের গুলো দেখে কাউকে যথার্থ সক্ষমতার 'সার্টিফিকেট' দেয় না। বরং বিচারের নিক্তিতে ওজন ক'রে দেখে, শক্তির পরীক্ষায়, সহনশীলতায়, কর্মতৎপরতায় কে কতখানি যোগ্যতা অর্জন করেছে। যারা ঐ পরীক্ষায় সগৌরবে উত্তীর্ণ হতে পারবে, বৈজ্ঞানিক বিচারে তারাই কিন্তু যোগ্য বিবেচিত হবে। গত মহাযুদ্ধের সময় হিটলার এই সত্যটি আবিষ্কার করেন। তিনি

বিরাট দেহধারী ব্যায়ামবীরদের যুদ্ধে নিয়োগ ক'রে দেখেছিলেন যে, কর্মতৎপরতায়, ক্ষিপ্রতায় তারা একেবারে অচল ; অথচ তার চেয়ে হীনবল কিন্তু সুস্থ সবল একজন ফুটবল খেলোয়াড়কে দিয়ে অনেক বেশী কাজ পাওয়া যায়। আজকের শারীরিক শিক্ষাবিদ্‌রাও হিটলারের মত-ই সমর্থন করেন। কাজেই, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে—উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যের নিরিখে—শারীরিক শিক্ষার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়েছে।

———

শারীরিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা কেন ?

'মনের জন্য যেমন গান, দেহের জন্য তেমনি ব্যায়ামের প্রয়োজন'—এটা প্লেটো-র অভিমত। শিক্ষার দিক থেকে কথাটার যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। সম্যক্ শিক্ষা বলতে যে দেহ ও মনের অনুশীলন বুঝায়, এ কথাটাই এখনও আমাদের দেশে অনেকে মানতে চান না। কিন্তু তাঁরা ভুলে যান যে, শারীরিক শিক্ষাটাও সাধারণ শিক্ষা-ব্যবস্থার অবশ্য-প্রয়োজনীয় এবং অপরিহার্য অঙ্গ। তাই দেহ ও মনের সমতা রক্ষা করাই শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য। কাজেই, একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটি অপূর্ণ। যে দেহের সঙ্গে মন বিকশিত হয়ে উঠে, স্নায়ু সক্রিয় সজীব হয়, অনুভূতি ও উপলব্ধি জাগে, সে দেহকে অবহেলা করলে, দেহ থেকে মনের অবনতি ঘটবেই। কারণ, ইন্দ্রিয়, মন, স্নায়ু সমস্ত শক্তির আধারই তো দেহ। কাজেই, দেহের ভালো-মন্দের উপর জৈবিক প্রক্রিয়ার সমস্ত কিছু নির্ভর করে। এইজন্য যে দেহে নিত্য ব্যাধি, সে দেহাশ্রয়ী মনেও অনন্ত আঁধি! এই সত্য স্মরণ ক'রেই প্লেটো দেহ ও মনের শিক্ষা-ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করেছিলেন।

কাজেই, দেহকে বাদ দিয়ে কেবল মনের পরিচর্যা করা মূর্খতা। যেখানে সে প্রচেষ্টা হয়েছে, সেখানে শিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়েছে। সম্যক্ বিকাশই যখন শিক্ষার লক্ষ্য, তখন কোন ক্রমেই দেহকে বাদ দেওয়া চলে না। যাতে স্বাভাবিক এবং সঙ্গত উপায়ে দেহ ও মনের সমস্ত উপাদান ও গুণাবলী পরিণতি লাভ করে, যাতে সুস্থ দেহে সবল মন আশ্রয় নিতে পারে, সে বিষয়ে অবশ্যই শিক্ষাবিদ্‌দের চিন্তা করতে হবে। ভাবতে হবে যে, বাঁচার মতো ক'রে বাঁচতে পারলেই তো জীবনের উদ্দেশ্য, সেবা ও সাধনা পর্যাপ্ত জীবনী-শক্তির প্রাচুর্যের মধ্য দিয়ে সাধনা করা যায়। স্বল্প পরমায়ু আর নিত্য-ব্যাধি-জর্জরিত দেহ নিয়ে কি জীবনের চতুর্বর্গ ফল লাভ করা যায় ? কখনই না। কাজেই, 'শরীরমাদ্যং খলু ধর্মসাধনম্'-ই প্রত্যেকের প্রথম এবং প্রধান কর্তব্য হওয়া উচিত।

এখন বিচার ক'রে দেখা যাক, শরীর-চর্চার মধ্য দিয়ে আমরা কতটুকু লাভবান হই। প্রথম কথা, জীবনের স্নায়বিক, আন্ত্রিক গতিধর্মকে অঙ্গ-সঞ্চালনই সক্রিয় সতেজ রাখে। যতক্ষণ দেহাভ্যন্তরের এই গতি-প্রবাহ সক্রিয় থাকে, ততক্ষণ শরীরে কোন বিকার দেখা দেয় না। কিন্তু যখনই কোন স্নায়ু দুর্বল হয়ে পড়ে, তখনই ব্যাধিরূপ নানা উপসর্গ দেহে আত্ম-প্রকাশ করে। কাজেই বোঝা যাচ্ছে যে, স্নায়বিক ও পৈশিক কর্মতৎপরতাই হচ্ছে আন্ত্রিক শক্তির উৎস। শুধু তাই নয়, শারীরিক স্বাস্থ্যই জীবনের ভাবাবেগকে নিয়ন্ত্রিত ও সুগঠিত করে। তাই শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য কি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে অধ্যাপক জেমস্ বলেছিলেন—'সমস্ত শিক্ষা-ব্যবস্থায় এটাই মস্ত বড় কাজ হবে, আমাদের স্নায়বিক প্রক্রিয়াকে জীবনের বন্ধুরূপে পাওয়ার ব্যবস্থা করা, শত্রুরূপে নয়।'

কারণ, স্নায়বিক সক্রিয়তার উপরই দৈহিক স্বাস্থ্য নির্ভর করে অনেকখানি। **পৈশিক ও স্নায়বিক সুস্থতাই ইন্দ্রিয়সমূহকে সক্রিয় ও সজাগ ক'রে তোলে। দেহের এই সম্যক্ পরিপুষ্টি, গঠন এবং সুস্থতার জন্য প্রয়োজন নিয়মিত ব্যায়াম, পরিমিত আহার ও উপযুক্ত বিশ্রাম।** ব্যায়ামের দ্বারা যখন এর সমতা রক্ষা হয়, তখনই মানুষ লাভ করে স্বাস্থ্য, সুখ, সামর্থ্য এবং চরিত্র। কাজেই, শারীরবৃত্তিক গঠন যাতে শরীর-বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে স্বাভাবিকভাবে বিকাশ লাভ করে, সেজন্য ব্যায়ামানুশীলনের বিশেষ প্রয়োজন। সুস্থতা থেকেই **মানসিক আচরণ**, সামাজিক মনোভাব গড়ে উঠে। তাই স্বাস্থ্য, সুখ, শক্তি এবং চরিত্রকেই শরীর-বিজ্ঞানের প্রধান লক্ষ্য ব'লে মেনে নেওয়া হয়েছে। কাজেই, বিজ্ঞান-সম্মত শারীরিক শিক্ষা শিশু, যুবক এবং সকল মানুষের পক্ষেই একান্ত বাঞ্ছনীয়।

প্রত্যেক মানুষের একটা শারীরিক ভিত্তি আছে। শারীরিক ভিত্তিকে অটুট রাখার জন্য শরীর-চর্চার বিশেষ দরকার। যে শরীর জীবনের ভিত্তিভূমি, সেই বনিয়াদকে অবশ্যই দৃঢ় ও সুগঠিত রাখতে হবে। তা হ'লে অবশ্যই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সঞ্চালনের দ্বারা দৈহিক পরিপুষ্টি সাধন করতে হবে। এ ক্ষেত্রে কোন অঙ্গকেই অবহেলা করা চলবে না ; কারণ, যে অঙ্গকে অবহেলা করা হবে, সে অঙ্গ নিশ্চয় দুর্বল, অপটু হয়ে পড়বে। তাই জীব-বিজ্ঞানের মতে, দৈহিক বিকাশের জন্য ব্যায়ামের একান্ত প্রয়োজন। আমরা জানি, যার জীবনী-শক্তি যত বেশী, তার যোগ্যতা ও ক্ষমতা তত।

বর্তমান যুগে জীববিদ, মনস্তাত্ত্বিক এবং শিক্ষাবিদ্‌মাত্রেই শরীর-চর্চার প্রয়োজনীয়তার কথা উপলব্ধি করেছেন। তাঁরা বলেছেন, স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও বিকাশের জন্য প্রত্যেক

শিশুর তিন থেকে পাঁচ ঘণ্টা পর্যন্ত কোন-না-কোন কাজ করা দরকার। শারীরিক শিক্ষা যে কেন অপরিহার্য, তা বলতে গিয়ে শিক্ষাবিদ্‌রা নিম্নলিখিত ছ' প্রকার প্রয়োজনের কথা বলেছেন। যথা—

(১) আন্ত্রিক বিকাশ ও স্বাভাবিক বৃদ্ধির উন্নতির জন্য ;

(২) স্বাস্থ্য-রক্ষা ও শরীর-পালনের জন্য ;

(৩) উপযুক্ত সহনশীলতা ও শক্তি অর্জনের জন্য ;

(৪) দেহ-কাঠামোকে দৃঢ় ও সুগঠিত করার জন্য ;

(৫) স্নায়বিক ও পৈশিক বিকাশ-জনিত নির্ভুল,সুষম, সক্ষম অঙ্গ-সঞ্চালনের জন্য ;

(৬) ইন্দ্রিয় ও জীবনী-শক্তি বৃদ্ধির জন্য।

এ ছাড়া, শারীরিক শিক্ষার সামাজিক সুফলও আছে। সামাজিক সু-অভ্যাস, স্বাস্থ্যকর আচরণ একজন সুস্থ সবল স্বাভাবিক মানুষের কাছ থেকেই আশা করা যায়। শরীর-চর্চার পরোক্ষ ফলস্বরূপ মানুষ যে কি কি সদ্‌গুণ অর্জন করে, শিক্ষাবিদ্‌রা তার একটা লম্বা ফিরিস্তি দিয়েছেন। যথা—(ক) আনুগত্য, (খ) সম্মান, (গ) নেতা হওয়ার যোগ্যতা, (ঘ) জয়-পরাজয়ে সমভাব, (ঙ) খেলায় সাধুতা, (চ) খেলোয়াড়ী মনোভাব, (ছ) সাধুতা ও নাগরিক যোগ্যতা, (জ) আত্ম-বিশ্বাস, (ঝ) আত্ম-সংযম, (ঞ) সতর্কতা, (ট) অগ্রণী হয়ে দায়িত্ব গ্রহণ করার ক্ষমতা, (ঠ) আত্ম-বিশ্বাস, (ড) আত্ম-রক্ষা, (ঢ) সিদ্ধান্ত, (ণ) সহযোগিতা এবং (ত) সাহস। অর্থাৎ, ব্যক্তিগতভাবে যখনই এই গুণাবলী বিকশিত হয়ে উঠবে, তখনই পরোক্ষভাবে ব্যক্তি থেকে সমাজ উপকৃত হবে। কাজেই, নানা দিক থেকে চিন্তা ক'রে শিক্ষাবিদ্‌রা শারীরিক শিক্ষার প্রয়োজন, সম্ভাবনা এবং পরিণতির কথা বলেছেন। এদিক থেকে বিচার করলে শারীরিক শিক্ষার সর্বাত্মক প্রয়োজনের কথা কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না।

———

শারীরিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও আদর্শ

কেন্দ্র-বিন্দু (goal), উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য—এই তিনটি কথা একই অর্থে বহু লোকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন। শব্দগুলির মধ্যে অর্থগত সাদৃশ্য বা সঙ্গতি থাকলেও, প্রয়োগের দিক থেকে শব্দগুলির অর্থভেদ আছে। সেই দিক থেকে বিবেচনা ক'রে নিম্নলিখিত অর্থে শব্দগুলির প্রয়োগ বাঞ্ছনীয়।

লক্ষ্য হচ্ছে সেই সাধারণ ব্যাপক ও প্রধান বিষয়-বস্তু, যেদিকে সমস্ত শিক্ষাধারাই পরিচালিত হয়। উদ্দেশ্যের অর্থ আরো সুনির্দিষ্ট এবং সবিশেষ, যা কেবল শিক্ষার লক্ষ্যপথ দেখিয়ে দেয় না; পরিণতিতে পৌঁছে দেয়। লক্ষ্যস্থান বা কেন্দ্র-বিন্দু কেবল সবিশেষ নয়, আরও সুনির্দিষ্ট এবং স্পষ্ট, যা একাধিক উদ্দেশ্য সাধনে সাহায্য করে না, লক্ষ্যে নিয়ে যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, হার্বার্ট স্পেন্সারের কথা ধরা যাক। 'সম্যক্ বাঁচাটাকেই' তিনি শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য ব'লে অভিহিত করেছেন। এটা অবশ্য শিক্ষার একটি অপরিহার্য উদ্দেশ্য। সেই সম্যক্ জীবন, যার কর্ম ও অবকাশ—সমস্তটুকুকেই সার্থকতায় ভরিয়ে তোলা প্রয়োজন। সে কারণ অবসর-বিনোদনের সুব্যবস্থার জন্য প্রস্তুতির দরকার। কারণ, দুর্বিষহ অবকাশ যদি জীবনকে বিষময় ক'রে তোলে, তবে সম্যক্ সার্থক বাঁচার অর্থই কি ব্যর্থ হবে না ?

শিক্ষার প্রকৃতি :

অভিজ্ঞতাই শিক্ষার প্রথম স্তর। কেতাবী ও ব্যবহারিক শিক্ষারও সূত্রপাত অভিজ্ঞতা থেকে। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার মূল্য আরও বেশী। ভালো সাঁতার যে জানে, জলে নামার অভ্যাস যার আছে, তার পক্ষে ডাইভ্ দেওয়া বা ওয়াটার-পোলো খেলাটা তেমন কঠিন নয়। কারণ, পূর্ব অভিজ্ঞতা এবং পরিণত অভ্যাসের গুণেই মানুষ নূতন নূতন অনুশীলনগুলিকে কাজে লাগাতে পারে, এবং যে-কোন উপস্থিত পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। সেটাই হচ্ছে অভিজ্ঞতার ব্যাপ্তি, পরিণতি এবং সর্বোপরি ব্যবহারিক শিক্ষা। জন ডিউয়ি তাই শিক্ষার সংজ্ঞা নিরূপণ করতে গিয়ে বলেছেন যে, শিক্ষা হচ্ছে অভিজ্ঞতা-পুনর্গঠনের এমন একটি নিরবচ্ছিন্ন ধারা, যার দ্বারা সমাজ-চেতনা গভীরতম পরিব্যাপ্তি লাভ করে। পরোক্ষভাবে অনুসৃত পদ্ধতির উপর ব্যক্তিবিশেষের অধিকার জন্মে। এই সংজ্ঞা থেকে সিদ্ধান্ত করা যায় যে, জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আহৃত অভিজ্ঞতার যে সমষ্টি, সেটাই তার ব্যক্তি-জীবনের শিক্ষা। শারীরিক শিক্ষার অধিকাংশ অনুশীলনই ব্যবহারিক ; অর্থাৎ, বহিরঙ্গের ব্যাপার। মাঠে,

ময়দানে, জলাশয়ে, শিবিরে, এমন কি অরণ্যেও শারীরিক শিক্ষার ক্ষেত্র সুবিস্তৃত। কাজেই, বৃহৎ অর্থে শারীরিক শিক্ষাকে গ্রহণ করা সমীচীন হবে।

শারীরিক শিক্ষাই ক্ষেত্রজ শিক্ষা :

শারীরিক শিক্ষার বিচরণ-ক্ষেত্র এতই বিস্তৃত এবং ব্যাপক যে, এই শিক্ষার সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য একাধিক বিভাগের প্রয়োজন। পরিকল্পনা অনুসারে প্রত্যেক নির্দেশনামা কার্যকরী করার নিমিত্ত বিভাগীয় খেলাধূলার সুব্যবস্থা প্রয়োজন।

এই ক্ষেত্রজ শিক্ষার ধারা মানুষের সেই জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করতে চায়, যেগুলি মধ্যে আছে সামাজিক শিক্ষা, শারীরবিজ্ঞান, জীব-বিদ্যা, বৃত্তি-শিক্ষা, শারীরবৃত্ত এবং আরও বিচিত্র শিক্ষার ধারা। এই শিক্ষার ক্ষেত্র এমনই ব্যাপক যে, এর প্রত্যেকটি বিষয়ের সঙ্গে বিজড়িত আছে আরও কত না সংখ্যাতীত বিষয়। চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালন-ব্যবস্থায় তার আভাস পাওয়া যায়। সেখানকার পাঠ্যক্রমের বিভাগগুলি নিম্নরূপ :—

মানবধর্মীয় বিভাগ—এর অন্তর্ভুক্ত ভাগগুলি হচ্ছে, যথাক্রমে দর্শন, আর্ট, তুলনামূলক মানব-ধর্ম, প্রাচ্য দেশীয় ভাষা, শারীরবিজ্ঞান প্রভৃতি।

সমাজ-বিজ্ঞান বিভাগ—এর মধ্যে আছে মনস্তত্ত্ব, শিক্ষা, রাজনীতি, অর্থনীতি, ইতিহাস, সমাজ-বিজ্ঞান, মানব-বিজ্ঞান, ভূবিদ্যা প্রভৃতি।

শারীরিক বিজ্ঞান বিভাগ—এর মধ্যে আছে গণিত-শাস্ত্র, শারীরবৃত্ত, রসায়ন-পদার্থ-বিদ্যা, সামরিক শিক্ষা প্রভৃতি।

জীব-বিদ্যা বিভাগ—এর অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে উদ্ভিদ-বিদ্যা, প্রাণি-বিদ্যা, শারীর-বিজ্ঞান, শরীর-চর্চা, শারীরবৃত্ত, স্বাস্থ্য-বিদ্যা এবং স্বাস্থ্য-পরিশোধনী বিভাগ, জীবাণু-তত্ত্ব-বিদ্যা প্রভৃতি।

এক কথায়, সমগ্র সুস্থ সবল জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে যা যা প্রয়োজন, একাধারে তার সমস্ত কিছুই আছে শারীরিক শিক্ষার বৃহত্তর ক্ষেত্রে। তাই অনেকেই বলেছেন আত্ম-নিয়ন্ত্রিত অনুশীলনের দ্বারাই ব্যক্তি-শিক্ষা সম্যক্ ও স্বাভাবিক হ'তে পারে। কলম্বিয়া শিক্ষণ-মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক গুড্উইন শারীরিক শিক্ষার সাতটি পর্যায়ের কথা উল্লেখ করেছেন। সেগুলি হচ্ছে, যথাক্রমে (১) স্বাস্থ্য, (২) ব্যক্তিগত সম্পর্ক, (৩) পেশা-শিক্ষা, (৪) অর্থ এবং সরঞ্জাম, (৫) সমাজ-ব্যবস্থা, (৬) চিত্ত-বিনোদনের ব্যবস্থা এবং (৭) বিশ্ববোধের তাৎপর্য। কোন নিয়ন্ত্রিত শ্রেণীতে এই শিক্ষা দেওয়া হবে না, আত্ম-প্রচেষ্টা দ্বারাই শিক্ষার্থীরা সমস্ত কিছুই শিক্ষা করবে।

শারীরিক শিক্ষার ব্যবহারিক রূপ ঃ

ডক্টর ওয়াট্‌সন্‌ শারীরিক শিক্ষার একটা চমৎকার ব্যবহারিক দিকের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে, শারীরিক শিক্ষা যদিও সাধারণ শিক্ষারই একটি অংশ, তথাপি শারীরিক শিক্ষা বিশেষ অর্থে জীবন-পরিস্থিতির অভিমুখী। জীবনের শ্রীবৃদ্ধির জন্য যা-কিছুর প্রয়োজন—শ্রম, সাধনা, ব্যবস্থাপনা, এমন কি চলাফেরা পর্যন্ত—সেই ব্যবহারিক দিকটাই শারীরিক শিক্ষার অনুশীলন-ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রকট। অবশ্য, গতানুগতিক বিদ্যালয়ে শারীরিক শিক্ষার যে নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা আছে, তার মধ্যে স্বাভাবিক প্রবণতার কিছুটা সুযোগ থাকলেও, তাতে যে দুর্বিষহ কৃত্রিমতা আছে, তা স্বাভাবিক জীবন-বিকাশের পরিপন্থী। কিন্তু যে পরিস্থিতির মধ্যে শিশুরা আপনা থেকে স্বাস্থ্য-নীতির সমস্যাগুলি সমাধান করছে, চিত্ত-বিনোদনের যে স্বাভাবিক পথ বেছে নিচ্ছে, সেখানে শিক্ষক উপদেষ্টা বা পরিচালক-মাত্র। সেখানেই শিক্ষা চলছে শিশুর দেহ-মনের সঙ্গে অভিন্ন হয়ে। ফলে, সেখানে স্বাস্থ্য-নীতির সেই কথাটা 'health is healthy living and not a subject to be taught' আরও স্পষ্ট, আরও সত্য এবং প্রাণবন্ত হয়ে উঠছে। কারণ, জ্ঞান যখন ধ্যানে রূপ পায়, মন থেকে দেহে ছড়িয়ে পড়ে, তখন আর তা নিছক অনুধাবন নয়—অনুশীলন। বচনে আর আচরণে যে ভেদ, সেটাই শারীরিক শিক্ষার অন্যতম ব্যবহারিক বৈশিষ্ট্য।

এই শিক্ষার আর একটি বড় সুবিধা এই অভ্যাসের দ্বারা শেখার যে অনন্য-সাধারণ সুযোগ মেলে, তার মাধ্যমে যে সত্য অভিজ্ঞতা লাভ হয়, সেগুলি যেমন প্রত্যক্ষ, তেমনি অর্থপূর্ণ। ভবিষ্যতে কাজে লাগবে এই আশায় কোন বিমূর্ত (abstract) বিষয়-বস্তু এখানে অধ্যয়ন করতে হয় না; তার পরিবর্তে উপস্থিত পরিস্থিতির মধ্যে এমন আচরণ অভ্যাস করতে হয়, যার দ্বারা প্রাসঙ্গিক সমস্যা-গুলির কেবল সমাধান হ'তে পারে তা নয়, বর্তমান জীবনের উপযোগী এবং বিশেষ কার্যকরী হ'তে পারে।

ছেলেরা যখন তন্ময় হয়ে খেলা করে, তখন ইচ্ছা করলে যে-কোন যোগ্যতা-সম্পন্ন শিক্ষক ছাত্রদের মধ্যে এমন কতকগুলি বাঞ্ছিত আচরণ শিক্ষা দিতে পারেন, যেগুলি দ্বারা তাদের ভবিষ্যৎ জীবন নিয়ন্ত্রিত হ'তে পারে। সেই প্রাসঙ্গিক শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে দলীয় সাথীদের প্রতি শিশুর যে সাধু ব্যবহার, সকলের প্রতি—প্রতিপক্ষ, বিচারকমণ্ডলী এবং দর্শক—যে বন্ধুত্বের ভাব, সেটা থেকেই শিশুর মনে সশ্রদ্ধ ভাব জাগতে পারে। সেই মনোভাবের মাধ্যমে আরও কতকগুলি সু-

অভ্যাস গঠিত হ'তে পারে। যথা—খেলার মধ্যে যে সমস্যার উদ্ভব হবে, সেগুলির সুরাহা করা ; তা ছাড়া, এমন সুনির্দিষ্ট এবং বুদ্ধিদীপ্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা জন্মাতে পারে, যেগুলি সমস্ত আবেগ ও সংস্কারের ঊর্ধ্বে থেকে যুক্তিপূর্ণ এমন আচরণের নির্দেশ দেবে, যা জীবনকে সমৃদ্ধ করবে। এই দৃষ্টিভঙ্গীর পরিপ্রেক্ষিতে কিল্-প্যাট্রিক শারীরিক শিক্ষার একটা সন্তোষজনক সংজ্ঞা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেছেন, শারীরিক শিক্ষা হচ্ছে এমন একটি শিক্ষা-পন্থা—যার মধ্যে আছে বাস্তব অভিজ্ঞতা-সঞ্জাত সেই চঞ্চল ভঙ্গীর (motor activities) ক্রিয়া-কলাপ,—যার প্রধান বিষয়-বস্তু হবে আচরণ-পদ্ধতি। এই প্রসঙ্গে হপ্‌কিন্‌স্ শারীরিক শিক্ষার চতুর্বিধ লক্ষ্যের কথা উল্লেখ করেছেন। তার প্রথম সূত্রে শিক্ষাকে গ্রহণ করা হয়েছে সাংস্কৃতিক চর্চা হিসাবে। দ্বিতীয়তঃ, এক কথায় শিক্ষাকে বলা হয়েছে শৃঙ্খলা। তৃতীয়তঃ, বলা হয়েছে, শিক্ষা অর্থে বোঝায় বিকাশ অথবা খাপ খাইয়ে নেওয়া। চতুর্থতঃ, শিক্ষা হচ্ছে জীবনের জন্য প্রস্তুতি।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শিক্ষার লক্ষ্য ঃ

শিক্ষার লক্ষ্য অনেকটা রাষ্ট্রীয় নীতির অনুগামী। তাই গণতন্ত্রের শিক্ষা-ব্যবস্থা একতান্ত্রিক রাষ্ট্র থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। প্রথমটির লক্ষ্য সর্বসাধারণের দিকে। নিজ নিজ বুদ্ধি, শক্তি ও সামর্থ্য অনুসারে যাতে রাষ্ট্রের প্রত্যেকটি ব্যক্তির বিকাশ-সাধন ঘটে, তা হবে শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য। 'শিক্ষা-সুযোগের-সমতা' গণতন্ত্রের আর একটি উদ্দেশ্য। অন্যপক্ষে, একতান্ত্রিক রাষ্ট্র চায় জনসাধারণকে একই ধরনে, গড়নে এবং বিশ্বাসের ছাঁচে ঢালাই করতে। সেখানকার রাষ্ট্র-ব্যবস্থা অনেকটা জোর ক'রেই ব্যক্তিগত পার্থক্য ও প্রাধান্যের কথা অস্বীকার করে। তা সত্যিকার শিক্ষা-নীতির সম্পূর্ণ পরিপন্থী। আজ শিক্ষিতমহলে এই সত্য স্বীকৃতি পেয়েছে ব'লেই শিক্ষাদর্শের দ্রুত পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। তথাপি ব্যক্তি তথা সমাজের মঙ্গলের জন্য যে ব্যক্তি-বিকাশের প্রয়োজন, যে আয়োজন ও ব্যবস্থার দরকার, সেটা যেন আজও ছাত্র ও শিক্ষকমহলে ক্ষেত্রবিশেষে অবহেলিত হচ্ছে। তাই গণতান্ত্রিক শিক্ষার উদ্দেশ্য কি হওয়া উচিত, তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে একজন শিক্ষাবিদ্ বলেছেন, গণতান্ত্রিক শিক্ষা-ব্যবস্থা—বিদ্যালয় এবং তার বাইরে—এমন হওয়া উচিত যে, তাতে যে কেবল রাষ্ট্রের প্রত্যেকটি ব্যক্তির আদর্শ, অনুরাগ ও অভ্যাস অনুযায়ী জ্ঞান বিকশিত হবে তা নয়, সে সমাজে নিজের মতো যে স্থান ক'রে নেবে, সেই অবস্থায় থেকেও সে নিজেকে এবং সমাজকে এমনভাবে গড়ে তোলার চেষ্টা করবে, যাতে সে প্রচেষ্টার সমস্তটাই মানুষকে চিরন্তন মঙ্গলের দিকে নিয়ে যাবে।

শারীরিক শিক্ষার প্রতিপাদ্য বিষয়ঃ

নিজের ও সমাজের যে সমৃদ্ধি বৃহত্তর কল্যাণমুখী, তার মধ্যে শিক্ষার মূলাদর্শ ও বহু উদ্দেশ্য নিহিত আছে। সেগুলিকে বিশ্লেষণ ক'রে শিক্ষাবিদ্‌রা একাধিক প্রতিপাদ্য বিষয়ের নামোল্লেখ করেছেন। বন্‌সার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য সম্পর্কে নিম্নরূপ মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেছেন যে, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিপ্রেক্ষিতে একথা বলা চলে যে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাধ্যমে অনেকটা দ্রুতগতিতে জাতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে শিশুদের প্রথম পরিচয় ঘটে। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি হচ্ছে সেই স্থান, যেখানে শিশুরা লাভ করে প্রাথমিক জ্ঞান, দক্ষতা, কার্যকরী শক্তি, আদর্শ চিন্তা ও অনুভূতি—যেগুলি সমাজ, পেশা ও নারী-পুরুষনির্বিশেষে সকলের পক্ষেই একান্ত কাম্য। এ ছাড়া, প্রত্যেকের পক্ষেই যা কাম্য, সেই জাতীয় জীবনের ভিত্তিস্বরূপ একীকরণের শিক্ষালাভের সুযোগ মেলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। আরও গড়ে উঠে স্বাস্থ্য সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা, দৈনন্দিন কাজের মধ্য দিয়ে আসে কর্মকুশলতা, সহযোগিতার মধ্য দিয়ে আসে যে দলীয় মনোভাব এবং যে একক অনুরাগের সৃষ্টি হয়—সেই ব্যবহারিক দিকগুলি শারীরিক শিক্ষার প্রধান অবদান।

এই প্রসঙ্গে টাউটন ও স্টুর্থাস্ নিম্নলিখিত দশটি প্রতিপাদ্য বিষয়ের অবতারণা করেছেন। সেগুলি যথাক্রমে—(১) স্বাস্থ্যকর জীবনযাত্রা ; (২) সামাজিক ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রধান নীতিগুলির সহজ প্রয়োগ ; (৩) অনুরাগ ও প্রবণতার আবিষ্কার ; (৪) আত্মজ শক্তির সর্বাধিক ব্যবহার ; (৫) সৌন্দর্যতত্ত্ব এবং প্রমোদ-মূলক কাজে অংশগ্রহণ ; (৬) স্কুলদলের সভ্য হওয়া ; (৭) সামাজিক ও ব্যক্তিগত আচরণের উচ্চ মান নির্ণয় ও সংরক্ষণ ; (৮) বাঞ্ছিত গৃহ-পরিবেশ সৃষ্টির প্রচেষ্টা ; (৯) অতীতের মূল্য নিরূপণ এবং বর্তমানে তার অবদানের পরিমাপ ; (১০) বিশ্বের বৃহত্তর গোষ্ঠী সম্পর্কীয় তত্ত্বের তাৎপর্য উপলব্ধি করা।

উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রদের কি লক্ষ্য হবে, সে সম্পর্কে ইংলিস্ ত্রিবিধ আদর্শের কথা উল্লেখ করেছেন। যথা—(১) সামাজিক ও নাগরিক লক্ষ্য ; (২) অর্থনৈতিক ও বৃত্তিমূলক উদ্দেশ্য ; (৩) ব্যক্তিগত ও অপেশাদারী লক্ষ্য। উচ্চ বিদ্যালয় পুনর্গঠন কমিশন শিক্ষাদর্শের যে সাতটিকে প্রধান লক্ষ্য ব'লে উল্লেখ করেছেন, সেগুলি হচ্ছে –(১) স্বাস্থ্য, (২) প্রধান শিক্ষা-পদ্ধতির উপর অধিকার, (৩) বাঞ্ছিত গৃহসভ্য হওয়া, (৪) পেশা, (৫) নাগরিকতা, (৬) যথার্থ অবসর-বিনোদন, (৭) নৈতিক চরিত্র।

উক্ত প্রতিপাদ্য বিষয়গুলির উপর চোখ বুলালে দেখা যায়, বিভিন্ন শিক্ষাবিদ্-প্রবর্তিত শিক্ষাতত্ত্বের মধ্যে প্রায়শঃ মিল আছে। তাই জনৈক শিক্ষাবিদ্ সংক্ষিপ্তাকারে

শারীরিক শিক্ষার যে প্রণিধানযোগ্য সংজ্ঞা দিয়েছেন, নিম্নে সেটি উদ্ধৃত করা গেল—The aim of Physical Education is to influence the experiences of persons to the extent that each individual within the limits of his capacity may be helped to adjust successfully to society, to increase and improve his wants, and to develop the ability to satisfy his wants.

এখানে সংক্ষেপে শারীরিক শিক্ষার তিনটি প্রতিপাদ্য বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে। সেগুলি যথাক্রমে (১) শারীরিক শিক্ষায় অংশগ্রহণের এমন সুযোগ দিতে হবে যে, সেগুলি সুনিয়ন্ত্রিতভাবে শিক্ষণীয় অভিজ্ঞতায় রূপান্তরিত হবে; (২) দেহ-যন্ত্রকে এমনভাবে বিকশিত করতে হবে যে, প্রত্যেকটি ব্যক্তি যেন জীবনধারার সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছুতে পারে এবং (৩) এমন কর্মকুশলতা ও ক্রীড়ামোদিতার মনোভাব গড়ে তুলতে হবে যে, সেগুলি যেন অবসর-বিনোদনের কাজে লাগতে পারে।

শারীরিক শিক্ষার ইতিহাস

শারীরিক শিক্ষার ইতিহাস অধ্যয়নের দুটি দিক আছে। এক, অতীত ইতিবৃত্তকে জানা; দুই, তুলনামূলক বিচারের দ্বারা প্রকৃত পন্থাকে নির্ণয় করা। এবংবিধ উপায়ে প্রকৃত মত ও পথের হদিস পাওয়া সম্ভব। শারীরিক শিক্ষার যাঁরা শিক্ষক, তাঁরা প্রাচীন শিক্ষার ধারা থেকে জানতে ও বুঝতে পারবেন, কেমন ক'রে, কিভাবে শারীরিক শিক্ষার ক্রমবিকাশ ঘটেছে। সেই শিক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান শিক্ষা-প্রগতিকে জানা সহজসাধ্য হয়; এবং কোন্ তত্ত্ব কেমনভাবে সেই যুগের শিক্ষা-ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করেছে, তা-ও টের পাওয়া যায়। পরোক্ষভাবে সেই অভিজ্ঞতা বর্তমান শিক্ষার মূল্য নিরূপণেও সাহায্য করে। এটাই ঐতিহাসিক বিচারের তুলনামূলক দিক।

এ ছাড়া, শারীরিক শিক্ষার ইতিহাস অধ্যয়নের আরও কয়েকটি প্রয়োজন ও উদ্দেশ্য আছে। প্রথমতঃ, আমাদের মনে যে স্বাভাবিক কৌতূহল আছে, সেই অনুসন্ধিৎসার মাধ্যমে জানা যায়, কেমন ক'রে বিভিন্ন দেশের শারীরিক শিক্ষা নিজ নিজ পরিবেশ অনুযায়ী গড়ে উঠেছিল। দ্বিতীয়তঃ, বিগত পূর্বপুরুষদের শৌর্যবীর্যের কথা স্মরণ ক'রে আমরা গৌরবান্বিত হ'তে পারি। তৃতীয়তঃ, বিভিন্ন দেশের শিক্ষা-পদ্ধতির বিচার-বিশ্লেষণ ক'রে তার গুণাগুণ সম্পর্কে যে জ্ঞান লাভ করি, সেই

তুলনামূলক জ্ঞানকে আমাদের উদ্দেশ্য-সাধক পরিকল্পনার কাজে লাগাতে পারি। চতুর্থতঃ, ইতিহাস অধ্যয়নের দ্বারা আমরা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের শারীরিক শিক্ষার একটা হিসাব-নিকাশ করতে পারি এবং জানতে পারি, কেন একটি বিশেষ অঞ্চলে নূতন ধরনের শারীরিক শিক্ষা-পদ্ধতি গড়ে উঠেছিল।

আরও অবগত হই, সেই মহৎ আন্দোলন এবং ঐতিহাসিক কারণ সম্পর্কে—যা শারীরিক শিক্ষার চিন্তা ও অনুশীলনকে সংগঠনে প্রভাবিত করেছে। আবার ক্ষেত্রবিশেষে কত ব্যক্তি-মনীষার চিন্তায় এবং আলোচনায় কি প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছে। তা ছাড়া, ইতিহাসের পাতায় কত না উপাদান ছড়িয়ে আছে। যা থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, শারীরিক শিক্ষার ক্রম-বিকাশ সেই সময়কালের গণ্ডি পেরিয়ে বর্তমানকেও আলোড়িত এবং অঞ্চল-বিশেষকে প্রভাবিত করেছে। উদাহরণ-স্বরূপ স্পার্টার কথাই উল্লেখ করা চলে। প্রাচীন যুগে স্পার্টার সেই নাগরিক রাষ্ট্রের তাগিদে সৈনিকের তথা সামরিক শিক্ষার প্রয়োজন ছিল অগ্রগণ্য। যখন রাষ্ট্র শাসন-ব্যবস্থার জন্য দক্ষ সৈনিকের বিশেষ প্রয়োজন ছিল, তখন বাহুবলই ছিল রাষ্ট্রীয় শক্তির প্রতীক; তখন শিশু ও যুব-শিক্ষার সমস্ত ধারাই নিয়ন্ত্রিত হ'ত বলিষ্ঠ, সাহসী এবং সুশৃঙ্খল সৈন্যদল সংগঠনের কাজে।

তখন প্রত্যেক এথেন্সবাসীর লক্ষ্য ছিল সুঠাম দেহ-সৌন্দর্যের দিকে। তাঁরা দেহের সঙ্গে মনের কথাও চিন্তা করেছিলেন। প্লেটোর সেই শিক্ষাদর্শ—'দেহের খোরাক ব্যায়াম এবং মনের খাদ্য সঙ্গীত'-ই ছিল এথেনীয়ান শিক্ষা-তত্ত্বের সারমর্ম। তখনকার সামাজিক প্রতিপত্তির নিরিখও ছিল দৈহিক গঠন-সৌন্দর্য, নাচের উপযোগী পেশিক ছন্দবোধ, প্রতিযোগিতায় জয়লাভের যোগ্যতা এবং কাব্যানুভূতি। যাতে এবংবিধ গুণাবলীর বৃদ্ধি পায়, সেই দিকে সে-যুগের চিন্তা, ধ্যান ও প্রচেষ্টা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে।

মধ্যযুগে সন্ন্যাসমুখী হয়েছিল খ্রীষ্টীয় সাধনার সমস্ত ভাবধারা। ফলে, সে সময় দেহের প্রতি একটা স্বাভাবিক অবহেলা দেখা দিয়েছিল। তখন বিদ্যালয়গুলি প্রায় গির্জা বা মঠে রূপান্তরিত হয়েছিল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে জার্মানির কতকগুলি বিক্ষিপ্ত ক্ষুদ্র রাষ্ট্র রাজনৈতিক প্রয়োজনে একত্রিত হয়ে বহিরাগতদের আক্রমণ প্রতিরোধে আত্মনিয়োগ করেছিল। সেই কারণে যে অদম্য শক্তির প্রয়োজন হয়েছিল, সেই জাতীয় প্রয়োজনের জন্য সে-যুগের শিক্ষা-ব্যবস্থার উপর শারীরিক শিক্ষার যে ভূমিকা ছিল, তার ফলেই যুদ্ধপ্রিয় দুর্জয় জার্মান সৈনিকের আবির্ভাব ঘটেছিল। সেই শক্তির পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের বিশ্ব-মহাযুদ্ধের ক্ষেত্রে।

আদিম যুগের শারীরিক শিক্ষা ঃ

প্রাচীন কালে শারীরিক শিক্ষার কোন নির্দিষ্ট ধারা ছিল না। অনিয়ন্ত্রিতভাবেই সে শিক্ষা-ব্যবস্থা চালু ছিল। তখন অবশ্য শিক্ষার কোন তত্ত্ব বা রীতি-নীতির কোন কাঠামো ছিল না। অনুকরণই ছিল তখনকার অঙ্গ-সঞ্চালনের কতকগুলি অনির্দিষ্ট ভঙ্গী মাত্র। নিছক আত্মরক্ষার জন্য যে শক্তি বা সামর্থ্যের প্রয়োজন, যেটুকু না হ'লে পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেওয়া সম্ভব হ'ত না—কেবল সেটুকুর জন্যই শরীর-চর্চার দরকার হ'ত। অর্থাৎ, প্রায় বারো আনা শ্রমই ব্যয়িত হ'ত দৈহিক উপস্থিতিকে বজার রাখার জন্য। জীবনধারণের জন্য যা-কিছু অপরিহার্য—যেমন শিকার, আশ্রয়, নিরাপত্তা প্রভৃতি—ক্রিয়াকলাপই ছিল সে-যুগের শারীরিক শিক্ষার অন্তর্গত। এক কথায়, প্রয়োজনীয়তাটাই ছিল শারীরিক শিক্ষার লক্ষ্য। জীবন-সংগ্রামের জন্য প্রস্তুতিটাই ছিল তখনকার শক্তি অর্জনের উৎস। অনেক যুগ ধ'রেই কেবল আত্ম ও বংশ রক্ষাটাই ছিল প্রধান করণীয় কাজ। অতি আধুনিক কালেই সে জীবনধারার রূপান্তর ঘটেছে। কৃত্রিম সভ্যতার উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে যে পরিবেশ-পরিস্থিতির আবেষ্টনী সংগঠিত হয়েছে, তার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের পন্থা নিরূপণে আজকের সভ্য মানুষ সচেষ্ট হয়েছে।

বিবর্তনের ইতিহাস থেকে জানা যায়, জীবন-সংগ্রাম বা মাৎস্য-ন্যায় নীতিই ছিল জগতের আদি প্রাণধর্ম। বাঁচার যোগ্যতা যার আছে, অর্থাৎ জীবন-সংগ্রামে যে জয়ী হবে, সে-ই জগতে টিকে থাকবে। এই 'জোর যার মুল্লুক তার' নীতি অনুসারে বেঁচে থাকার জন্য শক্তি অর্জনই ছিল অবশ্যকর্তব্য। এই শক্তির প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য সৃষ্টি হ'ল দল বা গোষ্ঠীর। একাধিক দলের যিনি নেতা বা সর্বময় কর্তা হলেন, তাঁর উপাধি হ'ল 'দলপতি' বা রাজা। আজকের অরণ্যবাসীদের মধ্যেও এর নিদর্শন পাওয়া যায়। এই গোষ্ঠী-সম্প্রদায় ঢাল, তলোয়ার বা বল্লম নিয়ে যে বর্বর নৃত্যানুষ্ঠান করত, সেগুলি ছিল পরোক্ষভাবে যুদ্ধ-প্রস্তুতির মহড়া। গোষ্ঠীবর্গ যখন ক্রমে বৃদ্ধি পেল, তখন কাজের সুবিধার জন্য তারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে, এক এক শ্রেণীর লোক এক-একটি কাজের ভার গ্রহণ করল।

এই শ্রেণী-বিভাগের ফলে যে দলের উপর সামরিক দায়িত্ব অর্পিত হ'ল, তখন সে দল বা শ্রেণীর লোকরা শরীর-চর্চায় মনোনিবেশ করল। এই দেশরক্ষী সৈন্যবাহিনী শান্তির সময় জনসাধারণের প্রশংসা লাভের জন্য বিভিন্ন অনুষ্ঠানে শক্তিমত্তার পরিচয় দিত। তার জন্য বিচিত্র খেলাধূলা ও প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা

হ'ত। এর জন্য ক্রমে ক্রমে অনেক আইন-কানুন ও রীতি-নীতির সৃষ্টি হ'ল। এইভাবে শারীরিক শিক্ষার প্রধান অঙ্গ যে খেলাধূলা, তার আমদানি হ'ল।

ভারতীয় শারীরিক শিক্ষা ঃ

রামায়ণ ও মহাভারত গ্রন্থে এর অজস্র নজির পাওয়া যায়। এই প্রতিযোগিতাগুলি ছাড়াও, আরও অনেক সামাজিক ক্রিয়াকলাপ অনুষ্ঠিত হ'ত। স্বয়ংবর সভা বা অশ্বমেধ-যজ্ঞ মূলতঃ সামাজিক অনুষ্ঠান হ'লেও, এর মধ্যে রাজপুত্র বা রাজকন্যারা নিজ নিজ শক্তি, সাহস ও যোগ্যতা প্রকাশের সুযোগ পেতেন। এমন কি ক্ষেত্রবিশেষে এই ধরনের অনুষ্ঠানগুলিকে কেন্দ্র ক'রে রণ-দামামা বেজে উঠত। প্রকারান্তরে সেগুলির মাধ্যমে যোগ্যতার যাচাই হ'ত। অস্ত্র-চালনা, তীর বা বর্শা নিক্ষেপ, গদা-চালনা প্রভৃতি ছিল প্রথমোক্ত অনুষ্ঠানের যোগ্যতা পরিমাপের প্রধান পরীক্ষা। সে শক্তির পরীক্ষায় যাঁরা কৃতকার্য হতেন, তাঁরাই আহূত রাজন্যবর্গের মধ্যে বীরশ্রেষ্ঠ ব'লে বিবেচিত হতেন। তখন সেই বাঞ্ছিত রাজপুত্রের গলায় স্বয়ংবরার রাজকন্যা বরমাল্য পরিয়ে দিতেন। এটাই ছিল তখনকার দিনে সামাজিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পাওয়া রাষ্ট্রীয় তথা বীর্যবত্তার সম্মান। আর অশ্বমেধ-যজ্ঞের মধ্যে ছিল রাজাধিরাজ হওয়ার প্রতিযোগিতা; অর্থাৎ সামরিক আয়োজনের পূর্ব-প্রস্তুতি বা আসন্ন যুদ্ধের ঘোষণা।

আবার কোন ক্ষেত্রে সে-যুগের ক্ষত্রিয়দের মধ্যে চরম কৃচ্ছ্রসাধনের নজিরও পাওয়া গেছে। মহাবীর কর্ণের জীবনেতিহাসই তার জলন্ত দৃষ্টান্ত। কর্ণ যখন জমদগ্নির শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন, সেই সময় কর্ণের অসম সহনশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। কর্মক্লান্ত গুরু যখন কর্ণের কোলে মাথা রেখে ঘুমোচ্ছিলেন, সেই সময় একটি কীট তাঁর উরু ভেদ ক'রে বের হয়েছিল; তথাপি কর্ণ একটু কাতর বা বিচলিত হননি। একলব্যের গুরু-দক্ষিণা এমনি আর একটি সহনশীলতার ঐতিহাসিক উদাহরণ। মৃগয়া ছিল তখন রাজারাজড়ার শখের খেলা।

যদিও কর্মাধিকারে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করাটাই ছিল ক্ষত্রিয়দের প্রধান কাজ, তথাপি ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য বর্ণের লোকরা যে অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করেননি, এমন নয়। রামায়ণ ও মহাভারতে তার একাধিক নজির আছে। দ্রোণ, পরশুরাম, অশ্বত্থামা, কৃপ, একলব্য, সুগ্রীব, গুহক প্রভৃতি বীর যোদ্ধাদের মধ্যে কেউ ক্ষত্রিয় ছিলেন না। মহাভারত এবং রামায়ণের যুগের অধিকাংশ অস্ত্রগুরুরাই ছিলেন জাতিতে ব্রাহ্মণ। তখন সামরিক শিক্ষায় স্ত্রীলোকরাও অংশগ্রহণ করতেন। এ প্রসঙ্গে চিত্রাঙ্গদা, সুভদ্রা, প্রমীলা প্রভৃতি বীরাঙ্গনা নারীদের নাম উল্লেখযোগ্য। হিন্দু ধর্মশাস্ত্রে যে আদ্যাশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, তিনি ছিলেন শক্তিরূপিণী পরমা

প্রকৃতি। সেই শক্তির একাধিক প্রকাশ দেখা যায় চণ্ডী, দুর্গা, কালী প্রভৃতি মূর্তিতে। শক্তি-সাধনার যে-সব প্রক্রিয়ার প্রচলন ছিল, সেগুলি হচ্ছে যথাক্রমে যোগ, আসন, সূর্যনমস্কার প্রভৃতি। চতুরাশ্রম প্রথা অনুসারে পরিপূর্ণ জীবনের জন্য প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ, যতি, প্রব্রজ্যা প্রভৃতি গ্রহণ করতে হ'ত। এক কথায়, এগুলিই ছিল ভারতীয় শারীরিক শিক্ষার বিচিত্র প্রকাশ। যুদ্ধোপকরণ হিসাবে হস্তী, অশ্ব, রথ প্রভৃতি ব্যবহৃত হ'ত।

প্রাচীন চীন দেশের শারীরিক শিক্ষা ঃ

চীনারা রক্ষণশীল জাতি। তাদের প্রবর্তিত শিক্ষা-ব্যবস্থায় সেই সংরক্ষণশীলতার পরিচয় পাওয়া গেছে। যে শিক্ষা-দর্শন প্রাচীন কাল থেকে চীন দেশে চালু ছিল না, যা কেবল সে-যুগের সমাজ-ব্যবস্থাকেই প্রভাবিত করেনি, এখনও কোন কোন গোষ্ঠীর মধ্যে তার পুনরাবৃত্তি চলেছে। সে-যুগের অচলায়তন সমাজ-ব্যবস্থায় যে স্থূল-জীবন-প্রস্তুতিটাই ছিল শিক্ষার অন্তর্গত, যা পরিবর্তনশীল উন্নত সমাজ-জীবনে অচল। ব্যক্তি-সত্তা-বিকাশের কোন সুযোগ বা ব্যক্তি-উন্মেষের কোন ধারাই সে-যুগের শিক্ষা-ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করেনি। এক কথায় প্রতিষ্ঠিত সমাজ-জীবনকে কায়েম করাই ছিল সে শিক্ষার মুখ্য লক্ষ্য।

কাজেই, সে রক্ষণশীল শিক্ষার আর যে দর্শনই থাক না কেন, শারীরিক শিক্ষার কোন সুপরিকল্পিত পরিকল্পনাই ছিল না। সেটাকে প্রকৃত শিক্ষাদর্শ বলা চলে না। প্রকৃত শিক্ষার লক্ষ্য সার্বিক বিকাশের দিকে, কোন গোষ্ঠী বা দলের জন্য তা সীমাবদ্ধ হ'তে পারে না। প্রাচীন কালে চীন দেশের শারীরিক শিক্ষা এবং শরীর-চর্চা শ্রেণী-বিশেষের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। যে শিক্ষায় প্রত্যেকটি মানুষের জন্মগত অধিকার, সেই ব্যক্তিত্ব-বিকাশের দিকে তখন তেমন সজাগ দৃষ্টি দেওয়া হ'ত না। শরীর-চর্চার জন্য তখনকার দেশবাসীরা শ্বাস-প্রশ্বাসের যে ব্যায়াম করত, তার নাম ছিল 'কন্‌ফু'। তা ছিল দেহ-মন পরিশুদ্ধির ব্যায়াম। নীরোগ দেহে দীর্ঘদিন বাঁচার জন্য তারা এই কন্‌ফু ব্যায়াম করত। সৈনিকদের জন্যই অবশ্য সামরিক শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল।

মিশর দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থা ঃ

মিশরীয় সভ্যতা সুপ্রাচীন। জগতের ইতিহাসে মিশরীয় সভ্যতার বিশিষ্ট অবদান আছে। অ্যাসিরিরা, ব্যাবিলন এবং ক্যাল্‌ডিয়া ছিল তখনকার দিনের ইতিহাস-প্রসিদ্ধ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। উক্ত অঞ্চলের ভাস্কর্য-শিল্পে যোদ্ধা, মল্লবীর, সাঁতারু, কিরাত, ব্যায়ামবীর, খেলোয়াড় এবং নৃত্য-শিল্পীর প্রতিকৃতির যে-সব

নিদর্শন পাওয়া গেছে, তা থেকে অনুমান করা যায় যে, তখনকার দিনে মিশরের জনসাধারণও কেমনভাবে শারীরিক শিক্ষার অনুশীলন করত। এই উক্তিটির সত্যতা সম্পর্কে কোন কোন ঐতিহাসিক সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। তাঁরা বলেছেন, কতকগুলি ভাস্কর্যের নমুনা দেখে এই সিদ্ধান্ত করাটা ঠিক হবে না যে, শরীর-চর্চার এবংবিধ বিভিন্ন প্রক্রিয়া সর্বসাধারণ্যে চালু ছিল।

পারস্য দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থা ঃ

পারস্যের জাতীয় ইতিহাসে 'মেডেস্'দের অবদান যথেষ্ট। মেডেস্রাই ছিল পার্সীদের জ্ঞাতি। তারা ছিল প্রখ্যাত বীর যোদ্ধা—চতুর শিকারী, দক্ষ ঘোড়-সওয়ার এবং সাহসিক সৈনিক। বাল্যকাল থেকেই পার্সীরা ঘোড়ায় চড়া এবং ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা করত। জাতীয় সরকার নিযুক্ত দক্ষ শিক্ষকের কাছে তারা যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করত। দু'বছর বয়সে পদার্পণ করলেই, তাদের রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধানে রাখা হ'ত। তখন মাতাপিতার সঙ্গে তাদের কোন সম্পর্ক থাকত না। ৬—৭ বছরের হ'লে তাদের কঠোর অনুশীলন করতে হ'ত। অতি প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ ক'রেই তারা নির্দিষ্ট ক্রীড়াক্ষেত্রে উপস্থিত হ'ত। সেখানে তারা বর্শা-নিক্ষেপ, দৌড়ানো, তীর-চালনা, 'ফিঙে' ছোঁড়া প্রভৃতি অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করত। দু'এক বছরের মধ্যে তারা ঘোড়ায় চড়ার নানা কৌশল আয়ত্ত করত। ৮—২০ বছরের মধ্যে তারা নিপুণ অশ্বারোহী সৈনিক হওয়ার জন্য যা যা করবার দরকার,—যেমন বেগবান অশ্ব-পৃষ্ঠ থেকে যখন-তখন লাফানো, নির্ভুলভাবে লক্ষ্য ভেদ করা, তীর ছোঁড়া প্রভৃতি—তা নিয়মিতভাবে অনুশীলন করত। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তারা নানাপ্রকার কৃচ্ছ্রসাধন করত। কখনো বা প্রচণ্ড রৌদ্রে, কঠোর শীতের দিনে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে ঘণ্টার পর ঘণ্টা শুয়ে থাকার অভ্যাস করত, যাতে ঠাণ্ডায় বা রৌদ্রে কোন কষ্ট না হয়। অথবা, দৌড়ে, কখনো বা দ্রুতপদে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দীর্ঘপথ অতিক্রম করত। সে সময় হয়তো দুদিন অন্তর তাদের আহার্য দেওয়া হ'ত, যাতে যুদ্ধের সময় কোন অবস্থাতেই তারা যেন কিছুতেই কাতর না হয়। কখনো বা হিংস্র জন্তু-জানোয়ার—যেমন বাঘ, সিংহ, ভালুক প্রভৃতি—শিকারে বের হ'তে হ'ত। দিনের কিছুটা তারা ব্যয় করত অস্ত্র তৈরি ও কৃষির কাজে। ৬—২০ বছর বয়স পর্যন্ত এই কঠোর সামরিক শিক্ষা চলতো। শুধু তাই নয়, ১৫—৫০ বছরের প্রত্যেকটি সক্ষম পুরুষদেরই সামরিক বিদ্যা শিক্ষা করতে হ'ত। এর ফলে সে-যুগে পারস্যবাসীরা এশিয়ার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ যোদ্ধায় পরিণত হ'য়েছিল। এই অসীম শৌর্য-বীর্যের বিনিময়ে যে অর্থ, যশ এবং প্রতিপত্তি এসেছিল। এর ফলে পরবর্তী যুগে তারা বিলাস-ব্যসনে মগ্ন হয়েছিল। সেই নৈতিক অবনতি এমন

চরমে পৌছেছিল যে, সেদিনের হীনবীর্য পারস্য জাতিকে জয় করতে সেকেন্দরকে এতটুকু বেগ পেতে হয়নি।

গ্রীক শিক্ষা-ব্যবস্থা :

গ্রীকরাই হচ্ছে ইউরোপের আদি সভ্য জাতি। প্রাচীন পাশ্চাত্য সভ্যতার ইতিহাসে তাদের অবদান অনেকখানি। অথচ এই গ্রীক জাতির আবির্ভাবের পূর্বে গ্রীসে যারা বাস করত, সেই আদিবাসীদের কথা অনেকের জানা নেই। সেই আদিবাসীদের নাম ছিল ঈজিয়ান্স। তারা ছিল খর্বাকৃতি, কৃষ্ণবর্ণের লোক। শৌর্য-বীর্যেও যে তারা কম ছিল না, ইতিহাসে তার অনেক নজির পাওয়া যায়। নোসস্ ও ক্রীটের আবিষ্কৃত বৃষসহ তিনজন মল্লবীরের চিত্র পাওয়া গেছে। চিত্রে দেখানো হয়েছে যে, একজন মল্লবীর ষাঁড়ের শিং ধ'রে ঝুলছে, একজন তার পিঠ থেকে লাফিয়ে পড়েছে, পিছনের বন্ধু তাকে ধরার জন্য ব্যস্ত হয়ে আছে। তাদের মধ্যে যে শরীর-চর্চার বিশেষ ব্যবস্থা ছিল, তা অনুমান করা যেতে পারে। এ ছাড়া তারা ধনুর্বিদ্যায় বেশ পারদর্শীও ছিল।

তারপর খ্রীঃ পূঃ ১১শ শতকে ইন্দো-এরিয়ান গোষ্ঠীর যে শাখা ভারতবর্ষে এসেছিল, তারই একটি শাখা গ্রীস অধিকার করে। তারা ছিল দীর্ঘাকৃতি, বলিষ্ঠ এবং ফর্সা। তাদের চুলের রঙ ছিল সোনালী বর্ণের। তারা বিবাহ-সূত্রে আদিবাসীদের সঙ্গে আবদ্ধ হওয়ার ফলে যে মিশ্র জাতির উদ্ভব হয়, তারাই ইতিহাসে গ্রীক নামে অভিহিত। গ্রীক মহাকাব্য - ইলিয়াড ও ওডেসি—থেকে জানা যায় যে, হোমারিক যুগে ক্রীড়ামোদীদের আসন ছিল সমাজের শীর্ষে। এক কথায়, সেটা ছিল বীর্যবত্তার যুগ। তখন ভগবানের উদ্দেশ্যে যে পূজা-উপচার উৎসর্গ করা হ'ত, সেই যজ্ঞে অথবা মৃত্যু-উৎসবে নানাপ্রকার দৌড়, লম্ফন প্রভৃতি প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হ'ত। সেই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ছেলেদের শক্তি, দক্ষতা ও সামর্থ্য প্রমাণের বিশেষ পরীক্ষা গৃহীত হ'ত। ট্রয়ের যুদ্ধ এবং প্যাট্রোক্লুস্-এর মৃত্যু-উৎসবই তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। মৃত্যু-উৎসবকে বলা হ'ত 'ফিউনারাল্ গেম্স্'। সেই সব প্রতিযোগিতার আকর্ষণীয় বিষয়ের মধ্যে ছিল (১) রথ-চালনা, (২) ধনুর্বিদ্যার পরীক্ষা, মুষ্টিযুদ্ধ এবং কুস্তি প্রভৃতি। রথ-চালনা প্রতিযোগিতাই ছিল প্রধান। স্থানাভাববশতঃ যে-কোন অসমতল বন্ধুর ভূমি দ্রুত অতিক্রম করা ও গন্তব্যস্থান থেকে ফিরে আসাই ছিল প্রতিযোগিতার সুনির্দিষ্ট বিষয়। মুষ্টিযুদ্ধের ক্ষেত্রে সভা ডাকা হ'ত। সেই সভায় একজন প্রতিযোগী উঠে অন্য একজনকে যুদ্ধে আহ্বান করত ; তখন প্রতিপক্ষ রাজী হ'লেই মুষ্টিযুদ্ধের আয়োজন করা হ'ত। তখন প্রতিদ্বন্দ্বীদের বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজন চর্ম-নির্মিত দস্তানা পরিয়ে

কোমরে বেল্ট বেঁধে দিত। তারপর মুষ্টিযুদ্ধ আরম্ভ হ'ত। তখন কিন্তু উচ্চতা ও দেহের ওজন অনুসারে জুটি নির্বাচনের কোন রেওয়াজ ছিল না। এমনকি মুষ্টিযুদ্ধের কোন সময়ও সুনির্দিষ্ট ছিল না। যুদ্ধে প্রতিপক্ষ যতক্ষণ না পরাজিত হ'ত অথবা লড়াই করতে করতে জখম বা অক্ষম হ'ত, ততক্ষণ পর্যন্ত প্রতিযোগিতা চলত। এ ছাড়া, দৌড়-প্রতিযোগিতারও ব্যবস্থা ছিল।

ওডেসি মহাকাব্যে দৌড়-প্রতিযোগিতার উল্লেখ আছে। ওডেসাস ফ্যালেশিয়ান দেশে ফিরে এলে, তাঁকে ভুরিভোজনে আপ্যায়িত করার পর বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করা হয়। মুষ্টিযুদ্ধ, কুস্তি, ভারী গোলক নিক্ষেপ এবং দীর্ঘ দৌড়-প্রতিযোগিতার জন্য তাঁকে আহ্বান করা হয়েছিল। সে-যুগে খেলাধূলা ও প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করাটা খুবই জনপ্রিয় হ'লেও, তখন কোন সুনির্দিষ্ট ক্রীড়াক্ষেত্র ছিল না। খেলাধূলার যথেষ্ট ব্যবস্থা থাকলেও, তখন যে কোন ব্যায়ামাগার ছিল, তার কোন নিদর্শন পাওয়া যায়নি। প্রতিযোগিতার জন্য কোন ক্রীড়াক্ষেত্র না থাকায়, সময়বিশেষে সুবিধামতো স্থান নির্বাচিত হ'ত এবং সেখানে দর্শকরা সমবেত হ'ত। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের পূর্বে কেউ কোন বিশেষ অনুশীলন বা শিক্ষা লাভ করত কিনা, তা জানা যায় না।

খেলাধূলা ছাড়া আর একদিকে গ্রীকদের বিশেষ প্রবণতা ছিল। অতি প্রাচীন কাল থেকে গ্রীসবাসীরা ছিল নৃত্যপ্রিয় জাতি। ওডেসিতেও তার প্রমাণ আছে। ফ্যালেশিয়ানরা ওডেসাসকে নৃত্যাদি অনুষ্ঠানের দ্বারা প্রীত ও আপ্যায়িত করেছিল। তখন নৃত্যোৎকর্ষ চরমে পৌঁছেছিল। নাচের মধ্য দিয়ে যে স্বর্গীয় আনন্দ লাভ করা যায়, প্রত্যেকটি গ্রীসবাসী তা বিশ্বাস করত। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই এত নাচের প্রচলন থাকলেও তখন কোন নৃত্যাগার ছিল না। প্রয়োজনের তাগিদে যে-কোন স্থানেই নাচের আয়োজন করা হ'ত। গ্রীকরাই এই শিক্ষালাভের সুযোগ পেত, কিন্তু কোন ক্রীতদাসকে এই সুবিধা দেওয়া হ'ত না। বিদেশীরাও সে সুযোগ থেকে বঞ্চিত হ'ত। কিন্তু সমগ্র জনসংখ্যার তুলনায় তাদের সংখ্যা ছিল প্রায় আধাআধি।

গ্রীসের স্বর্ণ যুগ ঃ

ঐশ্বর্য-স্ফীতি ও প্রাচ্য সভ্যতার প্রভাবে গ্রীক সভ্যতার যে উন্নতি, সেটাই হচ্ছে গ্রীক ইতিহাসের স্বর্ণ যুগ। হোমারিক যুগের সেই সহজ সরল স্বাভাবিক প্রগতি হঠাৎ যেন শিক্ষায়-দীক্ষায়-ঐশ্বর্যে ফুলে ফেঁপে উঠল ; সেটাকেই গ্রীক ইতিহাসের গৌরবময় অধ্যায় বলা চলে। সেটা হচ্ছে খ্রীঃ পূঃ পঞ্চম ও চতুর্থ শতকের কথা।

সেই থেকে বর্তমান শতাব্দীর আগে পর্যন্ত—যতদূর জানা যায়—সমগ্র গ্রীক সাম্রাজ্য কখনো জাতীয় ঐক্যে সংঘবদ্ধ হয়নি—ছোট ছোট নাগরিক রাষ্ট্রে বিভক্ত ছিল। পাশাপাশি এক রাষ্ট্রের সঙ্গে অন্য রাষ্ট্রের কোন মিল ছিল না ; যুদ্ধ-বিগ্রহ ও রেষারেষি চলত অবাধে। কেবল বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করার জন্যই তারা সংঘবদ্ধ হয়ে লড়াই করত। শত্রুরা পরাজিত হ'লেই আবার তারা খণ্ডিত, বিভক্ত হয়ে পড়ত।

এই সব ছোট ছোট রাজ্যগুলির অধিকাংশই ছিল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। কাজেই, রাষ্ট্রনায়করা নিজ নিজ প্রাধান্য নিয়ে নিরন্তর দলাদলিতে লিপ্ত হ'ত। সেই প্রাধান্যের লড়াইয়ের প্রধান লক্ষ্য ছিল, কেমন ক'রে একজন অন্যকে দাবিয়ে রাখতে পারে,—হেয় প্রতিপন্ন করতে পারে। কিন্তু এত রাজনৈতিক বিরোধিতা থাকা সত্ত্বেও এক বিষয়ে তারা সকলেই ছিল একমত—সেটা হচ্ছে সামরিক ও শারীরিক শিক্ষা সম্পর্কে। সামরিক ও শারীরিক শিক্ষার প্রয়োজন যে অপরিহার্য, তা কিন্তু সর্বজন-স্বীকৃতি পেয়েছিল। এরই ফলে পৃথিবীর অন্যান্য জাতিপুঞ্জ অপেক্ষা গ্রীকরাই সামরিক ও শারীরিক শিক্ষায় বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেছিল। তখন সর্ব-সাধারণ্যে শরীর-চর্চা বা ব্যায়ামের প্রচলন হয়েছিল এবং প্রতিযোগিতায় যারা জয়ী হ'ত, তাদের যথেষ্ট সম্মান দেখানো হ'ত। কাজেই, একথা বললে আশ্চর্য হবার কিছু নেই যে, গ্রীস দেশ থেকেই ব্যায়াম (জিম্‌নাস্টিক), 'এ্যাণ্টাগনিস্ট', 'স্টাডিয়াম' প্রভৃতি কথার উৎপত্তি হয়েছে। গ্রীক পুরুষরা উলঙ্গ হয়ে ব্যায়াম করত ; তাই সে ব্যায়ামাগারে স্ত্রীলোকদের কোন প্রবেশাধিকার ছিল না।

স্পার্টার শিক্ষা :

স্পার্টানরাই ছিল গ্রীক জাতির মধ্যে সর্বাপেক্ষা যুদ্ধপ্রিয় জাতি। স্বদেশের গৌরব রক্ষার্থে তারা সব-কিছু—এমন কি আত্মোৎসর্গ করতে কুণ্ঠিত ছিল না। সে-যুগের গ্রীসের অন্যান্য নগরীর মতো স্পার্টা নগরী প্রাকার-বেষ্টিত ছিলনা। তার প্রয়োজনও ছিল না ; কারণ, স্পার্টানরা মনে করতেন যে, ইটের পরিবর্তে জ্যান্ত, মানুষের দেওয়ালই হবে নগরীর শ্রেষ্ঠ পরিবেষ্টন। স্পার্টান মায়েরাও ছিলেন বীরাঙ্গনা। তাঁরা নিজহস্তে ছেলেদের রণসজ্জায় সজ্জিত ক'রে যুদ্ধে যাওয়ার প্রাক্কালে আশীর্বাদের পরিবর্তে বলতেন, 'হে আমার বীর সন্তান, হয় যুদ্ধে জয়লাভ ক'রে সগৌরবে ফিরে আসবে, নয় তো মৃত্যুকে বরণ করবে। খবরদার, পরাজিত হয়ে পালিয়ে এসো না।' স্পার্টানরা মনে করত যে, যারা সুস্থ সবল হয়ে জন্মাবে, কেবল তাদেরই বাঁচার অধিকার আছে। আর যারা দুর্বল বা পঙ্গু, সমাজে বা রাষ্ট্রে তাদের কোন স্থান নেই। সেই যোগ্যতা নিরূপণের জন্য একটি বয়স্ক প্রধানদের সমিতি (Council of elders) ছিল। কোন শিশু ভূমিষ্ঠ হ'লেই, তাঁদের সামনে এনে

হাজির করা হ'ত। পরীক্ষান্তে তাঁরা যদি বলতেন, এ শিশুর বাঁচার অধিকার আছে, তবেই তাকে বাঁচার অধিকার দেওয়া হ'ত; সমাজ তাকে গ্রহণ করতো। আর দুর্বল শিশুদের পাহাড় থেকে ফেলে দিয়ে মেরে ফেলা হ'ত। এ থেকেই অনুমান করা যায় যে, স্পার্টানরা কি কঠোর ও কঠিন প্রকৃতির লোক ছিল।

অনুশীলনের ব্যবস্থা ঃ

এদের শারীরিক শিক্ষার অনুশীলন ছিল যেমন বিচিত্র, তেমনি কঠোর। নিয়ম ছিল যে, জন্মের পর থেকে মাত্র ৬ বছর শিশুরা থাকবে পিতামাতার অধীনে। তারপর ৭—১৮ বছর তারা থাকবে সৈন্য-শিবিরে। উন্মুক্ত ব্যারাকে তাদের রাখা হ'ত। শীত-গ্রীষ্মেই তাদের স্বল্প পোশাকে, স্বল্পাহারে রাখার ব্যবস্থা ছিল। সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সামান্যতম সুযোগ-সুবিধাটুকুও তাদের দেওয়া হ'ত না। জুতো বা বালিশ ব্যবহার করবারও অনুমতি ছিল না। অনুশীলনের উদ্দেশ্য ছিল, তারা স্বল্পভাষী এবং কষ্টসহিষ্ণু হবে। এমন কি প্রকাশ্যে ভীষণ শাস্তি দেওয়া হ'লেও, তাদের 'টু' শব্দ করবার জো ছিল না।

এই শারীরিক শিক্ষার অন্তর্গত ছিল কুস্তি, দৌড়, লম্ফন, বর্শা নিক্ষেপ প্রভৃতি। এ ছাড়া ছিল সাঁতার কাটা, ডিস্‌কাস্ ছোঁড়া, ঘোড়ায় চড়া, কুচকাওয়াজ, আরও অনেক কিছু। নৃত্যকলার মধ্যে পিরিক নৃত্যই ছিল সমধিক প্রসিদ্ধ। ১৮—২০ বছর পর্যন্ত ছিল নিয়মানুবর্তিতা শিক্ষার ব্যবস্থা; সেই সঙ্গে ছিল পরিভ্রমণ, পর্যবেক্ষণ এবং ভৌগোলিক জ্ঞানার্জনের ব্যবস্থা। অর্থাৎ, রাজ্যের চতুঃসীমানায় কোন্ দিকে কি আছে, তা জানতে হ'ত। পর্যবেক্ষণ ও পরিভ্রমণের মাধ্যমে তারা দেশের ভৌগোলিক অবস্থানকে জানতে পারত।

স্ত্রীলোকদের সম্ভবতঃ ব্যায়াম করতে দেওয়া হ'ত না। এ কথাটা সত্যি কিনা, সে সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। স্ত্রীলোকদের ব্যায়াম করতে না দেওয়ার কারণ হচ্ছে যে, তখন পুরুষরা উলঙ্গ হয়ে ব্যায়াম করতো। কাজেই, সেখানে স্ত্রীলোকদের যেতে দেওয়া হ'ত না।

গান ছাড়া মেয়েদের সাহিত্য বা অন্যান্য বিষয়েও কিছু শিক্ষা দেওয়া হ'ত না। কারণ, শিক্ষাবিদ্‌রা মনে করতেন যে, মেয়েরা হবে বীর সন্তানের জননী। সংসারকে আনন্দে ভরে তোলার জন্য শুধু গৃহিণীপনার কাজ জানলেই হবে।

এথেন্সের শিক্ষা-ব্যবস্থা ঃ

স্পার্টানদের শিক্ষা-ব্যবস্থার সঙ্গে এথেনিয়ান শিক্ষাধারার সাদৃশ্য ছিল অনেকখানি। অনুশীলন ব্যাপারে মিল থাকলেও, কেতাবী শিক্ষার দিক থেকে এথেন্সবাসীরা ছিল অনেকটা অগ্রসর। সঙ্গীত ছাড়াও লেখাপড়া বিষয়ে তাদের

আগ্রহ ছিল যথেষ্ট। লিখন-পঠন, গণিত-শিক্ষা এবং মুখস্থ করাই ছিল তাদের প্রধান শিক্ষণীয় বিষয়। যে বিদ্যালয়ে এই সব শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল, তাকে বলা হ'ত প্যালেস্ট্রা বা পাঠশালা। দেহকে নীরোগ, সুস্থ ও নির্দোষ করার জন্য তখন নানাপ্রকার সহজ ব্যায়ামের প্রচলন ছিল। তাকে বলা হ'ত সংশোধনী ব্যায়াম। সুষ্ঠুভাবে চলাফেরা করা, সোজা হয়ে ঠিকভাবে দাঁড়ানো প্রভৃতি ছিল সংশোধনী ব্যায়ামের অন্তর্গত। ১৮ বছর বয়সের প্রত্যেক যুবককে বাধ্যতামূলকভাবে দু'বছর সামরিক শিক্ষা লাভ করতে হ'ত। প্যালেস্ট্রা, ব্যায়ামাগার ছাড়াও বহু সরকারী প্রতিষ্ঠান ছিল, যেগুলি ক্রমবর্ধমান শিশুদের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের দিকে দৃষ্টি দিত এবং তাদেরই তত্ত্বাবধানে সদা নিযুক্ত থাকত। শিক্ষার এক বৎসরকাল অতীত হ'লে, শৈত্য (বা অ্যাথেলেটিক্) ক্রীড়ার যে প্রদর্শনী হ'ত, সেখানে শিক্ষার্থীদের নিজ নিজ যোগ্যতার প্রমাণ দিতে হ'ত। অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষার সময় এথেনিয়ান যুবকদের কঠিন শপথ গ্রহণ করতে হ'ত; তাদের সম্মিলিত প্রতিজ্ঞা ছিল: আমি কোনদিন এই পবিত্র অস্ত্রকে কলুষিত করব না, কিছুতেই অস্ত্রের অমর্যাদা হ'তে দেব না; কোন অবস্থায় দলীয় সাথীকে পরিত্যাগ করব না; পবিত্র দেব-মন্দির ও সাধারণের সম্পত্তি রক্ষার্থে কঠোর সংগ্রাম করব,—সম্ভব হ'লে একা, কিংবা মিলিতভাবে। পিতৃভূমিকে আমি যে অবস্থায় পেয়েছি, তাকে আরও সমৃদ্ধ এবং গৌরবমণ্ডিত ক'রে যাব। আমি নগরপালের হুকুম অমান্য করব না; আমি প্রচলিত আইন ও শৃঙ্খলাকে যতদূর সম্ভব মেনে চলব এবং পরবর্তী কালে যে-সব আইন প্রণীত হবে, সেগুলিকে শিরোধার্য ব'লে গ্রহণ করব। নগ্নদেহে ব্যায়াম করার প্রথা তখনও চালু ছিল। ব্যায়ামের পূর্বে ভালো ক'রে তৈল মর্দন ক'রে ব্যায়ামবীররা স্নান সেরে নিত। 'পেনটাথেলন' অর্থাৎ পঞ্চ ব্যায়াম-নীতি—যথা দৌড়, কুস্তি, দীর্ঘ লাফ, বর্শা নিক্ষেপ ও ডিস্‌কাস্ বা চাকতি ছোঁড়া ছিল তাদের শারীরিক শিক্ষার অন্তর্গত। এই সবই ছিল তাদের জনপ্রিয় ক্রীড়ানুষ্ঠান। সেই সঙ্গে মুষ্টিযুদ্ধেরও প্রচলন ছিল।

এই প্রসঙ্গে লক্ষণীয় এই যে, বৃদ্ধ বয়স অবধি গ্রীকরা ব্যায়াম করত। কারণ, শরীর-চর্চাই ছিল তাদের কাছে আমোদ-প্রমোদ, স্বাস্থ্য-আনন্দ, সামাজিক বিধান, এমন কি নৈতিক শিক্ষা, সম্মান-প্রশংসা—এক কথায় সব-কিছু।

রোমের শারীরিক শিক্ষা:

রোমীয়রা ছিল ব্যবহারিক বুদ্ধিসম্পন্ন, শক্তিশালী, কল্পনাহীন, বাস্তববাদী সৈনিক। সাহিত্য, শিল্প প্রভৃতি কাল্পনিক ঐশ্বর্য অপেক্ষা তাদের অনুরাগ ছিল প্রয়োজন-সর্বস্ব প্রয়োগ-নীতির দিকে। একটা কিছু 'করতে' বা কিছু একটা 'হ'তে' না পারলে তারা যেন খুশী হ'ত না। যা হয়নি, তার জন্য তাদের কোন মাথাব্যথা

ছিল না। কাজের মাধ্যমেই তাদের কৃতকর্মের পরিমাপ করা হ'ত। যে ভাবনা জীবনের কাজে লাগে না, যা-কিছু অপ্রয়োজনীয়, তার জন্য তাদের কোন ভাবনাই ছিল না।

রোমীয় সরকারের কৃতিত্ব ছিল সংগঠনমুখী। দৃঢ় সঙ্কল্প, অমিত শৌর্যই ছিল সে-যুগের রাজশক্তির প্রধান অঙ্গ। প্রথমদিকে কিন্তু সে রাষ্ট্র-সংগঠনী শক্তির বিশেষ কোন পরিচয় পাওয়া যায়নি। তখন আর্যদের মতোই তারা বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিল ; কিন্তু খ্রীঃ পূঃ ২১০ শতকে তারা সংঘবদ্ধ হ'য়ে সমস্ত ইতালি রাজ্য করতলগত করতে সক্ষম হয়। রোমের সেই গৌরবময় যুগে বিজয়-ই ছিল তাদের ভাগ্য-লিখন এবং বিজিতদের তারা শুধু পদানত করেনি, তাদের অকুণ্ঠ আনুগত্যও লাভ করেছিল। তারা অনুগত প্রজাদের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা, এমন কি সামাজিক জীবনের সমস্ত অধিকারও দিয়েছিল। এই উদার নীতির ফলে রোমীয় সভ্যতা কেবল অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেনি, খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় শতকে বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্য স্থাপনে সক্ষম হয়েছিল। সমস্ত ভূমধ্য-সাগরীয় অঞ্চলে সে ক্ষমতা কায়েম হয়েছিল।

রোমীয় শিক্ষা-নীতির ধরন ঃ

রোমীয় শিক্ষার অনুশীলন-ক্ষেত্র ছিল গৃহ-পরিবেশ। খ্রীঃ পূঃ তিন শতক অবধি দৈনন্দিন জীবনের কাজকর্মের মধ্যে সে শিক্ষার ধারা সীমাবদ্ধ ছিল। অতি শৈশব থেকে সেদেশের ছেলেমেয়েরা পিতামাতার কাছে আদর্শ নাগরিক হওয়ার নির্দেশ এবং শিক্ষা পেত। মেয়েরা গৃহিণীপনার, মাতৃত্বের এবং যোগ্য স্ত্রী হওয়ার শিক্ষা লাভ করত তাদের মায়েদের কাছ থেকে ; মাতাপিতার কাছ থেকে ছেলেরা শিখত দেশকে ভালবাসতে। দেশপ্রেম, আনুগত্য, সাধুতা, সাহস, শিল্প-প্রীতি প্রভৃতি গুণাবলীও তারা শিক্ষা করত প্রতিদিনের উপদেশ এবং নির্দেশের মাধ্যমে। এক কথায়, রোমীয়রা ছিল উচ্চাকাঙ্ক্ষী, যুদ্ধপ্রিয় জাতি। শারীরিক শিক্ষা ছিল প্রত্যেক রোমবাসীদের কাছে অপরিহার্য। তাদের অনুশীলনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল, কেমন ক'রে তরবারি চালনায়, বর্শা নিক্ষেপে, ঘোড়ায় চড়া প্রভৃতিতে দক্ষতা অর্জন করা যায় ; শক্তি, সামর্থ, ও সহনশীলনতা শিক্ষা করা যায়। নগরপ্রান্তে যে মাঠে সামরিক শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল, তাকে বলতো 'ক্যাস্পুস্ মার্টিউস্'। সে অনুশীলন ছিল অতিশয় কঠিন, তার শৃঙ্খলা ছিল কঠোরতর। কুস্তি, ঘোড়ার চড়া, সাঁতার কাটাই ছিল রোমীয় ব্যায়ামের অন্তর্গত। তারা সশস্ত্রভাবে অথবা খালি হাতে যুদ্ধ করার কলাকৌশল আয়ত্ত করত। নবাগত সৈনিকদের চলন্ত কাঠের ঘোড়া থেকে যখন-তখন নামা-ওঠা করার অভ্যাস করানো হ'ত। কখনো কখনো যুদ্ধের ভারী অস্ত্রপাতি—যথা—পরিখা খননের যন্ত্র, ঢাল, তলোয়ার, বর্শা, লোহার

টুপি প্রভৃতি সঙ্গে নিয়ে তাদের একাদিক্রমে ১৭ দিন পর্যন্ত দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে হ'ত।

এত ব্যবস্থা থাকলেও, পর্যায়ক্রমে কিছু শেখানোর কোন রীতি ছিল না। গ্রীকদের মতই তাদের সুনির্দিষ্ট কোন ধারাবাহিক শারীরিক শিক্ষার সুব্যবস্থা ছিল না; কতকগুলি বিশেষ ধরনের খেলাধূলা ও ব্যায়ামের মাধ্যমে যে শারীরিক শিক্ষা চলত, সে অনুশীলনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল কেমন ক'রে দক্ষ সৈনিক হওয়া যায়। সৈনিক হওয়ার জন্য যেটুকু না হ'লে নয়, সেই শিক্ষাটুকুই ছিল তাদের প্রধান কাম্য।

খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় শতকের শেষে রোম রাজ্যে কয়েকটি বিদ্যালয় খোলা হয়েছিল। কিন্তু সেগুলি বেশীদিন স্থায়ী হয়নি। কিন্তু খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় শতকে রোমের জাতীয় জীবনে দ্রুত পরিবর্তন দেখা দিতে আরম্ভ করে। ফলে, সেদেশের শিক্ষা-ব্যবস্থার মধ্যেও পরিবর্তন দেখা দেয়। রোমীয়রা তখন সার্থকনামা যোদ্ধা; ঐশ্বর্যে, শক্তিতেও তারা অদ্বিতীয়। তারা বাহুবলে যে যে দেশ জয় করেছিল, সেই সব দেশের যুদ্ধ-বন্দীদেরও তারা ক্রীতদাসে পরিণত করেছিল। তাদের সেই অমিত শক্তির সঙ্গে মগজের কোন যোগ ছিল না। ফলে, সেই শক্তি-স্ফীত সরকারী ব্যবস্থাপনার মধ্যে যে গলদ ছিল, তারই অপরিহার্য পরিণামরূপে বহু বিভাগে দুর্নীতি, চারিত্রিক অবনতি এবং নানাপ্রকার নৈতিক বিকার দেখা দিয়েছিল। বিলাসিতার চরমে পৌছে তারা বিকারগ্রস্ত হ'য়ে পড়েছিল। সেই সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং ধর্মীয় পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল, তার সঙ্গে জীবনকে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য তারা এথেন্সের আদর্শকে শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করেছিল।

ফলে, তখনকার রোমীয় জীবনধারায় অনুপ্রবেশ করেছিল গ্রীক প্রভাব। এর জন্য যে হঠাৎ কোন বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল, এমন নয়। এই অপ্রতিহত গ্রীক প্রভাবকে ব্যাহত করার জন্য প্লুটাক ও ক্যাটো সচেষ্ট হয়েছিলেন। এমনকি রোমীয় সরকার খ্রীঃ পূঃ ১৬১ অব্দে বিদেশী দার্শনিক এবং ছন্দ-রচয়িতাদের রোম রাজ্যে বসবাস করার অধিকার থেকে বঞ্চিত করার বহু চেষ্টা করেছিলেন। হেলেনিক প্রভাব থেকে সে-যুগের বিদ্যালয়গুলিকে মুক্ত করার প্রচেষ্টা চলেছিল খ্রীঃ পূঃ ৯২ অব্দ পর্যন্ত। এই সরকারী নির্দেশ অনুসরণ না করলে, কোন বিদ্যালয়কেই অনুমোদন দেওয়া হ'ত না। খ্রীঃ পূঃ ২৭ অব্দের পর যখন রোম সাম্রাজ্য নবকলেবরে গ'ড়ে উঠেছিল, তখন তদানীন্তন সম্রাটরা নব-প্রবর্তিত শিক্ষাধারার সংরক্ষণ ও প্রসারের জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন। অন্যদিকে, গ্রীক দর্শন ও সাহিত্য যাতে সভ্য জগতের সর্বত্র বিস্তারলাভ করে, তাঁদের সে উদ্যমই ছিল পাশ্চাত্য সভ্যতার ঐতিহাসিক কীর্তি।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হ'তে পারে যে, গ্রীক দর্শন বা সাহিত্যের ক্ষেত্রে সরাসরিভাবে রোমানদের কোনই অবদান ছিল না। সৃষ্টির দিক থেকে কথাটা সত্যি হ'লেও, সংগঠন বা সংরক্ষণের দিক থেকে কথাটা আদৌ সত্যি নয়। কারণ, তাদের সংগঠনে, প্রচারে এবং পৃষ্ঠপোষকতায় গ্রীক আদর্শ এবং দর্শন যে বহুবিস্তৃতি লাভ করেছিল, সে-কথা সর্বজনবিদিত। এই পরিবর্তনের ফলে গ্রীষ্টীয় ধর্মের পথ প্রশস্ত হয়েছিল; এবং তারই ফলে উল্লেখযোগ্য প্রভাব দেখা দিয়েছিল শারীরিক শিক্ষার ক্রমোন্মেষের ক্ষেত্রে।

গ্রীঃ পূঃ যুগের শেষে রোম সাম্রাজ্য সুবিস্তীর্ণ হয়ে পড়ে। ফলে, সেই ঐশ্বর্যপ্রাচুর্যের যুগে রোমবাসীরা বিলাসের স্রোতে গা ভাসিয়ে দেয়। আরামের আতিশয্যে তারা ক্রমেই শ্রমবিমুখ হয়ে পড়ে। ফলে, দেশরক্ষার জন্য পেশাদার সৈনিকের আমদানি করতে হয়। তখন সামরিক দায়িত্ব মুক্ত হ'য়ে রোমবাসীরা যে অখণ্ড অবসর লাভ করে, তা বিলাস-ব্যসনের চরম ইন্ধন যোগায়। রোমবাসীদের মন থেকে এথেন্সের সেই আদর্শ 'সুষ্ঠু দেহ সুন্দর মনের আবাস' কোথায় উবে যায়। ক্রমেই তাদের শারীরিক অবনতি ঘটে। যারা একদিন নানা প্রতিযোগিতায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ করত, তারা সর্ববিষয়ে গ্রহণ করতে থাকে নিষ্ক্রিয় দর্শকের ভূমিকা। নিশ্চিত মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে হিংস্র পশুর সঙ্গে মানুষের যে হাতাহাতি, সেই মারাত্মক খেলার আমদানি হ'ল দর্শকমহলে উত্তেজনা সৃষ্টি করার জন্য। সৌখিন লোকদের জন্য বিচিত্র স্নানাগার তৈরি হ'ল। সেখানে সর্বশ্রেণীর মানুষের যে অবাধ স্নানের ব্যবস্থা হ'ল, সেখানেই অভিজাত সম্প্রদায়ের লোকরা আরাম কেদারায় শুয়ে শুয়ে গাল-গল্প ক'রে, আড্ডা দিয়ে সারাদিন অতিবাহিত করত। সৌখিন বাবুদের তেল মাখিয়ে ডলাই-মলাই করার জন্য বেতনভুক্ চাকরও থাকত। ফলে, সেই হীনবীর্য রোমজাতি পরবর্তী কালে বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করতে অসমর্থ হ'ল।

খ্রীষ্টীয় প্রভাব ঃ

ঠিক সেই সময়ে খ্রীষ্ট ধর্মের প্রাদুর্ভাব। তখন একটা মহান আদর্শ মানুষের আচার-ব্যবহারে রূপান্তরিত হয়ে একটা রূপ পরিগ্রহ করেছিল। প্লেটো, য়্যারিস্টটল্ এবং স্টরিক দর্শন—যার আবেদন ছিল বুদ্ধিবৃত্তির কাছে,—তা মুষ্টিমেয় লোকেই অনুধাবন করতে পারত। যে খ্রীষ্ট ধর্মের প্রেরণা শিক্ষোদ্দীপক, তার আবেদন সর্বস্তরের সকল শ্রেণীর মানুষের হৃদয়াবেগের কাছে, তা সহজেই সকলের অন্তর স্পর্শ করে। খ্রীষ্টীয় ধর্মের শিক্ষণীয় দর্শন যে কিভাবে গ্রহণযোগ্য হবে, সেই সম্পর্কে দ্বৈত মতবাদ প্রথমদিকে গির্জার পাদরীদের মধ্যে আত্ম-প্রকাশ করেছিল। অনেকদিন পর্যন্ত একদল ধর্মযাজকদের ধারণা ছিল যে, খ্রীষ্ট ধর্মতত্ত্বের আদি প্রবর্তক হচ্ছেন গ্রীক

দার্শনিকরা ; কাজেই, তাঁদের আদর্শ গ্রহণে অশেষ মঙ্গল সাধিত হ'তে পারে। অন্যপক্ষে, বিরুদ্ধপন্থীরা মনে করতেন যে, এই সমস্ত দার্শনিকদের সাহিত্য ছিল পৌত্তলিকতার নামান্তর মাত্র ; কাজেই, সেগুলিকে খ্রীষ্ট ধর্মীয় শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত করলে, তা নিঃসন্দেহে খ্রীষ্টীয় মতবাদের পরিপন্থী হবে। পরবর্তী মতবাদটাই ধর্মযাজক তথা জনসাধারণের সমর্থন লাভ করে। খ্রীঃ পূঃ ৩৯৮ অব্দে একজন প্রধান বিশপ হুকুম জারি করলেন যে, কেউ আর খ্রীষ্টীয় আদর্শ-বিরোধী কোন বই-ই পড়তে পারবে না। অন্ধকার যুগ পর্যন্ত এর প্রভাব স্থায়ী হয়েছিল।

ইউরোপের অন্ধকার যুগ ঃ

রোম সাম্রাজ্যের পতনের অব্যবহিত পরেই, সাধারণ এবং শারীরিক শিক্ষার প্রচেষ্টা প্রায় অন্তর্হিত হ'ল। এর অর্থ কিন্তু এই নয় যে, বহিরাগতদের বিরোধিতার ফলেই শিক্ষার এতটা অধঃপতন ঘট্‌ল। এই বর্বর জাতিরা হিংস্র জন্তু-শিকারে অভ্যস্ত ছিল, এবং তারা যুদ্ধতুল্য প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করত। এর মাধ্যমেই যুদ্ধের প্রস্তুতি চলত। তখন সত্যিকার শারীরিক শিক্ষার প্রয়োজনটা অনেকটা অবান্তর হয়ে দাঁড়ায়। স্বেচ্ছাচারিতা এবং ভোগসর্বস্বতা তার স্থান অধিকার করে। 'খাও দাও স্ফূর্তি করো' এই নীতিই তখন প্রাধান্যলাভ করে। খ্রীষ্টীয় সন্ন্যাসের সেই ধুয়া— 'দেহটা শয়তানের আস্তানা, আত্মাটা ভগবৎ সম্পদ'—সাধারণের মনে দৃঢ়ীভূত হ'তে থাকে। এ সময়টা ইতিহাসে ইউরোপের অন্ধকার যুগ নামে অভিহিত।

বীর্যবত্তার যুগ ঃ

ইউরোপের কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্র বিনষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এবং ক্রসেড যুদ্ধের সময় (মুসলিম অভিযান প্রতিহত করার জন্য) স্থানীয় লর্ড সম্প্রদায়ের লোকরা ক্ষমতা-শালী হয়ে উঠেন। তারই ফলে 'ফিউডালিজিম' বা জমিদারি-প্রথার উদ্ভব হয়। তখনকার অভিজাত সম্প্রদায়ের কৃতিত্ব-প্রকাশের দুটি ক্ষেত্র ছিল—এক গির্জা, দ্বিতীয় হচ্ছে নাইটের সম্মান লাভ করা। দ্বিতীয় পর্যায়ের সম্মান লাভ করাটাই অধিকাংশ উচ্চবংশীয়দের কাছে ছিল প্রধান কাম্য। এই নাইট্‌রাই কালে বিশপ বা সন্ন্যাসীদের আসন দখল করেছিল। ফলে, তখনকার সমাজে তারাই ছিল সম্মান, খ্যাতি এবং প্রতিপত্তিতে সর্বপ্রধান।

নাইটত্ব-লাভের অনুশীলনী ঃ

নাইটত্ব-লাভের সাধনা ছিল কঠিন এবং সময়সাপেক্ষ। সাত বছর বয়সের সময় নাইটের সম্মান-লাভেচ্ছু বালকরা খ্যাতনামা প্রভুর গৃহে বালক-ভৃত্যরূপে প্রবেশ করত। তারা দৈনন্দিন কাজের ফাঁকে ফাঁকে ঘোড়ায় চড়া, সাঁতার কাটা,

লাফানো, তীর ছোঁড়া প্রভৃতি শিক্ষা করত। প্রায় চোদ্দ বছর বয়সের সময় বালক-ভৃত্যরা চৌকস হয়ে উঠত ; এবং নাইটত্ব-লাভের প্রতিযোগিতায় বা যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য বিশেষভাবে নিজেদের প্রস্তুত করত। তারা সুদীর্ঘ পথে দৌড়ানোর অভ্যাস করত, বিনা মইয়ের সাহায্যে প্রাচীর অতিক্রম করা, তরবারি চালনা, চলন্ত ঘোড়া থেকে উঠা-নামা, গদা ঘোরানো, কুঠার চালনা প্রভৃতি যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করত। অভিজাত সম্প্রদায়ের মহিলাদের কাছ থেকে তারা সামাজিক আদব-কায়দা এবং আচার-আচরণ শিক্ষা করত। তারা যাতে রৌদ্রে, হিমে অবিচলিত থাকতে পারে, কিছুতেই যাতে ক্লান্তিতে ভেঙে না পড়ে, প্রয়োজনবোধে বিনিদ্র রজনী যাপন করতে পারে—এমনতর বিচিত্র সহনশীলতাও তারা অভ্যাস করত। ২১ বছর বয়সের সময় পরীক্ষান্তে যখন দেখা যেত যে, স্কোয়ার ভৃত্যরা সমস্ত শিক্ষায় দক্ষতা অর্জন করেছে, তখন নাইটত্ব-লাভের অগ্নি-পরীক্ষায় তাদের অবতীর্ণ হ'তে হ'ত। সেই উপলক্ষে যে সামাজিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হ'ত, সেই উৎসবে প্রতিদ্বন্দ্বীরা বিচিত্র প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করত। এই সব অনুষ্ঠানে ধনী অভিজাত সম্প্রদায়ের যুবকরাই অংশগ্রহণ করার সুযোগ পেত, সেখানে সাধারণের প্রবেশাধিকার ছিল না।

দ্বিতীয়তঃ, এই ধরনের অনুশীলনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল অকুণ্ঠ বাহবা পাওয়া, প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করা। যে শারীরিক শিক্ষার উদ্দেশ্য দেহ-মনের বিকাশ, নাইটত্ব-লাভের শিক্ষার লক্ষ্য আদৌ সেদিকে ছিল না।

এই সব প্রতিযোগিতার জন্য যে সব অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হ'ত, সেটা মূলতঃ ছিল উত্তেজনা-উদ্দীপক আমোদ-প্রমোদের ব্যাপার, এবং পরোক্ষভাবে ছিল যুদ্ধ-প্রস্তুতির অনুশীলন।

প্রতিযোগিতার পূর্বে মাঠের উভয় প্রান্তে ভাবী নাইট্‌রা অশ্বপৃষ্ঠে অবস্থান করত, এবং নির্দিষ্ট সংকেত পাওয়া মাত্রই তারা ঘোড়া ছুটিয়ে মধ্য-মাঠে গিয়ে হাজির হ'ত। তারপর প্রতিদ্বন্দ্বীরা নির্বাচিত হ'লে, প্রতিযোগীরা পরস্পর মুখোমুখি হয়ে চরম নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করত। সে প্রতিযোগিতা ছিল ভীষণ সংগ্রামের সামিল, তাতে কেবল রক্তক্ষয়ই হ'ত না, বহু প্রাণও বিনষ্ট হ'ত।

'একক লড়াই'-এর ক্ষেত্রে ভাবী নাইট্‌রা মাঠের উভয় প্রান্তে চরম নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করত। তারপর সংকেত পাওয়া মাত্রই তারা অশ্বারোহণে তড়িৎ গতিতে অগ্রসর হয়ে পরস্পরকে আক্রমণ করত। হয়তো শিরস্ত্রাণ লক্ষ্য ক'রে, নয়তো বা প্রতিপক্ষের বক্ষ-বর্ম ভেদ করার জন্য ভীষণভাবে নির্বিচারে তারা বর্শা চালনা করত। যতক্ষণ না প্রতিযোগীদের কেউ ঘোড়া থেকে প'ড়ে যেত, অথবা

কারুর বর্শাফলক ভঙ্গ হ'ত, ততক্ষণ পর্যন্ত কেউ সে সংগ্রামে বিজয়ের সম্মান পেত না।

পরবর্তী কালে যখন এই প্রতিযোগিতার ভীষণতা দূরীভূত হয়, তখন এই অনুষ্ঠানগুলি কেবলমাত্র সামাজিক রীতিতে পর্যবসিত হয়। তখন পোশাক-পরিচ্ছদ, সুন্দর সুন্দর ঘোড়া এবং তলোয়ার খেলার বিচিত্র ভঙ্গী প্রদর্শন করাটাই অনুষ্ঠানের প্রধান দ্রষ্টব্য বিষয় হয়ে উঠে।

আগ্নেয় অস্ত্র আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তি-সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা দূরীভূত হয় এবং সেই সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই বীর্যবত্তা প্রদর্শনের যুগেরও অবসান ঘটে।

ছয় থেকে ষোড়শ শতাব্দী মধ্যযুগের অন্তর্গত। সে সময় সন্ন্যাস, পাণ্ডিত্য দেশের শিক্ষাধারাকে প্রভাবিত করেছিল। শারীরিক শিক্ষার ক্ষেত্রেও তার প্রভাব প্রকট হয়ে উঠে। যে দেহ শয়তানের আবাস, সে দেহের প্রতি স্বাভাবিক অবহেলার ভাব দেখা দিয়েছিল, এবং আত্মিক উন্নতির দিকে তথা নৈতিক তত্ত্ব-মুখী হয়েছিল মানুষের সমস্ত প্রয়াস। বীর্যবত্তার স্থান অধিকার করেছিল সাধুজনোচিত নৈতিক চেতনা। যারা নাইটত্বের জন্যও অনুশীলন করত, তাদেরও প্রসঙ্গক্রমে ধর্মাচরণ শিক্ষাও করতে হ'ত। তখনকার ধর্মীয় শপথের মূল কথা ছিল যে, আমরা প্রত্যেক গির্জার মর্যাদা রক্ষার জন্য লড়াই করব, যেমন ক'রেই হোক নারীজাতির সম্মান রক্ষা করব, সাথীর জন্য নিজের রক্ত দিতেও কুণ্ঠিত হ'ব না; এবং দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনই হবে ধর্মীয় নীতি। শিক্ষার পুনরুত্থান-আন্দোলনে বীর্যবত্তার প্রভাবও কম উদ্দীপনা যোগায়নি। সেটা চতুর্দশ বা পঞ্চদশ শতাব্দীর কথা। গ্রীক ও রোমীয় শিক্ষার পুনরুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে রাজাধিকরণের আচার-আচরণের শিক্ষা নাইটত্ব-লাভের অনুষ্ঠানের উপর কিছুটা গুরুত্ব আরোপ করেছিল।

বিদ্যাবত্তার বিকাশ ঃ

দ্বাদশ শতাব্দী থেকে খ্রীষ্ট ধর্ম এবং ব্রহ্ম-বিদ্যা সম্পর্কে নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর প্রসার দেখা যায়। বিভিন্ন জিজ্ঞাসাবাদ এবং, বংশাজিত বহু প্রশ্ন প্রকট হয়ে উঠে। সেই জিজ্ঞাসার পরিপ্রেক্ষিতে বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে ধর্মতত্ত্বের নূতন বিশ্লেষণ ও তত্ত্ব ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এই বিচার-বিবেচনার যুগকে বলা হয় বিদ্যাবত্তার যুগ। বিদ্যাবত্তার দ্বৈত প্রভাবে শারীরিক শিক্ষার ক্ষেত্রে যে পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিল, তার প্রথমটি হচ্ছে ধর্ম-সমস্যা সমাধানের জন্য প্রামাণিক নজিরের বা উদ্ধৃতির আশ্রয় নেওয়া, তার ফলে অনুসন্ধান ও সন্দেহের নিরসন ঘটে; দ্বিতীয়তঃ হচ্ছে পরিণত দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে নির্দেশ ও তত্ত্বের তার্কিক ও সুসঙ্গত বিচার করা।

এই দুটি ভ্রান্ত মতবাদ অপসারণের জন্য প্রায় অর্ধ-শতাব্দীকাল সময় লেগেছিল। বর্তমানে অবশ্য স্বীকৃত হয়েছে যে, শিশুদের আচার-আচরণ এবং মনোভাবকে এমন ভাবে গ'ড়ে তুলতে হবে যে, শিশুরা সত্যিকার জীবন-সমস্যার সম্মুখীন হয়ে বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে সমাধানের পথ বেছে নিতে শিখবে। আরও স্বীকৃত হয়েছে যে, প্রত্যেকটি শিক্ষণ-নির্দেশ মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তির উপর স্থাপিত হবে, সেখানে তর্কশাস্ত্রের কোন স্থান নেই। এককথায়, তখনই শিশুরা কিছু শিখতে পারবে, যখন শিশুদের অনুভূতি সজাগ হবে, অথবা শিশুদের আগ্রহ আছে এমন কাজ করবার জন্য যখন তাদের ভিতর থেকে শেখার তাগিদ আসবে; তখনই তাকে শেখাতে হবে।

নবজাগরণ বা রেনেসাঁস যুগের শারীরিক শিক্ষা ঃ

পরকালের জন্য প্রস্তুত হওয়াই ছিল মধ্যযুগের শিক্ষাদর্শ। যে শিক্ষা সমাজের কাজে লাগে, অথবা বর্তমান জীবন আনন্দ ও সন্তুষ্টিতে ভ'রে উঠে, সে আদর্শ মধ্যযুগের শিক্ষায় কোন স্বীকৃতি পায়নি। বর্বরদের আক্রমণের ফলে যখন প্রাচীন সভ্যতা শেষ অবস্থায় পৌঁছেছিল, তখন গির্জা ও মঠগুলিই শিক্ষায়তনের স্থান অধিকার করে। দ্বাদশ শতাব্দীতে যদিও একাধিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল, তথাপি তখন শারীরিক শিক্ষার কোন ব্যবস্থা ছিল না। ফলে, তখনকার ছাত্র মদ্যপান, জুয়াখেলা এবং হাতাহাতি ক'রেই নাগরিক জীবনের অবসর বিনোদন করত। অভিজাত সম্প্রদায়ের ছেলেরা বীর্যবত্তা প্রকাশের উপযোগী কোন-না-কোন অনুশীলনে লিপ্ত হ'ত। চতুর্দশ শতকে মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে যেন এতদিনের রুদ্ধ-শিক্ষার দ্বার সর্বসাধারণ্যে উন্মোচিত হ'ল। অনেকদিন পর যেন নূতন শিক্ষার আলোকে লোকে গ্রীক ও রোমীয় সভ্যতাকে হৃদয়ঙ্গম করতে শিখল। প্রাচীন সাহিত্য ও দর্শন অধ্যয়নের ফলে পারলৌকিক বিশ্বাস ও অন্ধ ধর্ম-সংস্কারের হাত থেকে মানুষ যেন রেহাই পেয়ে বাঁচল।

গ্রীক ও রোমীয় আদর্শ অনুসারে নবজাগরণের যুগের শিক্ষকরা কেবল শারীরিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা উপলব্ধি করলেন না, প্রত্যেক শিক্ষণ-পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত করলেন শারীরিক শিক্ষাকে।

এই আন্দোলনের প্রধান হোতা হিসাবে ভিল্‌ট্রোরিনো-ডা-ফেল্‌ট্রার (১৩৭৮—১৪৪৬) নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি ছিলেন একজন ইটালীয়ান শিক্ষাবিদ্। তিনিই শারীরিক ও মানসিক শিক্ষার মধ্যে যে সংযোগ স্থাপন করলেন, তার ফলে প্রত্যেকেই নিজ নিজ ক্ষমতা ও সামর্থ্য অনুযায়ী সে শিক্ষা গ্রহণের উপযুক্ত হ'ল। গ্রীক-লাতিন ভাষা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ভাস্কর্য-বিদ্যা, নৃত্যকলা,

ঘোড়ায় চড়া, সাঁতার কাটা, লাফানো, দৌড়ানো, মল্লযুদ্ধ, মৃগয়া, ধনুর্বিদ্যা প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়ার সুব্যবস্থা হ'ল। প্রত্যেকেই যাতে পান ও আহারে মিতাচারী হ'তে পারে, সে শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপিত হ'ল। ঋতুগত আবহাওয়া-নির্বিশেষে প্রত্যেকেই যাতে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে নিত্য ব্যায়াম অভ্যাস করতে শেখে, তিনি তারও ব্যবস্থা ক'রে দিলেন। বিকলাঙ্গ শিশুদের জন্য তিনি যে সংশোধনী ব্যায়ামের প্রবর্তন করলেন, সেটাই শারীরিক শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি বিশেষ অবদান—তাঁর নিজস্ব কীর্তি।

আরও একাধিক শিক্ষাবিদের মধ্যে মাইকেল ডে-মনটাইজিন-এর নাম উল্লেখযোগ্য (১৫৮০—১৬৯২)। তিনি ছিলেন ফরাসী প্রবন্ধকার। তিনি তাঁর প্রথম প্রবন্ধ-পুস্তকের পঁচিশ অধ্যায়ে মানব-স্বাস্থ্য সম্পর্কে বহু মূল্যবান মন্তব্য করেছেন। তাঁর মূল বক্তব্য বিষয় এই যে, আমাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি ব্যায়াম এবং যে-কোন খেলাধূলার—যেমন দৌড়ানো, কুস্তি, নাচ-গান, মৃগয়া, ঘোড়ায় চড়া প্রভৃতি—প্রতিক্রিয়া আমাদের অধ্যয়নের যে অপরিহার্য অঙ্গ, তা প্রমাণিত হবে। আমরা যে শিক্ষা লাভ করেছি, তা কেবল দেহ বা মনের জন্য নয়, সমগ্র মানুষের জন্য। দেহ-মন যে ভিন্ন নয়, সেটাই জানতে হবে সর্বাগ্রে। প্লেটোর ভাষায় 'দেহ মন জুড়ি ঘোড়ার গাড়ির মত, দুটোর একটাকে বাদ দিয়ে, গাড়ি চলতে পারে না।'

নবজাগরণের যুগের যে বিশ্বাস বহুদিন প্রাচীন ও গতানুগতিকতার সমস্ত কিছুকেই আঁকড়ে ছিল, ক্রমে ক্রমে সে অন্ধ-আনুগত্য বাস্তববাদী যুক্তিতর্কের প্রভাবে অবলুপ্ত হ'তে আরম্ভ করে।

শারীরিক শিক্ষা কেবল বৈরাগ্যনীতি, বীর্যবত্তা বা বিদ্যাবত্তা দ্বারাই প্রভাবিত হয়নি, ক্রমান্বয়ে বস্তুতান্ত্রিকতা, মানবমুখী বাস্তবতা, সমাজমুখী বস্তুতান্ত্রিকতা, এমনকি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাস্তবতাও এ শিক্ষার ক্ষেত্রে যুগে যুগে নব নব চেতনা ও পরিবর্তন এনেছিল। শিক্ষার যে পুনরুত্থান আরম্ভ হয় চতুর্দশ শতকে, তার দ্বারা শিক্ষাক্ষেত্রে প্রাচীন গ্রীক আদর্শ, দর্শন এবং ভাবধারা পুনঃপ্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশের ধর্ম-সংস্কার করা—যাঁরা মাতৃভাষার মাধ্যমে ছেলেদের শিক্ষা দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন—শিক্ষার ক্রম-বিকাশে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। অন্যদিকে যাঁরা বস্তুতান্ত্রিকতার আন্দোলনের নেতা ছিলেন,—যে আন্দোলনের জাগরণ ষোড়শ শতকে—তাঁরা শিক্ষার বিষয়বস্তু এবং পদ্ধতি নিয়ে মাথা ঘামিয়েছিলেন। এই মতবাদীদের সর্বপ্রধান ছিলেন জে. এ. কমোনিয়াস।

তাঁর সেই মতবাদ—শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রকৃতির অবদান—শারীরিক শিক্ষাকেও বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। এছাড়া শিক্ষার ক্ষেত্রে মানবিকতার যে বিশিষ্ট স্থান আছে, সে সম্পর্কে কবি মিলটন জোরালো ওকালতি করেছিলেন। শিক্ষার ক্ষেত্রে যে সমাজমুখী বাস্তবতার বিশিষ্ট স্থান আছে, জন লক বিচিত্র শিক্ষাতত্ত্বের মাধ্যমে সেই মতবাদ প্রচার ও প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাস্তববাদীরা প্রচার করেছিলেন যে, ধরা-ছোঁয়ার অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই শিশু-শিক্ষা জীবন্ত ও প্রাণবন্ত হয়ে উঠে। শিশুর দুই মুঠির মধ্যে যে অভিজ্ঞতার জগৎ সীমাবদ্ধ, সেই শিশুর শিক্ষা কর্মকেন্দ্রিক হওয়া উচিত। ফ্রানসিস বেকন এই মতবাদ প্রচার করেছিলেন। এবংবিধ বিভিন্ন মতাবলম্বী শিক্ষাবিদ্‌রাই আর যাই বলুন না কেন, তাঁরা কায়মনোবাক্যে শিক্ষাকে বাস্তবমুখী এবং এককথায় শিশু-কল্যাণকর ক'রে তুলতে চেয়েছিলেন।

———

দ্বিতীয় অধ্যায়

বিদ্যালয়ের পাঠ্য-তালিকায় স্বাস্থ্যের স্থান

স্বাস্থ্য অধ্যয়নের বিষয়-বস্তু নয়, আচরণ-সাপেক্ষ অভ্যাস। স্বাস্থ্যের নীতি-গুলিকে **জানাটাই সব নয়**, সেগুলিকে **মেনে চলাটাই স্বাস্থ্য। জ্ঞানে, আচরণে, অভ্যাসে যে প্রক্রিয়া জীবনকে নীরোগ ও সুস্থ করে, সেটাই সত্যিকার স্বাস্থ্য-শিক্ষা।** স্বাস্থ্যের বই থেকে সে নীতিগুলিকে জানা যায় নিছক জ্ঞানরূপে, নিত্য অনুসরণের মধ্য দিয়ে তাকে পাওয়া যায় জীবনৈশ্বর্যের আনন্দে, দেহ-মনের সম্পদ্‌রূপে। তার ব্যবহারিক মূল্য চোদ্দ আনা, তাত্ত্বিক মূল্য দু'আনা মাত্র। অথচ স্বাস্থ্য-শিক্ষার ক্ষেত্রে যে অভ্যাস এতটা ব্যাপক স্থান জুড়ে আছে, যেটার ব্যবহারিক মূল্য জীবনব্যাপী—সেটার উপর তেমন গুরুত্বই দেওয়া হয় না। বিদ্যালয়ের পাঠ্যভুক্ত **স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান পড়ানো হয় পরীক্ষা পাসের জন্য, সুস্থতার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য নয়।** ফলে, সে স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান থাকে কেতাবাশ্রিত জ্ঞান হয়ে, তা জীবন-সমৃদ্ধির কাজে লাগে না।

অথচ জীবনের জন্যই যার এত প্রয়োজন, তার আয়োজন দরকার শৈশব থেকেই। শৈশবের যে অভ্যাস আজীবনের আচরণ হয়ে থাকে, প্রাথমিক বিদ্যালয়েই তার গোড়াপত্তন হওয়া উচিত। ইংলণ্ডের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সমালোচনা-সমিতির বিবরণীতে এই কথাটাই ঘোষিত হয়েছে। বিবরণীতে বলা হয়েছে যে, "We desire to see the child an active agent in his early schooling, making his approach to the activities necessary for an understanding of the body of human civilisation and for an active participation in its processes through his own experiences and his own activities and relating to his growing knowledge at all points to the world in which he lives." আমরা দেখতে চাই যে, ছাত্র-জীবনের প্রথম থেকেই শিশুরা হবে কর্মঠ প্রতিনিধি, যাদের দৃষ্টি থাকবে সেই প্রয়োজনীয় কার্যাবলীর দিকে, যার দ্বারা মানবীয় সভ্যতাকে উপলব্ধি করা যাবে;

এবং যে জগতে সে বাস করে, সেই জগৎ-প্রবাহে সে নিজ অভিজ্ঞতায়, কার্যকলাপে, এমনকি তার ক্রমবর্ধমান জ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে সকল দিক থেকেই সক্রিয় অংশ গ্রহণ করবে।

কাজেই বুঝা যাচ্ছে যে, স্বাস্থ্য-শিক্ষার প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে **স্বয়ংসম্পূর্ণ দেহ**। সেই দেহের উন্নতি ও সুস্থতাই স্বাস্থ্য-শিক্ষার পরিণতি। যে বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা এ-বিষয়ে বিশেষ সচেতন, যেখানকার পরিবেশ অনুকূল, শিক্ষকদের দৃষ্টি প্রসারিত, সেখানকার ছাত্ররাই যথার্থ স্বাস্থ্য-শিক্ষা লাভ করতে পারে। সর্বতোমুখী পরিচ্ছন্নতাই—ব্যক্তিগত এবং পারিপার্শ্বিক—বিদ্যালয়ের দৈনন্দিন জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ। **প্রাতরুত্থান, বিশুদ্ধ বায়ু সেবন, উপযুক্ত খাদ্য এবং নিয়মিত বিশ্রাম—এবংবিধ স্বাস্থ্যকর ব্যবস্থার দিকে যে বিদ্যালয়ের লক্ষ্য, সে বিদ্যালয়ের ছাত্রদের স্বাস্থ্যোন্নতিটাই সহজ, স্বাভাবিক**। যে দৈহিক সুস্থতার সঙ্গে মনের স্বাস্থ্যও জড়িয়ে আছে, সেই দেহের স্বাস্থ্যোন্নতিটাই তো শিক্ষার প্রথম পাঠ। কারণ, মনের যত প্রবণতা, প্রেরণা এবং কর্মোদ্দীপনা আসে দৈহিক সামর্থ্য থেকে। কিন্তু দেহ যার স্বাস্থ্যহীন, তার মানসিক শক্তিও তত ক্ষীণ। দেহ থেকে যে মন শক্তি পায় না, সে মন দুর্বল হ'লে মননশীলতার পথে অগ্রসর হবে কি ক'রে? নিত্য দেহের চিন্তায় যে মন অস্থির, সে মন একাগ্র হয়ে নিবিষ্টভাবে জ্ঞান আহরণ করবে কি ক'রে? তাই একজন শিক্ষাবিদ্ বলেছেন যে, দেহ-বৃক্ষের পরিচর্যা করো, তবেই মনের ফুল ফুটবে। শিক্ষার লালন হবে শরীর-পালন থেকে। অর্থাৎ, স্বাস্থ্য-রক্ষাই হবে শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা। সুস্থ দেহাশ্রিত সবল মনই চুম্বকের মতো জ্ঞানকে ধ'রে রাখতে পারে। তার অন্যথা ঘট্‌লে—শিক্ষার নির্দেশ যতই অমূল্য হোক না কেন—কোন সুফলই পাওয়া যাবে না। জীবন-প্রস্তুতির দিকে যে শিক্ষার দৃষ্টি, স্বাস্থ্য অর্জনটাই হবে তার প্রধান লক্ষ্য।

কাজেই, **স্বাস্থ্য-শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করাটাই এই ব্যবস্থার শেষ দায়িত্ব পালন নয়**। এ ছাড়া, আরও কতকগুলি করণীয় কর্তব্য আছে। প্রথমতঃ, কেন যে শিশুরা শরীর-পালনের নীতিগুলি অনুসরণ করবে, সে কথাটা তাদের বুঝিয়ে দিতে হবে। যতক্ষণ না তারা বুঝতে পারছে যে, তারা কেন এবং কি করছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তারা কেবল স্বাস্থ্যের বইগুলিই ঘরে বয়ে নিয়ে যাবে, অভিজ্ঞতাগুলিকে নয়। এমনকি বিদ্যালয়ে শেখানো এই স্বাস্থ্যকর অভ্যাসগুলিকে সে তার বিদ্যালয়োত্তর জীবনে কাজে লাগাবে না। এই কারণে কতকগুলি সু-অভ্যাস গঠনে যত্নবান হ'লে চলবে না, তার পিছনে আদর্শ ও এমন শক্তিশালী ভাবপ্রবণতার ভিত্তি রচনা করতে হবে যে, সে অভ্যাস তার আজীবনের সাথী হয়ে

থাকবে। দ্বিতীয়তঃ, বিদ্যালয়-পরিবেশের জনসাধারণের অজ্ঞানতাবশতঃ বাইরে থেকে কোন মহামারীর প্রকোপ বা কোন অনিষ্টকর প্রভাব, যাতে বিদ্যালয়ের কোন ক্ষতি করতে না পারে, সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে। কাজেই, শিশুর মঙ্গলের জন্যই প্রয়োজন-বোধে যে নিরাপত্তা ও সুব্যবস্থার দরকার, সেই কারণেই স্বাস্থ্য-শিক্ষার অবশ্য প্রয়োজন। এই জ্ঞানকে শক্তিশালী ক'রে তুলতে হবে ব্যবহারিক প্রয়োগের দ্বারা; আবার সে অভ্যাসের ভিত্তিভূমি হবে জ্ঞান। তবেই তত্ত্ব ও ব্যবহারিক জ্ঞানের মধ্যে আসবে একটা সমতা।

স্বাস্থ্য-শিক্ষার এমন কতকগুলি তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য আছে, যা পাঠ্যক্রমের অন্যান্য পাঠ্য-বিষয় থেকে একে স্বতন্ত্র ক'রে রেখেছে। এই বিষয়-বস্তুর সঙ্গে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর একটা ব্যক্তিগত নিগূঢ় সম্পর্ক ও দৈহিক প্রয়োজনের দিক আছে। এ ছাড়া, জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনেক তথ্য ও শিক্ষণীয় অনেক **কিছুরই আধার হচ্ছে মানুষের দেহ।** কাজেই, স্বাস্থ্য-বিদ্যা অধ্যয়ন ও অভ্যাসের মাধ্যমে আমরা প্রত্যক্ষভাবে লাভ করি সুস্থ সবল দেহ এবং পরোক্ষভাবে জানি দেহ-যন্ত্রের ক্রিয়া-কলাপ, গঠন-বৃদ্ধি, শারীরতত্ত্ব এবং তার রহস্যকে। জ্ঞানে, আচরণে এই যে দ্বৈত ফল লাভ, শিক্ষার দিক থেকে তা কম বড় কথা নয়।

স্বাস্থ্য-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ক্রমশঃই যেন জন-চেতনা বাড়ছে। স্বাস্থ্যই যে জীবনের সম্পদ্ ও ভবিষ্যতের সহায়, এ কথাটাই আজ যেন বিশেষভাবে স্বীকৃতি পাচ্ছে। বর্তমানের একজন শিক্ষাবিদ্ তাই বলেছেন যে, স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান যখন সুস্থ জীবন-যাপনের প্রধান অবলম্বন, তখন জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত তথ্যরূপে তাকে দেখলে চলবে না; তার প্রত্যেকটি নীতি যাতে বিদ্যালয় থেকে ছেলেদের ঘরে ঘরে পৌঁছে, তাদের ব্যক্তিগত জীবনকে সমৃদ্ধ করে, সেদিকে বিশেষ নজর দিতে হবে। স্বাস্থ্য-শিক্ষার ব্যবহারিক প্রয়োগটা এমনই ব্যাপক হওয়া উচিত যে, সরাসরিভাবে যেন তার প্রভাব শিশুদের আচরণের অঙ্গীভূত হয়ে যায়। অনেক সময় বয়স্কদের অবগতির জন্য স্বাস্থ্য-বিদ্যা সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান পরিবেশনের প্রয়োজন হয়; কিন্তু সেই জ্ঞান যতক্ষণ না তাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতা এবং প্রয়োজনের কাজে লাগে, ততক্ষণ সেই তথ্য থাকে অকেজো হয়ে।

এ হেন স্বাস্থ্য-শিক্ষার এমন একটা বিশেষ শিক্ষণ-কাঠামো থাকা দরকার, যেগুলি সরাসরিভাবে শিশু-স্বাস্থ্যকে প্রভাবিত করবে। কাজেই, প্রত্যেক বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত এমন স্বাস্থ্যকর শিক্ষণ-ব্যবস্থা—যথা শারীরিক অনুশীলন, নিয়ন্ত্রিত খেলাধূলা, গৃহস্থালির কাজ, এমনকি জীব-বিদ্যার জ্ঞান,—যা শিশুর দেহ-মনের সুস্থতা, আনন্দ এবং ক্রম-বিকাশকে অক্ষুণ্ণ রাখবে।
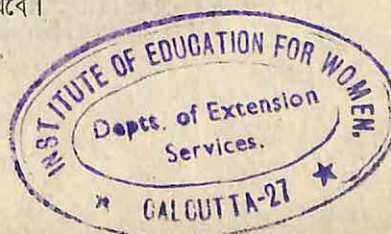
১। স্বাস্থ্য সম্পর্কে সঠিক মনোভাবের প্রয়োজনীয়তা ঃ

প্রত্যেক স্বাস্থ্যকর অভ্যাসের পিছনে আছে একটা সাগ্রহ মনোভাব। সেই মনোভাব (attitude) থেকে যে মূল্য-বোধ জন্মে, তার নিরিখেই স্বাস্থ্য-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা নির্ধারিত হয়। যখনই সেই প্রয়োজনকে উপলব্ধি করা যায়, তখনই আরম্ভ হয় স্বাস্থ্য-চর্চা। এর জন্য দ্বিবিধ প্রস্তুতি চাই। বিদ্যালয় আর গৃহ হচ্ছে সেই অনুশীলনের ক্ষেত্র। তাই প্রত্যেক শিশু-বিদ্যালয়ের কর্তব্য কেবল স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান পড়ানো নয়, স্বাস্থ্য-নীতিকে অনুসরণ ক'রে তারা যাতে তার মূল্য বুঝতে শেখে, পাঠ্য-বিষয়গুলি যাতে তাদের নিত্য আচরণের অঙ্গীভূত হ'তে পারে, সেদিকে দৃষ্টি দেওয়াও দরকার। তাছাড়া, এমনভাবে শিশুদের মধ্যে স্বাস্থ্যকর মনোভাবগুলিকে জাগ্রত ক'রে তুলতে হবে যে, তার দ্বারা ব্যক্তি ও সমাজের মঙ্গল সাধিত হ'তে পারে। যতক্ষণ না বিদ্যালয়ের প্রচেষ্টায় ছেলেদের মধ্যে স্বাস্থ্য সম্পর্কে এমনতর উদার চেতনা আসবে, ততক্ষণ পর্যন্ত ছাত্ররা রোগ-প্রতিষেধক ব্যবস্থায় বা সংক্রামক ব্যাধি-নিয়ন্ত্রণে সক্রিয় অংশ গ্রহণেচ্ছু হবে না। স্বাস্থ্য সম্পর্কে শিশুদের যখন এই মনোভাব গড়ে উঠবে, তখন ছেলেরা কেবল ছাত্রাবস্থায় দেহে-মনে সুস্থ জীবন যাপন করতে পারবে তা নয়, ছাত্রোত্তর জীবনেও তারা আশীর্বাদ লাভ করবে।

২। স্বাস্থ্য-শিক্ষার পরিকল্পনা ঃ

এইজন্য স্বাস্থ্য-শিক্ষার পরিকল্পনাকে ঢেলে সাজতে হবে। স্বাস্থ্য-শিক্ষা যাতে প্রত্যেকের জীবনে কাজে লাগে, সেজন্য স্বাস্থ্য-শিক্ষার নূতন পরিকল্পনা প্রণীত হওয়া উচিত। সে স্বাস্থ্য-পরিকল্পনায় থাকবে জ্ঞান ও প্রয়োগের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য।

নিম্নলিখিত ত্রিবিধ বিধি-ব্যবস্থার দিকে থাকবে তার দৃষ্টি নিবদ্ধ। যথা—প্রথমতঃ থাকবে স্বাস্থ্যের দিকে জাগ্রত প্রকৃত মনোভাব, দ্বিতীয়তঃ থাকবে স্বাস্থ্যকর আচরণের দিকে দৃষ্টি, আর তৃতীয়তঃ থাকবে স্বাস্থ্যকর জীবন-সম্পর্কিত প্রকৃত জ্ঞান ও ধারণা।

এই প্রসঙ্গে চাই শিশুদের সক্রিয় সহযোগিতা। প্রত্যেকটি পরিকল্পনা এবং পাঠ্য-বিষয়ের সমস্ত কিছু নির্ভর করে শিশু এবং শিক্ষকের মনোভাবের উপর। তাই গোড়াতেই দেখতে হয়, কিভাবে শেখানো হচ্ছে এবং তার কতটুকু শিশুরা গ্রহণ করছে। এর উপরই অধ্যয়ন ও অনুশীলনের সাফল্য অনেকখানি নির্ভর করে। শিশুদের কতকগুলি স্বাস্থ্যকর অভ্যাস গঠন করিয়ে দেওয়া, তাকে স্বাস্থ্য-সম্পর্কিত জ্ঞান দান করাটাই শিক্ষকের প্রধান কর্তব্য নয় ; প্রত্যেকটি শিশুর মনে যাতে স্বাস্থ্যের প্রতি অনুরাগ জন্মে, যাতে সেই কাজে তাদের সক্রিয় সহযোগিতা পাওয়া যায়, সেদিকেও দৃষ্টি দেওয়ার বিশেষ প্রয়োজন। স্বাস্থ্যের অনুশীলনটা যেন পাঠানুযায়ী

কেবল দায়িত্ব পালনের বিষয় হয়ে না থাকে, সেটা যেন কোন নির্দেশের অপেক্ষা না রেখেই স্বেচ্ছিক কাজ হয়ে দাঁড়ায়। স্বাস্থ্য-সম্পর্কিত জ্ঞান পরিবেশনের সময় শিক্ষক কতটা জানেন, কি নূতন তথ্য জানাতে চান, সেটা বড় কথা নয় ; সে সম্পর্কে শিশুরা কি জানতে চাচ্ছে, কি প্রশ্ন করছে, সেটাই প্রধান বিচার্য বিষয়। কেননা শিক্ষক যতই শিশুর ধারণা ও উদাহরণগুলিকে কাজে লাগাতে পারবেন, ততই সে কাজে শিশুর প্রেরণা স্বতঃপ্রণোদিত হবে। তখন শিশুর সক্রিয় সহযোগিতায় যে-কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করা শিক্ষকের পক্ষে সম্ভব হবে। যে পরিকল্পনায় শিশুদের কোন অবদান নেই, যে কাজে শিশুরা ভাবে না, শিক্ষক ভাবেন, সেখানে শিশুরা কর্তব্যের খাতিরেই কিছু করে। তাতে কি শিশুদের প্রাণের চাহিদা, মনের ক্ষুধা মেটে ?

শিশুদের গৃহ-পরিবেশ সম্পর্কে শিক্ষকের ধারণা ঃ

দ্বিতীয়তঃ, স্বাস্থ্য-পরিকল্পনা রচনার সময় শিশুদের সার্বজনীন প্রয়োজন এবং প্রত্যেকের গৃহ-পরিবেশের কথা ভাবতে হয়। গৃহ-পরিবেশ শিশুর মনোভাব গঠনে সাহায্য করে। কাজেই, কে কোন্ গৃহ-পরিবেশ থেকে এসেছে,—জনবহুল শহর, না নিভৃত পল্লী অঞ্চল থেকে—সে কথাটা জানা থাকলে, শিক্ষকরা সেই অভিজ্ঞতাকে ভালভাবে কাজে লাগাতে পারবেন। ঘিঞ্জি অঞ্চলের ছেলেদের যেমন উন্মুক্ত মাঠে অবাধ বিচরণের প্রয়োজন, তেমনি দরিদ্র ঘরের ছেলেদের জন্য দরকার উপযুক্ত খাদ্য সরবরাহের। শিশুর এই অবস্থার কথা গোপনে জানতে হবে। তা না জানতে পারলে, তার দেহ-মনের প্রয়োজন মেটানো যাবে কি ক'রে ? সহানুভূতি ও সদ্ব্যবহার দ্বারা শিশুর মনে প্রেরণা যোগাতে পারলেই, স্বাস্থ্য-পরিকল্পনার যে-কোন কাজেই তাদের সক্রিয় সহযোগিতা পাওয়া যাবে। অঞ্চল-বিশেষের প্রয়োজনে এবং পরিস্থিতিভেদে এই পরিকল্পনার পরিবর্তন হওয়া উচিত ; নচেৎ পরিবেশ ও প্রয়োজন অনুসারে স্বাস্থ্য-শিক্ষা কি কার্যকরী হবে ?

শিক্ষকদের সহযোগিতা ঃ

প্রত্যেকটি স্বাস্থ্য-পরিকল্পনার পিছনে শিক্ষকদের মিলিত প্রচেষ্টা থাকা দরকার। স্বাস্থ্য-রক্ষার প্রশ্নটা কেবল যিনি স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান পড়াবেন, তাঁর একার নয়—এ দায়িত্বটা সকলের। যাঁরা এ-বিষয়ে বিশেষজ্ঞ—যেমন চিকিৎসক, শারীরিক শিক্ষক এবং প্রাণিতত্ত্ববিদ্—তাঁরা সকলে মিলে সব দিক চিন্তা ক'রে পরিকল্পনা রচনা করবেন। তারপর ছাত্র-শিক্ষকদের সম্মিলিত চেষ্টা দ্বারা তাকে কার্যকরী ক'রে তুলতে হবে।

যাতে নিয়মিত অভ্যাসের দ্বারা শিক্ষণীয় বিষয়গুলি শিশুদের আচরণে পরিণত হয়, বিদ্যালয়ের প্রত্যেকটি কাজের মধ্য দিয়ে তাকে রূপায়িত করার চেষ্টা করতে হবে। সামাজিক ও ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতার দিকে যাতে শিশুদের

সজাগ দৃষ্টি থাকে, সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে। বিদ্যালয়ের প্রত্যেকটি শিক্ষক—যিনি যে বিষয়ই পড়ান না কেন—যখন যিনি শিশুদের সান্নিধ্যেই আসবেন, তখনই শিশুদের স্বাস্থ্যকর মনোভাব গঠনের কাজে সাহায্য করবেন। তবেই সকলের মিলিত প্রচেষ্টায় বিদ্যালয়ের ।স্বাস্থ্য-পরিকল্পনা বাস্তবে রূপায়িত হয়ে উঠবে।

অন্যান্য স্বাস্থ্য-বিভাগীয় লোকদের সহযোগিতা ঃ

স্বাস্থ্য-পরিকল্পনাকে কার্যকরী ক'রে তোলার জন্য ত্রিবিধ পরিবেশের প্রভাবকে—বিদ্যালয়, গৃহ এবং সমাজ-ব্যবস্থাকে—কাজে লাগাতে হবে। এজন্য প্রয়োজন পিতামাতার সাহায্য, স্বাস্থ্য-বিভাগীয় লোকদের সহযোগিতা এবং ছাত্র-শিক্ষকদের একাগ্র প্রচেষ্টার। এ ছাড়া, কেন্দ্রীয়, স্থানীয় বা যে সব স্বেচ্ছাসেবী শিশু-মঙ্গল সমিতি আছে, তাদের সহযোগিতা ভিন্ন এই ব্যাপক পরিকল্পনাকে রূপায়িত করা সম্ভবপর নয়। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে যেখানে বিদ্যালয়, ডাক্তার, দন্ত-চিকিৎসক এবং সেবিকারা আছেন, অথবা শিশু-চিকিৎসা-কেন্দ্র আছে, সেখানে বিদ্যালয়ের ছাত্রদের স্বাস্থ্যোন্নতির দিকে বিশেষ নজর দেওয়ার সুব্যবস্থাও আছে। অনেকক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় চিকিৎসকরাই হচ্ছেন বিদ্যালয়ের **ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক**। **তাঁরা নিয়মিত বিদ্যালয়ের** সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন, ছাত্র-শিক্ষকদের সঙ্গে সহযোগিতা করেন, উপদেশ-নির্দেশ দেন ; এমনকি বিভাগীয় অনেক সমস্যা সমাধানের জন্য বিদ্যালয়ের মাধ্যমে পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ চালান। তাঁরা **শিশু-স্বাস্থ্য পরিদর্শন, শিশু-চিকিৎসা**—এবংবিধ শিশু-মঙ্গলের দায়িত্ব পালন করেন। এ ছাড়া, বিদ্যালয়ের স্বাস্থ্য-পরিদর্শন শিক্ষকদের বিশেষ অভিজ্ঞতা দান করে, শিশুদের গৃহ-পরিবেশের খবর দেয়। ফলে, প্রত্যেকটি শিশুর ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য এবং বিদ্যলয়ের সর্বাঙ্গীণ স্বাস্থ্যোন্নতির কাজ সুনিয়ন্ত্রিত হ'তে পারে। এ ছাড়া, বিশেষজ্ঞরা—যেমন চক্ষু-কর্ণ-দন্ত-চিকিৎসক এবং ধাত্রীরা—মাঝে মাঝে শিশু-বিদ্যালয়ে এসে যে বক্তৃতা দেন, যে সব চিত্র প্রদর্শন করান, তার দ্বারাও বিদ্যালয়ের অশেষ মঙ্গল সাধিত হয়।

পরিকল্পনার লক্ষ্য ঃ

স্বাস্থ্য-শিক্ষা-পরিকল্পনার লক্ষ্য শিশুদের বিদ্যালয়ের জীবনকে আনন্দে, স্বাস্থ্যে, যোগ্যতায় পরিপূর্ণ ক'রে তোলা। স্বাস্থ্যের অভ্যাস ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে বিদ্যালয়ের ছাত্রদের এমন ব্যবহারিক শিক্ষা দিতে হবে যে, তারা পরমুখাপেক্ষী না হয়ে নিজ নিজ স্বাস্থ্য-পালনে যত্নবান হবে, যে-কোন পরিবেশের

সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারবে ; এবং বিদ্যালয় থেকে যে স্বাস্থ্যকর আচরণ শিক্ষা করবে, সেটাই হবে তার পরবর্তী কালের পাথেয়।

পদ্ধতি :

স্বাস্থ্য-পরিকল্পনার সাধারণ বিচার্য বিষয় হচ্ছে যে, পরিকল্পনাটি হবে যতদূর সম্ভব পরিবর্তনশীল (flexible) এবং স্থিতি-স্থাপক (elastic)। পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলাফল অনুসারে পরিকল্পনাটি যাতে ক্রমাগত পরিবর্তিত পরিবেশের সঙ্গে খাপ খায়, প্রয়োগের দিক থেকে কোন অসঙ্গতির সৃষ্টি না করে, সেদিকেও দৃষ্টি দিতে হবে। শুধু তাই নয়, শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব, এমনকি শিশু-ব্যক্তিত্বের স্বাতন্ত্র্য অনুসারেও পরিকল্পনার পরিবর্তনটা বাঞ্ছনীয়। প্রয়োগ-পদ্ধতি নির্বাচনের বিশেষ ক্ষমতা থাকবে শিক্ষকদের হাতে। শিক্ষকদের এই স্বাধীন ক্ষমতায় হস্তক্ষেপ করতে পারে এমন কোন সরকারী নির্দেশ বা সুপারিশ থাকা উচিত নয়। স্বাস্থ্য-শিক্ষা-পরিকল্পনার সুপারিশগুলি এমন হবে, যার দ্বারা শিক্ষকরা প্রেরণা পাবেন, তাঁদের দায়িত্ব-বোধ জাগ্রত হবে, এবং প্রয়োগ-সাফল্যে পরিকল্পনাটি সার্থক হবে। সেই সার্থক রূপায়ণের জন্য চাই স্বাস্থ্যকর অভ্যাস গঠন এবং স্বাস্থ্য-সম্পর্কীয় জ্ঞানাহরণ।

স্বাস্থ্য-নীতি সম্বন্ধে ছেলেদের উপযুক্ত মনোভাব যতই উত্তরোত্তর বেড়ে উঠবে, ততই বিদ্যালয়ের আবহাওয়া পরিবর্তিত হবে। এখানেই আছে শিক্ষকের দায়িত্ব ও কর্তব্যের সক্রিয় প্রভাব। তিনিই উপযুক্ত শিক্ষক, যিনি কেবল উপদেশ-নির্দেশ অথবা ব্যায়াম প্রদর্শনের মধ্যেই তাঁর জ্ঞানকে সীমাবদ্ধ রাখেন না ; যিনি প্রত্যেকটি ছাত্রকে ব্যক্তিগতভাবে ভাববার অবকাশ দেন, যার প্রচেষ্টায় ছাত্ররা নিজ নিজ ক্ষমতা অনুযায়ী সমস্যা সমাধানের উপায় উদ্ভাবন করতে শেখে। এই যে ব্যক্তি-শক্তি-প্রয়োগের ব্যবহার, এটাই স্বাভাবিক শিক্ষার শ্রেষ্ঠ পন্থা। কিন্তু প্রয়োগ-নীতির মধ্যে যদি এমন কোন জটিল ভাবনা থাকে, যা পদে পদে শিশুর কর্ম-প্রেরণাকে আট্‌কে দেয়, নিজের ভাবনায় শিশু অস্থির হয়ে পড়ে, তবে সেই স্বাস্থ্য-নীতি শিশুর সহজ স্বাভাবিক জীবনকে ব্যাহত করবে। সে নীতি চিকিৎসা-বিদ্যার অন্তর্ভুক্ত হ'তে পারে, তার দ্বারা শিশুদের দেহ-মনের স্বাস্থ্যোন্নতি হবে না। শিশুরা যখন সাময়িক-ভাবে নিজেদের ও গৃহ-পরিবেশের দুঃখ-হতাশার কথা ভুলে থাকতে পারে, সেই আনন্দময় পরিবেশে শিশুদের যে স্বাস্থ্য-শিক্ষা চলবে, তার দ্বারাই শিশু-স্বাস্থ্যের সত্যিকার উন্নতি হবে। এইজন্য কোন কারণে ঘরের কথা তুলে কোন শিশুর মনে দুঃখ সঞ্চার করা ঠিক নয় ; কোন কারণে যদি সে কথার উল্লেখ করতেই হয়, তবে তাকে আলাদা ক'রে আড়ালে ডেকে এনে সে কথার অবতারণা করা যেতে পারে, কিন্তু সকলের সামনে নয়। বুদ্ধিমান শিক্ষক অবশ্য প্রত্যেকটি শিশুর গৃহ-পরিবেশের

সমস্ত তথ্য গোপনে সংগ্রহ ক'রে সেই শিশু-মনের শূন্যতা, সেই অভাবের অপূর্ণতাকে এমন স্নেহ, সহানুভূতি দিয়ে ভরিয়ে তুলবেন যে সেই নির্ভর-আশ্রয়ে শিশু যে জীবন-সম্ভাবনার স্বাদ পাবে, সেটাই তার দেহ-মনের স্বাস্থ্যকে পাল্‌টে দেবে।

(ক) অভ্যাস সংগঠন ঃ

স্বাস্থ্যকর অভ্যাস গঠনের জন্য বিদ্যালয়ের **দৈনন্দিন** সময় সূচীতে স্বাস্থ্য-শিক্ষার সময় সুনির্দিষ্ট হওয়া উচিত। স্বাস্থ্যকর অভ্যাস ছাড়া শিশু-স্বাস্থ্যের উন্নতিবিধান করা সম্ভব নয়। সময় সূচীকে স্বাস্থ্যকর অভ্যাস গঠনের কাজে লাগানোর জন্য নিম্নলিখিত সুব্যবস্থা থাকার বিশেষ দরকার ঃ—

নিত্য স্বাস্থ্য পরিদর্শন—স্বাস্থ্য-পরিদর্শনের মাধ্যমে শিশুরা প্রেরণা ও উৎসাহ লাভ করে। স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য কি কি করণীয়, কেমন ক'রে অভ্যাসগুলিকে আয়ত্তে আনা যায়, শিশুরা তা বুঝতে ও অনুসরণ করতে শেখে। স্বাস্থ্য-পরিদর্শনের সময় বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে যে, শিশুর দৈহিক পরিচ্ছন্নতা (হাত, মুখ, দাঁত, চুল প্রভৃতি) কেমন আছে। অথবা, তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন আছে কিনা, তা-ও দেখতে হবে। প্রতিদিন পরিদর্শন অন্তে পরিচ্ছন্নতার গুণাগুণ সম্পর্কে বিশদভাবে ছেলেদের বুঝিয়ে দিতে হবে।

এই প্রসঙ্গে শিক্ষক মহাশয়রা প্রত্যেকটি ছাত্রের **স্বাস্থ্য-পত্র** রাখবেন। তাতে প্রতিদিনের পরিদর্শনের ফলাফল লিপিবদ্ধ করতে হবে। সেই সঙ্গে শিক্ষকরা লক্ষ্য রাখবেন, কার শরীর খারাপ হয়ে যাচ্ছে, শ্রেণীতে কে অসুস্থ হয়ে পড়েছে, কোন ছাত্র সংক্রামক ব্যাধিগ্রস্ত কিনা অথবা কেউ দুর্বলতার ক্লান্তিতে অবসন্ন কিনা, তা-ও লক্ষ্য করতে হবে। তা না হ'লে প্রতিকার ও প্রতিষেধক ব্যবস্থা অবলম্বনে সতর্ক হওয়া যাবে না।

ওজন ও উচ্চতার পরিমাপ-পত্র—ক্ষয় ও বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতেই জানা যায়, শিশুর স্বাস্থ্য কোন্ পর্যায়ে আছে। ওজন ও উচ্চতার বৃদ্ধিই হচ্ছে ক্রমবর্ধমান শিশু-স্বাস্থ্যের নজির-পত্র। আপাতদৃষ্টিতে যে সব রোগ ধরা পড়ে না, প্রথম অবস্থার যে সব ব্যাধির কোন লক্ষণই চোখে পড়ে না, ওজন ও উচ্চতার পরিমাপে সেই ব্যাধির আভাস পাওয়া যায়। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে যখন কোন শিশুর ওজন ও উচ্চতা বাড়ছে না, তখনই বুঝতে হবে যে, সে শিশু সুস্থ সবল নয়,—নিশ্চয় সে কোন-না-কোন অসুখে ভুগছে। তার কারণটা **ভিটামিনযুক্ত খাদ্যাভাব** বা অন্য অনেক কিছুই হ'তে পারে। এই ওজন নেওয়ার ব্যাপারে শিশুদের মধ্যে বিশেষ উৎসাহ দেখা যায়। এ ব্যবস্থার ত্রিবিধ সুফলও আছে। প্রথমতঃ, শিশুরা যখন জানতে পারে যে,

ওজন বাড়াটাই ভালো স্বাস্থ্যের লক্ষণ, তখন যাতে প্রতি মাসের শেষে তাদের ওজন বাড়ে, সেদিকে শিশুরা লক্ষ্য রাখতে শিখবে। তার জন্য যা যা করণীয়, সে কাজ কঠিন হ'লেও, শিশুরা সানন্দে তা করতে প্রস্তুত হবে। দ্বিতীয়তঃ, স্বাস্থ্য সম্পর্কে শিশুদের এই যে সচেতনতা, তা স্বাস্থ্যকর অভ্যাস গঠনে বিশেষভাবে কার্যকরী হয়ে উঠবে। তৃতীয়তঃ, ওজন নেওয়া ও পরিমাপ করার দায়িত্ব উচ্চ শ্রেণীর যে-সব ছাত্ররা স্বেচ্ছায় গ্রহণ করবে, তাদের দায়িত্ব-বোধ জাগ্রত হবে এবং পরস্পরের মধ্যে একটা প্রীতিকর সহযোগিতার ভাব গড়ে উঠবে। তা ছাড়া, ছাত্রদের স্বাস্থ্য-পত্র যখন অভিভাবকদের কাছে পাঠানো হবে, তখন অভিভাবকরা নিজ নিজ পুত্র-কন্যার স্বাস্থ্য সম্পর্কে অবহিত হবেন। অসুস্থ ছাত্রদের অভিভাবকরা সময়মত নিজ নিজ পুত্র-কন্যার চিকিৎসা করানোর দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারবেন। ফলে, অভিভাবক ও শিক্ষকদের মধ্যেও একটা সহযোগিতার ভাব গড়ে উঠবে।

খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা—আমাদের দেশ দরিদ্রের দেশ। এখানে সকলের ভাগ্যে দু'বেলা অন্ন জোটে না। এ হেন শোচনীয় অবস্থার মধ্যে থেকে যে-সব ছেলেমেয়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আসে, ঘরে তাদের যা আহার্য জোটে, তা অনাহারেরই নামান্তর মাত্র। কাজেই, স্বাস্থ্য-শিক্ষাকে কার্যকরী ক'রে তুলতে হ'লে, প্রথমেই প্রয়োজন শিশু-বিদ্যালয়ের ছাত্রদের উপযুক্ত খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা করা। পাশ্চাত্য দেশের অধিকাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়েই খাদ্য সরবরাহের সুব্যবস্থা আছে। যেখানে এই ব্যবস্থা চালু আছে, সেখানে পংক্তি ভোজনের মাধ্যমে ছেলেদের মধ্যে খাওয়া-দাওয়ার কতকগুলি সু-অভ্যাস ও নানা সামাজিক আচরণ আপনা থেকেই গড়ে উঠে।

এই অভ্যাস গঠন সম্পর্কে অনেকে প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁরা বলেছেন যে, শিশুদের অভ্যাস গঠনের মহড়া কতদিন ধ'রে চলবে? এটা নির্ভর করে অভ্যাসের প্রকৃতি, গৃহ-পরিবেশের অবস্থা ও বিদ্যালয়ের ব্যবস্থার উপর। আপাততঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বয়সকালকে (অর্থাৎ ৬—১১ বৎসর অবধি) **অভ্যাস গঠনের সীমা-রেখা** ধরা যেতে পারে।

(খ) স্বাস্থ্য-সম্পর্কীয় জ্ঞান-সঞ্চয়ঃ

স্বাস্থ্য অধ্যয়নের জন্য নিত্য কতটুকু সময়ের প্রয়োজন, সে সম্পর্কে অনেকেই প্রশ্ন করেছেন। কেবল জ্ঞান পরিবেশনের জন্য সে ব্যবস্থার প্রয়োজন হ'লে, কোন্ শ্রেণী থেকে স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান অধ্যয়নের ব্যবস্থা করা উচিত? যে স্বাস্থ্য-শিক্ষা একান্তভাবেই ব্যবহারিক বা আচরণসাপেক্ষ বিষয়, সেই জ্ঞান আসবে কাজের মাধ্যমে—কেতাব থেকে নয়। জ্ঞান আহরণের জন্য স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান পাঠের

প্রয়োজন, তা প্রাথমিকোত্তর বিদ্যালয় থেকে শুরু হওয়া উচিত। শ্রেণী-পঠনে ছেলেরা যেখানে নীরব শ্রোতামাত্র, যেখানে স্বাস্থ্য-নীতি প্রয়োগের কোন ব্যবস্থাই নেই, সেখানে পরিবেশিত স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান তত্ত্ব মাত্র, তা কার্যকরী আহৃত জ্ঞান নয়। কোন শিশু-বিশেষজ্ঞ অথবা শারীরিক শিক্ষক যদি নিম্নলিখিত বিশেষ বিষয়-বস্তুর মাধ্যমে (যথা শারীরিক অনুশীলন, গৃহকর্ম, জীব-বিদ্যা প্রভৃতি) এই জ্ঞান পরিবেশন করতে পারেন, তা হ'লে স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান অধ্যয়নের উদ্দেশ্য সফল হ'তে পারে। কোথায় কোন্ বিষয়ের অবতারণা করতে হবে, সে নির্বাচনের ব্যবস্থা হবে প্রসঙ্গতঃ এবং বিদ্যালয়ের পরিবেশ অনুসারে।

স্বাস্থ্য-সম্বন্ধীয় ব্যবহারিক ও বাস্তব কার্যাবলী—স্বাস্থ্য অধ্যয়নের সমস্ত জ্ঞানই ব্যবহারিক। কাজেই, স্বাস্থ্য-নীতি-সম্বন্ধীয় যাবতীয় জ্ঞান স্বাস্থ্য-প্রকল্পের (Health Project) মাধ্যমে পরিবেশন করাই শ্রেয়ঃ। নিম্নলিখিত কার্যাবলীকে যথা—অনুশীলন, গৃহকর্ম, প্রাথমিক চিকিৎসা, শিশু-চিকিৎসালয় পরিদর্শন, সেবা-শুশ্রূষা, জলমগ্ন ব্যক্তির উদ্ধার সাধন প্রভৃতি—স্বাস্থ্য-প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত করা চলে। এই সব ব্যবহারিক কাজের মধ্যে শিশুরা ব্যক্তিগতভাবে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সচেতন হবে, আকস্মিক দুর্ঘটনার প্রাথমিক চিকিৎসা করতে শিখবে, তারা সেবা-পরায়ণ হয়ে উঠবে এবং শেখা স্বাস্থ্য-তত্ত্বগুলি প্রয়োগ সাফল্যে শিশুদের কাছে ব্যবহারিক সত্যরূপে প্রতিভাত হবে। সেটাই হবে সত্যিকার স্বাস্থ্য-শিক্ষার ব্যবহারিক অনুশীলন।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শেষ বৎসর—প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শেষ বর্ষে শিশুদের অর্জিত জ্ঞানের হিসাব-নিকাশ করতে হবে। বিদ্যালয়ে বিগত কয়েক বছরে শিশুরা কি কি স্বাস্থ্যকর অভ্যাস গঠন করেছে, কোন্ বিষয়ে কতটুকু সাফল্য অর্জন করেছে, কি জ্ঞান সঞ্চয় করেছে, তার পরিমাপ করতে হবে। বিদ্যালয় ছেড়ে যাওয়ার আগে ছেলেদের নিম্নলিখিত বিষয় সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হ'তে হবে :—

(ক) কেমন ক'রে নিজেকে সুস্থ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে (বিশেষ ক'রে নাক, কান, চোখ, ত্বক্, দাঁত প্রভৃতি) পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা যায়।

(খ) কেমন ক'রে আকস্মিক দুর্ঘটনার সময় (অসুখের সময়, দুর্ঘটনার সময়, কেটে গেলে, পুড়ে গেলে এবং কেউ ডুবে গেলে ইত্যাদি) প্রাথমিক চিকিৎসা করতে হবে।

(গ) মেয়েদের জানতে হবে সেবা-শুশ্রূষার কাজ, শিশুদের যত্ন নেওয়া, খাদ্য প্রস্তুত করা প্রভৃতি।

(ঘ) জানতে হবে কোথায় স্থানীয় হাসপাতাল, শিশু-মঙ্গল সমিতি, চিকিৎসালয় অবস্থিত।

(ঙ) জানতে হবে সংক্রামক ব্যাধি নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধের উপায় কি কি এবং প্রতিষেধক উপায় অবলম্বনেরই বা প্রয়োজন কেন।

(চ) বিগত কয়েক শতাব্দীতে অথবা আধুনিক কালে চিকিৎসা-শাস্ত্রের যে আবিষ্কার মানুষের অশেষ কল্যাণ সাধন করেছে, সে বিষয়েও অবগত হ'তে হবে।

(ছ) এ ছাড়া খবর রাখতে হবে জাতীয় স্বাস্থ্য-বীমা এবং হাসপাতালের সঞ্চয়-সংস্থা (Hospital Savings Association) সম্পর্কে।

বিদ্যালয়ের অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে স্বাস্থ্য-শিক্ষার সম্পর্ক—বিদ্যালয়ের অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে স্বাস্থ্য-শিক্ষার সংযোগ আছে। কতকগুলি বিশেষ বিষয়, যেমন **শরীর-চর্চা, গৃহকার্য, ইতিহাস, ভূগোল, জীব-বিদ্যা** প্রভৃতির সঙ্গে স্বাস্থ্য-নীতির প্রয়োগটা খুবই নিবিড়। খেলার মাঠে, ব্যায়ামাগারে, অথবা নৃত্যাভ্যাস বা সাঁতার কাটার সময় নিয়মিত যে অঙ্গ-সঞ্চালনের প্রয়োজন হয়, সরাসরিভাবে তার দ্বারা শিশুদের স্বাস্থ্যোন্নতি ঘটে।

সাধারণতঃ দেখা যায়, এগারো ও বারো বছরের মেয়েরা স্বাস্থ্য-নীতি সম্পর্কে কিছুটা উদাসীন। অথচ তারা যখন **গৃহস্থালীর** কাজে লিপ্ত হয়, তখন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দিকে তাদের সজাগ দৃষ্টি থাকে। তখন স্বাস্থ্যকর অভ্যাসগুলি—যেমন রান্নাবান্নার সময় ভালো ক'রে হাত ধোয়া, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন উপায়ে খাদ্য প্রস্তুত করা, কাপড় কাচা প্রভৃতি কাজের মাধ্যমে সত্যিকার স্বাস্থ্যকর অভ্যাস জাগিয়ে তোলা যায়।

অনুরূপভাবে, ইতিহাস-ভূগোল শেখানোর সময় মানবীয় স্বাস্থ্যোন্নতির কথা অবতারণা করা যেতে পারে। কেমন ক'রে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে স্বাস্থ্য-চেতনার আবির্ভাব হ'ল, অথবা কি উপায়ে দেশের স্বাস্থ্যোন্নতি ঘটেছে, এই ঐতিহাসিক **দৃষ্টিভঙ্গীর** পরিপ্রেক্ষিতে নানাধরনের স্বাস্থ্য-প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে। বিদ্যালয়-সংলগ্ন গ্রামের স্বাস্থ্য নিরূপণের দ্বারা শিশুরা এ গ্রামের জন-স্বাস্থ্য কেমন, অসুখ-বিসুখের প্রাদুর্ভাব কোথায়, কি কি কারণে কতবার গ্রামের লোকরা সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে, স্বাস্থ্য-প্রকল্পের মাধ্যমে তা সংগ্রহ করা যায়। ফলে, স্বাস্থ্য-নীতির নানা ব্যবহারিক প্রয়োগ থেকে শিশুরা স্বাস্থ্য-বিদ্যাকে নূতনভাবে আয়ত্ত করতে শেখে।

আবার অন্যদিকে স্বাস্থ্যের ভালো-মন্দের সঙ্গেও অনেক ভৌগোলিক কারণ জড়িয়ে আছে। মানুষের **বৃদ্ধি, জীবনী-শক্তি** প্রভৃতি নির্ভর করে ভৌগোলিক

আবহাওয়ার উপর। এর প্রভাব ব্যক্তি তথা সমাজের উপর। ভৌগোলিক বিবরণ থেকে জানা যায়, পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় সুইজারল্যাণ্ড, ক্যালিফোর্নিয়া, মিশর, নিউজিল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের স্বাস্থ্য অনেক ভালো। আবার অনেক স্থানের স্বাস্থ্য শোচনীয় এবং বিশ্রী খারাপ। কাজেই, ভৌগোলিক প্রকল্প গ্রহণ ক'রে আমরা জানতে পারি, তার পিছনে আবহাওয়া তত্ত্বের প্রভাব কতখানি অথবা কি কি ভৌগোলিক কারণ আছে।

এ থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা যায়, বিদ্যালয়ের **পাঠ্যক্রমে** স্বাস্থ্য-শিক্ষার একটা বিশিষ্ট স্থান আছে। এই কারণে স্বাস্থ্য-বিদ্যাকে বাদ দিয়ে অথবা অন্যান্য বিষয় থেকে তাকে পৃথক ক'রে আর যা শিশুদের শেখানো যাক না কেন, সে শিক্ষা কখনই **জীবন-প্রস্তুতির সম্পূর্ণ শিক্ষা হবে না।**

স্বাস্থ্য-চর্চা, পর্যবেক্ষণ ও পরিদর্শন

বিদ্যালয়ের স্বাস্থ্য-সেবা-বিভাগের কাজঃ

গত বিশ বছরের মধ্যে পাশ্চাত্য দেশে স্বাস্থ্য-সেবার কাজ বিশেষ প্রসার লাভ করেছে। এ সম্পর্কে চিকিৎসকদের অভিমত এই যে, সুপরিকল্পিত পরিকল্পনা গৃহীত হ'লে স্বাস্থ্য-সেবার কাজ আরও সুষ্ঠুভাবে হ'তে পারে। যদিও বিদ্যালয়ের স্বাস্থ্য-সেবার পরিধি সীমাবদ্ধ এবং স্বাধীনভাবে কাজ করার পক্ষেও অনেক অসুবিধা আছে, তথাপি শিক্ষক, অভিভাবক এবং বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসকরা সচেতন হ'লে,—তাঁরা প্রত্যেকে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করলে,—অনেক অসুবিধার সুরাহা হ'তে পারে। এ. এল. হুয়াইট্নি বিদ্যালয়ের স্বাস্থ্য-সেবার লক্ষ্য কি, প্রত্যেকের করণীয় কি, সে সম্পর্কে বিশদ মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেছেন যে, দুঃখ লাঘব করার ইচ্ছা জন-কল্যাণ আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হ'লে, এই পরিকল্পনার এক নূতন দর্শন রচিত হ'তে পারে। যারা ব্যাধির কবলে পতিত হয়েছে, কোন রকমে তাদের ভালো ক'রে তোলা, অথচ অচল জীবনকে জোড়াতালি দিয়ে সচল করাটাই বিদ্যালয়ের স্বাস্থ্য-সেবা-বিভাগের কৃতিত্ব নয়; বিদ্যালয়ের ক্রমবর্ধমান প্রত্যেকটি শিশুকে স্বাস্থ্যকর জীবনের পথ দেখানো, তাদের ঠিকমত পরিচালিত করাই বিদ্যালয়ের অন্যতম কর্তব্য। কিভাবে স্বাস্থ্য-তত্ত্ব ও স্বাস্থ্য-শিক্ষার মধ্যে সমতা রাখা যেতে পারে, সে সম্পর্কে তিনি একটি সুন্দর উদাহরণ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, মনে করা যাক, একটি ছেলে দাঁতের অসুখে ভুগছে। তাকে দন্ত-

চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যাওয়া হ'ল। ডাক্তার পরীক্ষা ক'রে তাকে ঔষধ দিলেন, এবং কোন্ কোন্ বিষয়ে সতর্ক হ'তে হবে, তা জানিয়ে দিলেন। সে তখন নিশ্চয় ডাক্তারের নির্দেশমত চলতে চেষ্টা করবে, তার ফলে সে স্বাস্থ্য-রক্ষার কতকগুলি নীতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হবে। আরও সে বুঝতে পারবে, কেন দাঁতের অসুখ করে ? সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতিকারের জন্যও সে সচেষ্ট হবে ; এটাই হবে তার প্রকৃত স্বাস্থ্য-শিক্ষা।

শিশু-স্বাস্থ্য ও তার উন্নতি সম্পর্কে 'হুয়াইট্ হাউস সম্মেলনে' নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এক প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে, (১) স্বাস্থ্যকর জীবন-যাপনের অবশ্য-করণীয় বিষয় সম্পর্কে শিশুদের শিক্ষা দিতে হবে। (২) কোন একটি শিশুর সংক্রামক ব্যাধি যাতে অন্য শিশুদের মধ্যে ছড়িয়ে না পড়ে, তার ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। (৩) প্রত্যেকটি শিশুর চাহিদা, সামর্থ্য ও যোগ্যতা সম্পর্কে জ্ঞাতব্য তথ্য সংগ্রহ করতে হবে, যাতে তাদের ব্যক্তিগত প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি রেখে স্বাস্থ্য-পরিকল্পনা রচিত হ'তে পারে। (৪) ছাত্ররা কোন ব্যাধিগ্রস্ত হ'লে, তাদের অভিভাবক এবং পিতামাতাকে খবর দিতে হবে, যাতে গৃহে তাদের ঠিকমত চিকিৎসা হ'তে পারে।

স্বাস্থ্য-চর্চা এবং পর্যবেক্ষণের যে পরিকল্পনা রচিত হবে, তার লক্ষ্য থাকবে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির দিকে। যথা—(১) ছেলেদের স্বাস্থ্য-পরীক্ষা ; (২) দৈহিক দোষ-ত্রুটি সংশোধনের উপায় অবলম্বন ; (৩) সংক্রামক ব্যাধি প্রতিষেধক ব্যবস্থার প্রবর্তন—(ক) তার মধ্যে থাকবে প্রাথমিক চিকিৎসা, (খ) দন্ত-ব্যাধির চিকিৎসা ; (৪) ভাবী এবং স্থায়ী শিক্ষকদের স্বাস্থ্য-পরীক্ষার ব্যবস্থা।

ছেলেদের স্বাস্থ্য-পরীক্ষা ঃ

স্বাস্থ্য-শিক্ষার ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য-পরীক্ষার স্থান সর্বাগ্রে। ছাত্ররা যখন বিদ্যালয়ে ভর্তি হবে এবং যখন তারা বিদ্যালয় ত্যাগ ক'রে যাবে, সেই সময় অতি অবশ্যই ছাত্রদের স্বাস্থ্য-পরীক্ষা গৃহীত হওয়া উচিত। এই পরীক্ষা হবে সামগ্রিকভাবে এবং বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে। এই পরীক্ষার অন্তর্ভুক্ত হবে দেহ, দাঁত, চোখ, নাক, কান, শারীরতাত্ত্বিক এবং শারীরিক পরীক্ষা প্রভৃতি। সম্ভব হ'লে প্রতি মাসে অথবা বৎসরান্তে প্রত্যেকটি ছেলেমেয়ের ওজন, উচ্চতা ও দেহের পরিমাপ গ্রহণ করতে হবে। পরীক্ষান্তে স্বাস্থ্য-পত্রে প্রত্যেকটি ছাত্রের পরীক্ষার ফলাফল লিপিবদ্ধ ক'রে রাখতে হবে।

পরীক্ষা ও পরিদর্শনের জড়িত ফলাফলের যে নজির-পত্র প্রস্তুত হবে, তা অভিভাবকদের অবগতির জন্য প্রত্যেকটি ছাত্রের বাড়ীতে পাঠানো উচিত।

শ্রেণী-শিক্ষকের উপর স্বাস্থ্য-পত্র পূরণের ভার দিলে, কাজ সুচারুরূপে হ'তে পারে। তিনি সচেষ্ট হ'লেই, ছাত্রদের সব খবর সংগ্রহ করতে পারেন। অনেক পাশ্চাত্য বিদ্যালয়ের সেবিকারাই এই কাজ ক'রে থাকেন। তাঁদের সে পরীক্ষার ব্যবস্থাটা দৈনন্দিন নয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মাসিক অথবা সাময়িক। কাজেই, সে পরিদর্শন ও পরীক্ষার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা যায় না। শ্রেণী-শিক্ষক যাঁরা, তাঁরা শ্রেণীর প্রত্যেকটি ছাত্রের চাহিদা, সামর্থ্য, যোগ্যতার কথা, এমনকি ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের বিষয় ভালোভাবে জানেন ব'লেই তাঁদের দ্বারা শিশু-স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার কাজ ভালোভাবে চলতে পারে।

ত্রুটি-সংশোধনের ব্যবস্থা ঃ

প্রায়শঃ নিম্ন শ্রেণীর ছাত্রদের মধ্যে আঙ্গিক ত্রুটি ও সংক্রামক ব্যাধি পরিদৃষ্ট হয়। ছাত্রদের স্বাস্থ্য-পত্র ঠিকমত রাখার ব্যবস্থা থাকলে, সহজেই সে রোগ ধরা পড়ার সম্ভাবনা আছে। রোগ ধরা পড়লেই অভিভাবকদের তা অবিলম্বে জানাতে হবে। যেখানে বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত ডাক্তার বা ধাত্রী আছেন, সেখানে শিশু-ব্যাধি নিরাময়ের সুব্যবস্থা হ'তে পারে। সপ্তাহান্তে ডাক্তার বা ধাত্রীরা প্রত্যেকটি শিশুর গৃহ পরিদর্শন করবেন, স্বাস্থ্য পরীক্ষার সময় কোন দোষ-ত্রুটি ধরা পড়লে, তাঁরা সে সম্পর্কে অভিভাবকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন। যেখানে ছেলের অভিভাবকরা দরিদ্র, যাদের চিকিৎসা করানোর অর্থ-সঙ্গতি নেই, সেক্ষেত্রে সম্ভব হ'লে বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষকে সে দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। যে বিদ্যালয়ে কোন ধাত্রী বা ডাক্তার নেই, সেখানে শিক্ষকদের ছাত্রদের গৃহ পরিদর্শনের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। এমন অনেক আঙ্গিক ত্রুটি আছে, যেগুলি সংশোধনাত্মক ব্যায়ামের দ্বারা সংশোধিত হ'তে পারে; সেক্ষেত্রে স্বাস্থ্য-পরিকল্পনায় সংশোধনাত্মক ব্যায়ামের ব্যবস্থা করতে হবে। ছাত্রদের স্বাস্থ্য-পত্র ঠিকমত রাখা হ'লে, প্রত্যেকটি ছাত্রের প্রয়োজন ও তার চাহিদার দিকে তীক্ষ্ন দৃষ্টি রেখে পরবর্তী স্বাস্থ্য-পরিকল্পনা রচিত হ'তে পারে। সব সময় এই সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে। কিছুতেই যেন ছাত্রদের মধ্যে কোনও রকম ছোঁয়াচে রোগ সংক্রামিত হ'তে না পারে। যেখানে বিদ্যালয়ের নিজস্ব ডাক্তার নেই, সেখানে গৃহ-চিকিৎসকের লিখিত মন্তব্যের উপর নির্ভর করতে হবে।

প্রতিষেধক ব্যবস্থা ঃ

শিশু-ব্যাধি প্রতিরোধের প্রথম উপায় **পৃথকীকরণ**, দ্বিতীয় পন্থা হচ্ছে **কৃত্রিম প্রতিষেধক ব্যবস্থা অবলম্বন**। শ্রেণীতে ছাত্রদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে গিয়ে হঠাৎ দেখা গেল যে, একটি ছাত্রের চোখ উঠেছে; তখন ছাত্রটিকে বাড়ী পাঠিয়ে

দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। যতদিন পর্যন্ত সে সেরে না উঠে, ততদিন তাকে বিদ্যালয়ে আসতে দেওয়া ঠিক নয়। আবার যখন বিদ্যালয়ের সন্নিকটে কোন সংক্রামক ব্যাধি—যথা বসন্ত, কলেরা প্রভৃতি—আত্ম-প্রকাশ করে, তখন অবিলম্বে প্রত্যেকটি ছাত্রকে টিকা দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। কোন ছাত্র দীর্ঘদিন দাঁত, চোখ অথবা কানের ব্যাধিতে ভোগার পর যেদিন প্রথম বিদ্যালয়ে আসবে, তখন বিদ্যালয়ের ডাক্তার তার স্বাস্থ্য-পরীক্ষার পর যদি তাকে সম্পূর্ণ সুস্থ ব'লে নজির-পত্র না দেন, তবে তাকে বিদ্যালয়ে রাখা ঠিক হবে না। যেখানে বিদ্যালয়ের কোন ডাক্তার নেই, সেখানে সেই ছাত্রের গৃহ-চিকিৎসক যদি ছাত্রটি সম্পূর্ণ সুস্থ এই মর্মে নজির-পত্র দেন, তবেই তাকে পুনরায় বিদ্যালয়ে নেওয়া যেতে পারে।

প্রতিষেধক ব্যবস্থা অবলম্বন ও তার প্রয়োগ সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান প্রয়োজন। যাতে সংক্রামক ব্যাধির লক্ষণ কি, তার স্থায়িত্বকাল কতদিনের, কতদিনের মধ্যে বা পরে সেই ব্যাধির প্রকোপ বৃদ্ধি হ'তে পারে, কোন্ অসুখে কিভাবে কতদিন সাবধানে থাকা উচিত, কোন্ ব্যাধিতে কি সতর্কতা অবলম্বিত হ'তে পারে, সংক্রামক ব্যাধির প্রকৃতি ও লক্ষণ সম্পর্কে বিস্তারিত নির্দেশ থাকবে, এরূপ সরকারী স্বাস্থ্য-উপদেষ্টা সমিতির প্রণীত চার্ট সংগ্রহ করতে হবে। বসন্ত, ডিফ্থিরিয়া, টাইফয়েড প্রভৃতি রোগের কৃত্রিম প্রতিষেধক ব্যবস্থা—যেমন টিকা নেওয়া ইত্যাদি অবলম্বনের দ্বারা সহজেই প্রতিরোধ করা যায়। রোগ সারানোর চেয়ে প্রতিষেধক ব্যবস্থা অনেক গুণে শ্রেয়ঃ।

প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা :

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রায় আকস্মিক দুর্ঘটনা ঘট্তে দেখা যায়। খেলতে গিয়ে কখনো আঘাত লাগে, পড়ে গিয়ে হাত-পা কেটে যায়, কখনো কখনো বা গরমের সময় ছেলেদের সর্দিগর্মি হ'তে দেখা যায়। সে-সব ক্ষেত্রে প্রাথমিক চিকিৎসার একান্ত প্রয়োজন। যে-সব বিদ্যালয়ে ডাক্তার বা ধাত্রীর কোন ব্যবস্থা নেই, সেখানে শারীরিক শিক্ষার ভারপ্রাপ্ত শিক্ষককে এই দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। তা ছাড়া, প্রাথমিক চিকিৎসা সম্পর্কে ছেলেদের শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। প্রাথমিক চিকিৎসা অনুশীলনের মাধ্যমে ছেলেরা স্বাস্থ্য সম্পর্কে ব্যবহারিক জ্ঞান লাভ করবে। শারীরবৃত্ত, জীব-তত্ত্ব সম্বন্ধে তারা কার্যকরী স্থায়ী জ্ঞান লাভ করবে। তা ছাড়া, প্রত্যেকটি শিশুর মনে জাগবে সেবা-শুশ্রূষার নূতন প্রেরণা। অপরের দুঃখ-কষ্টে সমবেদনা সে দেখাতে শিখবে। সহযোগিতার মাধ্যমে পরস্পরের মধ্যে গড়ে উঠবে এক নিবিড় আত্মীয়তার মনোভাব। তখন ছাত্র-শিক্ষক একযোগে স্বাস্থ্য-পরিকল্পনা নিয়ে অনেক কাজ করতে সক্ষম হবেন।
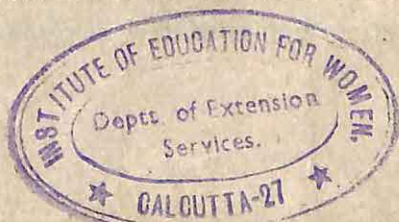
দন্ত-রোগ নিবারণের ব্যবস্থা ঃ

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুদের মধ্যে প্রায়ই দন্ত-রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। পায়োরিয়া, দন্ত-ক্ষয়, দাঁতে পোকা লাগা প্রভৃতি কত না দাঁতের অসুখে বিদ্যালয়ের ছোট ছোট ছেলেমেয়ে কষ্ট পায়। ভিটামিন **ক, খ, গ**-এর অভাবে সাধারণতঃ ছেলেদের দাঁত ক্ষয় পেতে আরম্ভ করে। এই কারণে মাঝে মাঝে দন্ত-চিকিৎসকের দ্বারা বিদ্যালয়ের প্রত্যেকটি ছাত্রের দাঁত পরীক্ষা করানো বিশেষ প্রয়োজন। কি কি কারণে দাঁত খারাপ হয়েছে, তা জানা গেলে, সহজেই প্রতিষেধকমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা যেতে পারে। শিশুদের এই দন্ত-ক্ষয় নিবারণের জন্য আমেরিকার সাধারণ স্বাস্থ্য-বিভাগ বিশেষ সচেষ্ট হয়েছেন। যেখানে বিদ্যালয়ের নিজস্ব কোন ডাক্তার নেই, সেখানে দন্ত-চিকিৎসকের সাহায্য নেওয়া উচিত। দাঁতের অসুখ থেকে শিশুরা উত্তরজীবনে অনেক আনুষঙ্গিক ব্যাধিতে কষ্ট পেতে পারে। কাজেই, প্রত্যেক শিশু-বিদ্যালয়ে দন্ত-রোগ নিবারণের সর্বপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত।

শিক্ষকদের স্বাস্থ্য-পরীক্ষা ঃ

বৎসরান্তে প্রত্যেক শিক্ষকেরই স্বাস্থ্য-পরীক্ষা গৃহীত হওয়া উচিত। শিক্ষকের ভালো স্বাস্থ্য সরাসরিভাবে শিশুদের দেহ-মনে প্রভাব বিস্তার করে। শিক্ষকদের সমস্ত কিছুই অনুকরণ করতে চায় শিশুরা। যে শিশুদের কাছে শিক্ষকরা অনুকরণযোগ্য জীবন্ত **আদর্শ**, সেই শিক্ষকদের দৈহিক স্বাস্থ্য, মানসিক বল ও মনে এমন প্রাণবন্ত ভাবাবেগ থাকা দরকার। এ থেকে শিশুরা দৈহিক, মানসিক ও ভাবাবেগের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হবে। নিত্য অসুখে যিনি ভুগছেন, তিনি কখনই স্বাস্থ্য-শিক্ষার শ্রেণীতে শিশুদের অনুপ্রাণিত করতে পারবেন না। কিন্তু যে শিক্ষক দেহ-মনের দিক থেকে সুস্থ, সবল এবং আদর্শ, তাঁর নির্দেশ শিশুদের মনে অনুপ্রেরণা জাগাবে। এই স্বাস্থ্য-চেতনা শিশুদের দেহ-মনকে নূতন ছাঁচে ঢালাই করবে। শিক্ষকরা প্রাণবন্ত হলে, তবেই কিশোর প্রাণোৎসবে তার সাড়া জাগবে। এই কারণে শিক্ষক-শিক্ষণ বিদ্যালয়ে যাঁরা কাজ করবেন, স্বাস্থ্য-পরীক্ষান্তে তাঁদের শিক্ষকতার কাজে বহাল করাই বাঞ্ছনীয়।

স্বাস্থ্য সম্পর্কীয় নির্দেশ ও তার গণ্ডি ঃ

স্বাস্থ্য সম্পর্কীয় নির্দেশ-নীতি বিদ্যালয়ের স্বাস্থ্য-পরিকল্পনার অপরিহার্য অঙ্গ। স্বাস্থ্য-নির্দেশ-নীতির গণ্ডি ব্যাপকতর। নিম্নলিখিত বিষয়গুলিকে তার অন্তর্ভুক্ত করা চলে ; যথা—স্বাস্থ্য-বিদ্যা সম্পর্কীয় নির্দেশ, উত্তাপ-রক্ষণ, আলো-বাতাসের ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য-রক্ষার ব্যবস্থা, গৃহকর্মের শিক্ষা এবং নিরাপত্তার ব্যবস্থা।

স্বাস্থ্য-নির্দেশের প্রধান লক্ষ্য থাকবে—বিদ্যালয়ের স্বাস্থ্য-পরিকল্পনা কতখানি কার্যকরী হ'ল সেদিকে। ভুল প্রয়োগের দোষে কোন নীতিই যেন ছাত্রদের পক্ষে ক্ষতিকর না হয়, তা-ও নিয়ন্ত্রিত হবে স্বাস্থ্য-নির্দেশের দ্বারা। বিদ্যালয়ের প্রত্যেকটি স্বাস্থ্য-পরিকল্পনা যাতে স্বাস্থ্য-রক্ষার মূল ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, সেদিকেও লক্ষ্য রাখা কর্তব্য। আর একটা কথা, স্বাস্থ্য-নীতির মধ্যে কিছুটা স্বাধীনতা থাকাও বাঞ্ছনীয়। অতি-নির্দেশ যখন পদে পদে শিশুদের ভাবনাকে আট্‌কে দেয়, রুটিনের ছকে যখন শিশুরা ক্রমাগত স্বাধীনতা হারাতে থাকে, তখন সেই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে আর যা হ'ক না কেন, শিশু-জীবনের উপযোগী কোন স্বাস্থ্য-শিক্ষাই হ'তে পারে না।

শিশুরা বিদ্যালয়ে এবং নিজ নিজ গৃহে যে যে কাজ করবে, লেখাপড়া ও অন্যান্য কাজের জন্য যে-সব সরঞ্জাম ব্যবহার করবে, সেগুলিও যেন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়। এদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। ছেলেরা যে চক, পেন্সিল, রবার এবং কাগজ ব্যবহার করে, সেগুলিও স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান-সম্মতভাবে পরিশুদ্ধ এবং পরিচ্ছন্ন হওয়া উচিত। এমন কি যে-সব মুদ্রিত পুস্তক, কাগজ-পত্র শিশুদের পড়তে দেওয়া হয়, সেগুলি নির্বাচনের সময়ও দেখতে হবে যে, কি ধরনের কাগজে ছাপা হয়েছে, ছাপার হরফগুলি কত বড়, প্রতি ছাপা লাইনের দৈর্ঘ্য কত, ইত্যাদি। বিদ্যালয়ে যে ব্ল্যাকবোর্ড ব্যবহৃত হয়, সেগুলিও ভালো কাঠের দ্বারা এমনভাবে তৈরি হওয়া উচিত যে, সব সময় যেন তা ব্যবহারযোগ্য থাকে। বোর্ডের অস্পষ্ট লেখা পড়তে পড়তে ছেলেদের চোখ খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

এ ছাড়া, ছেলেরা যে ডেস্ক, বেঞ্চ ও চেয়ারে বসে, সেগুলিও যেন শিশুদের উচ্চতা অনুসারে বসার দিক থেকে কোন অসুবিধার সৃষ্টি না করে, সেদিকেও দৃষ্টি দিতে হবে। যেন-তেন-ভাবে যেখানে-সেখানে ছেলেদের বসালে পরিণামে অনিষ্টকর আঙ্গিক বিকৃতি ঘট্‌তে পারে।

বিদ্যালয়ের দীর্ঘ অবকাশের সময় ছেলেদের উপর লেখাপড়ার এমন এক বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয় যে, সেই কাজের মধ্যে ছেলেরা প্রায় হাবুডুবু খেতে থাকে। যে অবকাশ বিশ্রামের জন্য, সেই ছুটির দিনে এত কাজের চাপ কেন? এর ফলে ছেলেরা স্বাধীনভাবে খেলাধূলা করার সময় এবং গ্রাম্য উৎসবে, আমোদ-প্রমোদে অংশগ্রহণের কোন সুযোগই পায় না। তাতে শিশুর দৈহিক ও মানসিক ক্ষতি হ'তে পারে। ছুটির দিনে যদি ছেলেদের দিয়ে কাজই করাতে হয়, তবে বহির্ভ্রমণ, শিশু-স্বাস্থ্য-কেন্দ্র পরিদর্শন, গ্রামের ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক তথ্যানুসন্ধান প্রভৃতি কাজ করানোই উচিত। তাতে শিশুদের যে অভিজ্ঞতা, জ্ঞান ও বিচিত্র ধারণা জন্মাবে,

সেগুলি দ্বারাই শিশুদের ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য-চেতনা শুধু জাগ্রত হবে না, সামাজিক স্বাস্থ্য-বোধও গড়ে উঠবে।

আলো-উত্তাপ এবং বায়ু-সঞ্চালন ব্যবস্থা ঃ

আবহাওয়া ভেদে ছেলেদের উদ্যম ও কর্মস্পৃহা বাড়ে, কমে। অতিরিক্ত গরমের দিনে ছেলেরা যে অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে কাজ করে, তার চেয়ে ঢের বেশী কাজ তারা শীতকালে করতে পারে। যে গৃহে ছেলেরা লেখাপড়া করে, সেখানে ঋতু অনুযায়ী তাপ-নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা থাকলে, অথবা ঘরটি পর্যাপ্ত আলো-বাতাসযুক্ত হ'লে এবং সর্বোপরি সেখানে বায়ু-সঞ্চালনের উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকলে, যে স্বাস্থ্যকর প্রীতিপদ আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়, সেই পরিবেশে শিশুর মনে কাজের প্রেরণা আসে। বায়ু-সঞ্চালনের উপযুক্ত ব্যবস্থা না থাকলে, সম্মিলিত ছাত্রদের নিশ্বাস-প্রশ্বাসে যে কার্বন ডাই-অক্সাইডের সৃষ্টি হয়, সেই দূষিত বায়ু শিশু-স্বাস্থ্যের প্রভূত ক্ষতি করে। এইজন্য শ্রেণী-কক্ষের অবস্থান এমন হওয়া উচিত যে, প্রতি মিনিটে ছাত্র-পিছু যেন ৩০ **কিউবিক ফুট বায়ু** পরিবেশিত হ'তে পারে। এই কার্বন ডাই-অক্সাইড যে শিশু-স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর, তা জার্মান শারীরতত্ত্ববিদ্ পেটেন কোফার প্রথম আবিষ্কার করেন। তিনি তার প্রতিকারের জন্য যে যান্ত্রিক বায়ু-সঞ্চালনের উপায় উদ্ভাবন করেছেন, বর্তমানে সেই ব্যবস্থা প্রগতিশীল দেশের প্রায় সমস্ত বিদ্যালয়েই চালু হয়েছে।

দিনের বেলা যেমন পর্যাপ্ত আলোর প্রয়োজন, রাত্রিকালেও যাতে শ্রেণী-কক্ষে আলোর ব্যবস্থা থাকে, সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে। কেরোসিন বা মোমবাতির আলোর চেয়ে বিজলী বাতির আলোই শ্রেয়ঃ। রাতের বেলা শ্রেণী-কক্ষে ৩০০ ওয়াটের মোমবাতির আলো দরকার হয়। ছেলেদের বসার এমন ব্যবস্থা থাকা উচিত যে, সবসময় যেন বাঁদিক থেকে অথবা বাঁ কাঁধের পিছন থেকে সামনে আলো এসে পড়ে। যে আলো সরাসরিভাবে ছেলেদের চোখে এসে পড়ে, চোখ ধাঁধিয়ে দেয়, সে আলোতে পড়াশুনা করা বিধেয় নয়।

স্বাস্থ্য-রক্ষার ব্যবস্থা (Sanitation) ঃ

স্বাস্থ্য-রক্ষার নীতিগুলিকে সঠিকভাবে চালু করার জন্য একান্ত প্রয়োজন বিশুদ্ধ পানীয় জল-সরবরাহের এবং কাজের শেষে ছেলেদের হাত ধোয়ার অভ্যাস করানোর। যেখানে কলের বা টিউবওয়েলের জল সরবরাহের কোন ব্যবস্থা নেই, সেখানে নদী, ঝরনা বা কূপের জল বিদ্যালয়ের ছাত্ররা ব্যবহার করে, তা বিশুদ্ধ হওয়া উচিত। নদী বা কূপের জল বিশুদ্ধ কিনা, তা জানার জন্য সরকারী স্বাস্থ্য-কেন্দ্রে সেই জল পরীক্ষার্থে পাঠানো যেতে পারে। কূপের সন্নিকটে স্নান ও কাপড় কাচা

উচিত নয় ; কারণ, তার দ্বারা জলবাহী বহু রোগ বিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে সংক্রামিত হ'তে পারে।

এর পর বিদ্যালয়-পরিবেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত। বিদ্যালয়ের সন্নিকটে গো-ভাগাড়, পায়খানা, আঁস্তাকুড় প্রভৃতি থাকলে, বিদ্যালয়-পরিবেশের আবহাওয়া সহজে দূষিত হ'তে পারে। কাজেই, বিদ্যালয় এমন স্বাস্থ্যকর পরিবেশে হওয়া উচিত, যেখানে ঐ সমস্ত কোন অসুবিধা নেই। পরিবেশ পরিচ্ছন্ন হওয়ার পর দেখা উচিত, পানীয় জলের বিলি-ব্যবস্থা কেমন ভাবে হচ্ছে। ছাত্রদের জন্য বিদ্যালয়ে যে পানীয়াগার থাকবে, সেখানে যাতে বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে জল রাখা, জল দেওয়া ও পাত্রাদি পরিষ্কার করার ব্যবস্থা থাকে, সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে। প্রত্যেকটি ছাত্রের জলপানের জন্য নিজস্ব গ্লাস থাকাই শ্রেয়ঃ। টালির ঘরের পরিবর্তে এমন পাকা ঘরে জল রাখার ব্যবস্থা করতে হবে, যেখানে ৭৫—১০০ জন ছাত্র স্বচ্ছন্দে জল পান করতে পারবে।

বিদ্যালয়ে হাত-ধোয়ার ব্যবস্থা ঃ

কিছু খাওয়া অথবা প্রসাধন করার আগে গরম জলে সাবান দিয়ে বেশ ভালো ক'রে হাত ধোয়া উচিত। শিশুদের পক্ষে এটা একটি কার্যকরী স্বাস্থ্যকর সু-অভ্যাস। এর জন্য বিদ্যালয়ের প্রত্যেকটি ছাত্রের দরকার একটি তোয়ালে, নিজস্ব সাবান, মগ প্রভৃতি।

শ্রেণীবদ্ধভাবে বিদ্যালয়ের সমস্ত ছাত্রদের নিয়ে এই কাজ করানো যেতে পারে। তাতে ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য-পালনের প্রাথমিক কর্তব্য যে কি, সে সম্পর্কে সকলের সহযোগিতায় যে মনোভাব গড়ে উঠবে, তা শিশু-স্বাস্থ্য-রক্ষার পক্ষে বিশেষ সহায়ক হবে। বিদ্যালয়ের স্বাস্থ্য-দিবস পালন উপলক্ষে সমবেতভাবে এই ব্যবস্থা অবলম্বিত হ'তে পারে। ছাত্রদের দায়িত্ব-বোধ ও যোগ্যতা অনুসারে কাজের ভার দিতে হবে। চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্ররা হাত ধোয়ার জন্য জল এবং তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্ররা সাবান ও তোয়ালে যোগান দেবে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রদের। এইভাবে সকলের সক্রিয় সহযোগিতায় স্বাস্থ্য-দিবস সুষ্ঠুভাবে উদ্‌যাপিত হবে।

বিদ্যালয়-গৃহের পরিচ্ছন্নতা ঃ

বিদ্যালয়ের পরিচ্ছন্ন পরিবেশের উপরই নির্ভর করে শিশুদের স্বাস্থ্যকর মনোভাব, স্বাস্থ্য, আনন্দ এবং কার্য-ক্ষমতা। বিদ্যালয়-গৃহের অবস্থান ও অবস্থা, তার খেলার মাঠের পরিচ্ছন্নতা ও ব্যবস্থার নিরিখে ঠিক করা যায়, বিদ্যালয়টি শিশু-স্বাস্থ্যের পক্ষে কতটা উপযোগী এবং কতখানি অনুকূল। বিদ্যালয়ের সমস্ত পরিবেশ যদি

বেশ তকতকে পরিষ্কার থাকে, সে পরিবেশে পদার্পণ ক'রেই শিশু-মন আনন্দে ভরে উঠবে, পরিচ্ছন্নতার সৌন্দর্যে সে আকৃষ্ট ও মুগ্ধ হবে। বিদ্যালয়ের এই প্রভাব সে বয়ে নিয়ে যাবে তার গৃহাভ্যন্তরে। তখনই শিশুদের সত্যিকার স্বাস্থ্য-শিক্ষা আরম্ভ হবে। বিদ্যালয়-গৃহকে পরিষ্কার করার দায়িত্ব দিতে হবে প্রত্যেক শ্রেণীর ছাত্রদের উপর। হাতে-কলমে সাফাই ক'রে ছেলেদের মধ্যে যে পরিচ্ছন্নতা-বোধ জাগ্রত হবে, তার দ্বারাই শিশুর উত্তরজীবন বিশেষভাবে প্রভাবিত হবে। শ্রেণী-কক্ষ পরিদর্শনের সময় যখন শিক্ষক মহাশয়রা বলবেন, চতুর্থ শ্রেণীর চেয়ে তৃতীয় শ্রেণীর কক্ষটি বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন আছে, তখন তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্ররা তাদের শ্রম সার্থক মনে করবে। সেই সময় চতুর্থ, প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্ররা প্রতিজ্ঞা করবে, পরবর্তী পরিদর্শনের সময় তারা ঐ গৌরব অর্জনে সচেষ্ট হবে। এই স্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতার মাধ্যমে আপনা থেকেই ছেলেদের মধ্যে যে পরিচ্ছন্নতা-বোধ জাগ্রত হবে, তাতে বিদ্যালয়ের চেহারা পাল্‌টে যাবে।

নিরাপত্তা-নীতি ঃ

আকস্মিক দুর্ঘটনায় যে হারে শিশু-বিদ্যালয়ের ছাত্রদের মৃত্যু ঘটে, অন্য কোন কারণে তা হয় কিনা সন্দেহ। এজন্য প্রত্যেকটি শিশুর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করাটাই হবে আধুনিক বিদ্যালয়ের প্রাথমিক কর্তব্য। এই ব্যবস্থার সতর্কতামূলক পন্থা অবলম্বনের প্রকৃষ্ট উপায় হবে প্রাথমিক চিকিৎসার প্রবর্তন করা। আমেরিকা প্রভৃতি দেশে এই নিরাপত্তা নীতি অনুসৃত হওয়ার পর অনেক পরিমাণে শিশু-মৃত্যুর হার কমে এসেছে। আমেরিকার জাতীয় শিক্ষা-সংস্থার বিবরণ থেকে তা জানা গেছে।

স্বাস্থ্য-পরিদর্শন সূচী

স্বাস্থ্য-নির্দেশের প্রয়োজনীয়তা ঃ

বিভিন্ন দেশের সংগৃহীত তথ্য থেকে জানা যায় যে, অধিকাংশ শিশু-ব্যাধি ও শিশু-মৃত্যু (সব বয়সের ছেলেমেয়েদের মধ্যে) ঘটে ব্যক্তিগত এবং সামাজিক স্বাস্থ্য-জ্ঞানের অভাব থেকে স্বাস্থ্য-রক্ষার নীতিগুলি ঠিকমতো পালন ক'রে চললে, সহজেই তার প্রতিকার করা যায়। আমেরিকা প্রভৃতি দেশে দেখা গেছে, বিভিন্ন ধরনের শিশু-ব্যাধির জন্য শিশুরা বছরে প্রায় ১৩ দিন বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত থাকে। সে তুলনায় ভারতবর্ষে শিশু-অনুপস্থিতির হার আরও অনেক বেশী। শিশুরা প্রায়শঃ এই সব ব্যাধিতে ভোগে ; যথা—সর্দি, ইনফ্লুয়েঞ্জা, টন্‌সিল,

ব্রন্‌কাইটিস, পেটের অসুখ, বাত, হাম, মাম্প্‌স্‌, দাঁতের অসুখ, ঘা-ফোঁড়া, খোস, হুপিং কফ্‌, ক্ষয়রোগ, রিকেটি, চোখ ওঠা প্রভৃতি। স্বাস্থ্য-নির্দেশগুলি মেনে চললেই উপরি-উক্ত ব্যাধির প্রকোপ থেকে শিশুদের রক্ষা করা যেতে পারে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের স্বাস্থ্য-নির্দেশ ঃ

শিশুর জীবনধারা অনেকটা ঘড়ির মতো। সময়মতো ঘড়িতে দম না দিলে যেমন তার কল-কব্জা অচল হ'য়ে পড়ে, তেমনি শিশুর খাওয়া-দাওয়া, নিদ্রা-বিশ্রাম, সেবা-যত্ন সবই ঘড়ি-ধরা। সেই সময়ের একটু ব্যতিক্রম হ'লে এবং এতটুকু অনিয়ম ঘটলে শিশুর দেহ-যন্ত্র বিকল হ'য়ে পড়ে। এইজন্য ক্রমবর্ধমান প্রত্যেকটি শিশুর দিকে সর্বদা সজাগ দৃষ্টি দিতে হয়। শিশু-বিশেষজ্ঞরা তাই বলেছেন, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রত্যেকটি শিশুর স্বাস্থ্য এবং দৈহিক বিকাশকে অক্ষুণ্ণ রাখতে হ'লে, তার চোখ-কান-নাক-মুখ-দাঁত থেকে আরম্ভ ক'রে খাওয়া-দাওয়া, শোয়া-বসা, খেলাধূলা সমস্ত কিছুর দিকেই নজর দিতে হয়। পান থেকে চুন খসলে যে শিশুর অস্বস্তির অবধি থাকে না, সেই শিশুকে স্বাস্থ্য-রক্ষার বাঁধা-ধরা পথে পরিচালিত করতে হবে। প্রত্যেকটি শিশু যাতে সুখী ও সুস্থ হ'তে পারে, সেজন্য লক্ষ্য রাখতে হয়, যাতে পর্যায়ক্রমে শিশুদের স্বাস্থ্য সম্পর্কীয় জ্ঞান, অভ্যাস ও মনোভাব বেড়ে উঠে। এই কারণে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের স্বাস্থ্য-নির্দেশ-সূচীর অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। যথা—(১) ডাক্তারী পরীক্ষায়, বুদ্ধির পরিমাপে, গৃহ-পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে শিশুদের ব্যক্তিগত যে প্রয়োজন অনুভূত হয়েছে, তার প্রতিকারের দিকে দৃষ্টি দেওয়া ; (২) যে বিষয়ে শিশুর বিশেষ অনুরাগ দেখা গেছে, তার কথাও বিবেচনা করতে হবে ; (৩) স্বাস্থ্য-বিদ্যা-বিশেষজ্ঞদের মতে যে বয়সের শিশুদের যতটুকু স্বাস্থ্যের প্রয়োজন, সে-কথাও ভাবতে হবে এবং (৪) বিভিন্ন দেশের স্বাস্থ্য-পরিকল্পনার তুলনামূলক বিচারের দ্বারা প্রগতিমূলক পদ্ধতির প্রয়োগ করা।

স্বাস্থ্য-নির্দেশ-সূচীর নয় দফা লক্ষণীয় বিষয়ের কথা স্বাস্থ্য-বিশেষজ্ঞরা উল্লেখ করেছেন। সেগুলি হচ্ছে—

১। দৈহিক গঠন ও তার কার্যকারিতা সম্বন্ধে সম্যক্‌ জ্ঞান থাকা দরকার ; তা না হ'লে দেহের সঠিক যত্ন নেওয়া সম্ভবপর নয়। বিশেষ ক'রে জানা দরকার চোখ, কান, নাক, মুখ, গলা, ত্বক্‌, চুল এবং নখ সম্বন্ধে।

২। স্বাস্থ্য-নিরাপত্তা-নীতি।

৩। ডাক্তার না আসা পর্যন্ত আকস্মিক দুর্ঘটনায় করণীয় কি, সেই সব পদ্ধতি সম্পর্কেও কিছু জানা দরকার।

৪। কেমন ক'রে কোন রোগ ছড়িয়ে পড়ে, কিভাবে তার প্রতিকার করা যায়

৫। জানা দরকার সংক্রামক রোগ-প্রতিরোধের জন্য নিকটস্থ গ্রামে, শহরে, দেশে, রাষ্ট্রে সরকার বা জনসাধারণ কি করছেন।

৬। ছাত্ররা নগরবাসী হিসাবে দেশের স্বাস্থ্য-রক্ষা ও তার উন্নতির জন্য কিভাবে সহযোগিতা করবে।

৭। খাদ্য ও পানীয়ের প্রকৃতি ও গুণাগুণ কি।

৮। সুরা ও তামাক জাতীয় পদার্থ শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর কিনা, তার ব্যবহারের সঙ্গে কি অর্থনৈতিক ও সামাজিক ফলাফল বিজড়িত আছে।

৯। প্রতিবিধানকর ঔষধের আবিষ্কর্তাদের নাম ও তাঁদের কীর্তি সম্বন্ধে জানতে হবে।

স্বাস্থ্যকর অভ্যাস গঠনের কার্য-সূচী ঃ

১। ধীরে ধীরে ও ভালো ক'রে চিবিয়ে পুষ্টিকর খাদ্য খেতে হবে।

২। প্রতিদিন ভালো ক'রে (শীতের দেশে কমপক্ষে সপ্তাহে একদিন) গা রগড়ে স্নান করা উচিত।

৩। হাত ময়লা হ'লেই সাবান দিয়ে ধোয়া, বিশেষ ক'রে খাওয়ার আগে এবং প্রসাধনের পূর্বে।

৪। প্রত্যহ দিনে ও রাত্রে আহারের পর ব্রাশ বা দাঁতন দিয়ে ভালো ক'রে দাঁত মাজা দরকার।

৫। নখ, চুল এবং ত্বক্ পরিষ্কার রাখা।

৬। চোখ, নাক, কান ও গলার যত্ন নেওয়া এবং দুর্ঘটনা থেকে তাদের রক্ষা করা।

৭। যা পরিহারযোগ্য, সেগুলি বাদ দেওয়া।

৮। দরজা-জানালা খুলে অনেকক্ষণ ঘুমানো।

৯। মুক্ত প্রাঙ্গণে নিত্য ব্যায়াম করা।

১০। ধূলা, মাছি প্রভৃতি থেকে খাদ্যবস্তু রক্ষা করা।

১১। ঋজু দেহ-কাঠামো ও তার সুগঠন।

১২। ঘরের তাপ-নিয়ন্ত্রণ (বিশেষ ক'রে শীতের দেশে)।

১৩। ভিজা জামা-জুতা ব্যবহার না করা (ভিজে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তা ছেড়ে ফেলা দরকার)।

১৪। ঘা, কাটা, ক্ষত, ফোঁড়া এবং চোট-লাগা স্থানের যত্ন নেওয়া।

১৫। প্রত্যেকের জন্য নিজের আলাদা জলের গ্লাস, গামছা বা তোয়ালে থাকা দরকার।

এই প্রসঙ্গে স্বাস্থ্য-শিক্ষকের ত্রিবিধ কর্তব্য এবং একাধিক দায়িত্ব আছে। স্বাস্থ্য-শিক্ষকের প্রাথমিক কর্তব্য হচ্ছে, প্রত্যেকটি ছাত্র যাতে স্বাস্থ্য-নীতির অবশ্যপালনীয় কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন হয় এবং সেই জ্ঞানকে কাজে লাগাতে সচেষ্ট হয়। দ্বিতীয় কর্তব্য হচ্ছে, স্বাস্থ্যকর জীবন-যাত্রার অভ্যাসগুলি ছাত্ররা যাতে ব্যবহারিক কাজে লাগাতে পারে, অভ্যাসের দ্বারা আয়ত্ত করতে পারে, সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া। তৃতীয় কর্তব্য হচ্ছে, শিক্ষকের পরিচালনায় যাতে ছাত্রদের স্বাস্থ্যকর আচরণগুলি বয়সানুপাতে গড়ে উঠে, সেদিকে লক্ষ্য রাখা। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শেষ শ্রেণীতে পৌছানোর পরে নিম্নলিখিত সু-অভ্যাসগুলি ছেলেদের আয়ত্তাধীন হয়েছে কিনা, তা দেখতে হবে :—

(১) পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে সচেতনতা, (২) ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য-রক্ষার প্রয়োজনীয় সতর্কতা, (৩) সমাজ-সেবার সৎ ইচ্ছা এবং (৪) সহযোগিতা ও সাহায্য করার মনোভাব।

প্রসঙ্গক্রমে স্বাস্থ্য-শিক্ষা :

পরিবেশ ও পরিস্থিতি অনুসারে স্বাস্থ্য-শিক্ষা দেওয়াই সমীচীন। যেমন মনে করা যাক, ছেলেদের ওজন নেওয়া হ'ল। কার দৈহিক ওজন কত, তারা জানতে পারল। তারপর শ্রেণী-কক্ষে তাদের দৈহিক বৃদ্ধি সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করা যেতে পারে। কোন্ বয়সের ছেলের দৈহিক ওজন কত হওয়া উচিত, দৈহিক বৃদ্ধির জন্য কি কি পুষ্টিকর খাদ্য খাওয়া যুক্তিসঙ্গত, ওজন বৃদ্ধির জন্য কি করা উচিত ইত্যাদি বিষয়ে শ্রেণী-কক্ষে আলোচনা করলে সুফল পাওয়া যেতে পারে।

ডাক্তাররা হয়তো ছেলেদের চোখ, কান ও দাঁত পরীক্ষা করলেন। পরীক্ষায় ছেলেদের যে-সব দোষ-ত্রুটি ধরা পড়ল, স্বাস্থ্যের শ্রেণীতে স্বাস্থ্য-শিক্ষক সেই প্রসঙ্গের উল্লেখ ক'রে দাঁত, চোখ ও নাকের ব্যাধি হয় কেন, কি কি উপায় অবলম্বন করলে তার প্রতিকার করা যায়, সে বিষয় আলোচনা করতে পারেন। এইভাবে ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার সূত্র ধ'রে ছেলেরা অজানা তথ্য সম্বন্ধে সহজেই ওয়াকিবহাল হ'তে পারে। সেই স্বাস্থ্য-জ্ঞানের স্থায়ী মূল্য আছে শিশুদের জীবনে।

উচ্চ বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য-শিক্ষা-দানের পরিকল্পনা :

উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রদের কিভাবে সকলকেই একসঙ্গে স্বাস্থ্য-শিক্ষা দেওয়া যাবে, তা একটা সমস্যার কথা। সব শ্রেণীর ছাত্রদের যখন স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান পড়তে হয় না, তখন যারা (বিশেষ ক'রে উচ্চ শ্রেণীতে) স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান পড়ে না, কেমন ক'রে তাদের স্বাস্থ্য-শিক্ষার নির্দেশ দেওয়া যাবে? অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে প্রসঙ্গক্রমে, অথবা বিশেষ শ্রেণীতে তাদের মধ্যে স্বাস্থ্য-জ্ঞান পরিবেশন করতে হবে। ল্যাটিন

সে প্রশ্নের একটা সদুত্তর দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রত্যেকটি ছাত্রের জন্যই যখন শারীরিক শিক্ষার প্রয়োজন, তখন শারীরিক শিক্ষাকে আবশ্যিক শিক্ষণীয় বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। যারা স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান, জীব-বিদ্যা ছাড়া অন্যান্য বিষয় গ্রহণ করবে, তাদের স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান শেখানোর জন্য বিশেষ শ্রেণীর ব্যবস্থা করতে হবে।

কেমন ক'রে স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের বিষয়-বস্তুগুলিকে সাজাতে হবে :

এই প্রসঙ্গে স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানবিদ্‌রা প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁরা বলেছেন, কেমন ক'রে স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের বিষয়-বস্তুগুলি সাজাতে হবে, এই প্রশ্নটাই অবান্তর। কারণ, স্বাস্থ্য-শিক্ষা একান্তভাবে ব্যক্তিগত এবং প্রয়োজনসাপেক্ষ। কাজেই, স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় কি বিষয় শেখাতে হবে, সেটা জানা থাকলে, শিক্ষণীয় বিষয়গুলি ধারাবাহিকভাবে সাজিয়ে নিলেই যথেষ্ট হ'ল। এর বিরুদ্ধবাদীরা বলেছেন, প্রত্যেক বিষয়ের উৎপত্তি থেকে ক্রম-পরিণতি পর্যন্ত যতগুলি পর্যায় আছে, সেগুলি পর পর শেখানোই উচিত। কিন্তু যারা শিখবে, তাদের প্রয়োজন ও অনুরাগের কোন কথাই এখানে ভাবা হয়নি। যে বিষয়-বস্তুর সঙ্গে শিশুর অনুরাগ ও প্রয়োজনের কথাটা জড়িয়ে আছে, সে বিষয় আয়ত্ত করতে শিশুদের তেমন বেগ পেতে হয় না। স্বাস্থ্য-প্রকল্পের (Health Project) মাধ্যমে এই শিক্ষা-পদ্ধতিকে কেবল কার্যকরী করা যায় ; তা ছাড়া, ইতিহাস-ভূগোল প্রভৃতি বিষয়ের সঙ্গেও তার সংযোজনা হ'তে পারে। নিম্নে শিশু-স্বাস্থ্য-প্রকল্পের একটি নমুনা দেওয়া গেল :—

ভিন্ দেশের শিশু-স্বাস্থ্য :

১। এস্‌কিমো শিশু—

(ক) এস্‌কিমোদের ঘর-বাড়ী ;
(খ) তার বায়ু-সঞ্চালনের ব্যবস্থা ;
(গ) আলোর ব্যবস্থা ;
(ঘ) ঘরের মধ্যে চলা-ফেরা করার ও খেলার স্থান আছে কি না ;
(ঙ) কক্ষ-সংখ্যা কত ;
(চ) আবহাওয়ার অবস্থা।

২। তাদের দৈনন্দিন জীবন—

(ক) তারা কতক্ষণ ঘুমায় ;
(খ) তাদের শোয়ার অভ্যাস কেমন ; রাত্রে তারা কি পোশাক পরে ;
(গ) তাদের পরিচ্ছন্নতার অভ্যাস আছে কিনা ;

(ঘ) স্নানের জন্য কোন জল পাওয়া যায়, না বরফ গলিয়ে তাপ ব্যবস্থা করতে হয় ;

(ঙ) দেহের উত্তাপ-রক্ষার জন্য তারা সর্বাঙ্গে চর্বি মাখে।

৩। তাদের খাওয়ার অভ্যাস কেমন—

(ক) শরীরকে গরম রাখার জন্য তারা প্রচুর পরিমাণে মাংস, ডিম, দুধ, মাছ প্রভৃতি খায় ;

(খ) সাধারণতঃ তাদের দাঁতের অবস্থা ভালো, তবে শেষ বয়সে প্রায় খয়ে আসে।

৪। অদ্ভুত সামাজিক রীতি—

(ক) নাক ঘষে অতিথিকে অভ্যর্থনা করে ;

(খ) মায়েরা জিভ দিয়ে ছেলেদের মুখ পরিষ্কার ক'রে দেয়।

৫। শিশুরা কি কি দুর্ঘটনার সম্মুখীন হয়—

(ক) ছুরিতে কাটা ;

(খ) কুকুরে কামড়ানো ;

(গ) তুষার আঘাত ;

(ঘ) তুষার-অন্ধতা প্রভৃতি।

৬। এদের খেলাগুলা কি—

নৌকা চালানো, কুস্তি লড়া, স্কেট করা, তীর-ধনুক নিয়ে খেলা, পাহাড় থেকে দ্রুত নামা ইত্যাদি।

৭। এদের শারীরিক বিকাশ কেমন—

আকার, দৈহিক গঠন, উচ্চতা ও তাদের পরমায়ু কত।

উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের উপযোগী স্বাস্থ্য-প্রকল্প

খাদ্য ও পরিপুষ্টি :

(১) উদ্দেশ্য—

১। খাদ্য-নির্বাচনের নীতি-নির্ধারণ ;

২। খাদ্য পরিপাকের নিয়ম ;

৩। বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে খাদ্য-প্রস্তুতি ;

৪। সমাজগত খাদ্য সরবরাহের সতর্কতা ;

৫। পুষ্টিকর খাদ্য কিভাবে ব্যক্তি-স্বাস্থ্য ও চেহারার উন্নতিসাধন করে।

(২) **কার্যকলাপ—**

১। (ক) দেহের জন্য কেন খাদ্য ও জলের প্রয়োজন ?

(খ) পূর্ব বৎসর অপেক্ষা এ বৎসর ওজন ও উচ্চতা কতটা বাড়ল, তার পরিমাপ করা ;

(গ) ব্যক্তিগত বৃদ্ধির মাসিক প্রগতি-পত্র রাখা ;

(ঘ) কমপক্ষে তিন মাসের জন্য ছোট ছেলেদের বৃদ্ধির প্রগতি-পত্র রাখতে হবে।

২। দেহের জন্য কি কি বিভিন্ন ধরনের খাদ্যের প্রয়োজন ?

(ক) গত দু'দিনে কি কি খাওয়া হয়েছে তার হিসাব রাখা, ছাত্ররা দৈনিক গড়ে কতটা দুধ, ফল এবং শাক-সব্‌জি খেয়েছে ;

(খ) উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রদের দৈনন্দিন খাদ্যের মান নির্ধারণ ;

(গ) এই খাদ্য-মানের সঙ্গে ব্যক্তিগত আহার্যের তুলনা করা ;

(ঘ) বিদ্যালয়ের দেয় খাদ্যের মান উন্নীত করা ;

(ঙ) দাঁতের বৃদ্ধির জন্য দুধ ও প্রয়োজনীয় ভিটামিন খাদ্যের ব্যবস্থা করা।

৩। ভালো পুষ্টিকর খাদ্যের লক্ষণ কি কি ?

(ক) স্বাস্থ্য-বৃদ্ধির প্রগতি-পত্র থেকে দেখতে হবে যে, পুষ্টিকর খাদ্য ব্যবহারে ছেলেদের কি কি পরিবর্তন এসেছে ;

(খ) কোন্ পুষ্টিকর খাদ্য সহজে তৈরি করা যায় ; তার পরিকল্পনাকে কার্যকরী করতে হবে ;

(গ) দাঁতের ক্ষয় ও বৃদ্ধি থেকে কি কি পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব হয়েছে, তা আবিষ্কার করতে হবে।

৪। খাদ্যবস্তুর উৎস কি ?

৫। বয়স ও পেশা অনুসারে কি কি ধরনের খাদ্যের প্রয়োজন ?

৬। কেমন ক'রে দেহে খাদ্য পরিপাক হয় ?

৭। স্বাস্থ্য, শক্তি এবং ক্ষয়-নিবারণে কিভাবে পরিপাক-করা খাদ্য দেহের বিভিন্ন কোষে সংগৃহীত হয় ?

৮। অপ্রয়োজনীয় খাদ্যবস্তু নিকাশের দরকার কেন ? ইত্যাদি।

যৌন-শিক্ষা ঃ

যৌন-শিক্ষা ছেলেমেয়েদের দেওয়া উচিত কিনা, সে সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন আছে। প্রথম কথা হচ্ছে, কোন্ বয়সের ছাত্রদের যৌন-শিক্ষা দেওয়া বিধেয় ? শিশু, কিশোর, না যুবকদের ? বয়স নির্ধারিত হ'লে, পদ্ধতি কি হবে ? এমনতর অনেক প্রশ্ন বিভিন্ন স্তর থেকে উত্থাপিত হয়েছে।

স্বাস্থ্যবিদ্‌রা অবশ্য বলেছেন যে, যৌন-শিক্ষা স্বাস্থ্য-রক্ষার পক্ষে একান্ত অপরিহার্য। বয়ঃ-সন্ধি-উত্তরকালের দৈহিক ভালো-মন্দের সব-কিছু নির্ভর করে যৌন-শিক্ষার উপর। এই সম্পর্কে যাদের সম্যক্ ধারণা আছে, তারা অনেক অপরিণাম-দর্শিতার কুফল থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে। পরীক্ষান্তে দেখা গেছে, যৌন-ব্যাধিগ্রস্ত লোকদের মধ্যে শতকরা ৭৫ জনই অজ্ঞতাবশতঃ এই ব্যাধির কবলে পতিত হয়েছে। কঠোর গোড়ামির গোপনতায় অথবা লজ্জার আড়ালে যে চেতনাকে ঢেকে রাখার চেষ্টা হয়েছিল, যৌবন-সমাগমে সেই সহজাত প্রবৃত্তি যখন উদ্দাম হ'য়ে উঠল, তখন কোন সমাজ-বন্ধনে তাকে আট্‌কানো গেল না। এইভাবে বিকার থেকে যে বিকৃতি এল, তাতে ব্যক্তি থেকে সমাজ হ'ল ক্ষতিগ্রস্ত। এই কথার উল্লেখ ক'রে যৌন-বিশেষজ্ঞরা বলেছেন যে, উপরি-উক্ত কারণেই শৈশব থেকেই শিশুদের প্রসঙ্গক্রমে যৌন-শিক্ষা দেওয়া উচিত। যে যৌন-বিজ্ঞানের উপর প্রাক্‌জন্ম থেকে মানুষের যৌবনোত্তর কালের ভালো-মন্দ বহুলাংশে নির্ভর করে, সুস্থ জীবনের প্রয়োজনেই তাকে জানতে ও মানতে হবে। যে শিক্ষক শিশুদের সঙ্গে যত ঘনিষ্ঠভাবে মিশতে পারেন, যাঁর কাছে শিশুদের কোন সঙ্কোচ নেই ; তিনিই গল্পের ছলে, সুকৌশলে এবং প্রসঙ্গক্রমে ছেলেদের যৌন-শিক্ষা দিতে পারেন। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রদের যে বয়সে যৌন-চেতনা ও কৌতূহল সজাগ হয়ে উঠে, সেই সময় যৌন-শিক্ষার বিশেষ প্রয়োজন আছে। এ সম্বন্ধে তাদের ধারণা যতই স্পষ্ট হবে, ততই তাদের ভবিষ্যৎ জীবন নিরাপদ হবে। ভগ্ন-স্বাস্থ্যের বহু পীড়া থেকে তারা রেহাই পাবে। সেটা হবে যৌন-শিক্ষার শ্রেষ্ঠ পাথেয়।

ওজন ও পরিমাপ ঃ

ওজন ও পরিমাপই শিশু-স্বাস্থ্য-পরীক্ষার শ্রেষ্ঠ নিরিখ। বয়সের সঙ্গে সমতা রেখে শিশুরা যখন উচ্চতা ও ওজনে ঠিক মত না বাড়ে, তখন বুঝতে হবে সেই শিশুরা নিশ্চয় অসুস্থ। এর ফলাফলের উপরই স্বাস্থ্য-পরিকল্পনার ভবিষ্যৎ কার্যসূচী বিরচিত হবে। পরপৃষ্ঠায় শিশুদের দৈহিক বৃদ্ধির একটি নজির-পত্র দেওয়া গেল ঃ—

দৈহিক বৃদ্ধির নজির-পত্র

ছাত্রের নাম...বয়স.....................

বিদ্যালয়ের নাম.................................... শ্রেণী.........................কক্ষ.....................

তাং	ছাত্রের নাম	মাস...... দিন......					মাস ও দিন	মা... দি...	মা... দি...	মাস.................. দিন..................					বৈশাখ	জ্যৈষ্ঠ	আষাঢ়	মন্তব্য
		বয়স	উচ্চতা	ওজন	পূর্ব মাস থেকে বৃদ্ধি কত		বৈশাখ	জ্যৈষ্ঠ	আষাঢ়	শ্রাবণ	ভাদ্র	আশ্বিন	ছ মাসের বৃদ্ধির পরিমাপ		উচ্চতা	ওজন	ওজন	
					ফু. ই.	পাউণ্ড							উচ্চতা	ওজন				
১																		
২																		
৩																		
৪																		
৫																		
৬																		
৭																		
৮																		
৯																		
*১০																		

* এরূপে পুরা মাসের নজির-পত্র তৈরি করতে হবে।

দৈনিক প্রাতঃকালীন পরিদর্শন :

প্রাতঃকালীন পরিদর্শনের সুবিধা অনেক। প্রথমতঃ হচ্ছে, অসুস্থ শিশুদের পৃথক করার সুবিধা ; দ্বিতীয়তঃ, কোন একটি ব্যাধির প্রসঙ্গ থেকে পরবর্তী শ্রেণী-আলোচনার সূত্র খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। তা ছাড়া, প্রত্যূষে উঠেই ছেলেরা পরিদর্শনের জন্য পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হওয়ার সু-অভ্যাস গঠনের সুযোগ পাবে।

সম্ভব হ'লে ছাত্র-নেতার দ্বারাই সমস্ত ছাত্রদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাতে হবে। শিক্ষক কাছে কাছে থেকে তাকে সাহায্য করবেন। শীতকাল ছাড়া অন্য সময়ে খালি গায়েই স্বাস্থ্য পরীক্ষা করার ব্যবস্থা হ'লে ভালো হয়।

পরিদর্শনের নিয়ম :

১। প্রথমে ছেলেদের কানের পাশ দিয়ে হাত উঠাতে বলতে হবে। তারপর ছেলেদের হাতের কনুই, নখ, আঙুল পরীক্ষা ক'রে দেখতে হবে, হাতের কোথাও কোন ময়লা, ক্ষত বা ফোলা আছে কিনা।

২। হাতের আঙুল ও নখ দেখা হ'লে, ছেলেদের সামনের দিকে দেহ ও মাথা বাঁকাতে বলতে হবে। তারপর ছেলেদের ঘাড়, মাথা, পরিধান পরিচ্ছন্ন আছে কিনা দেখতে হবে।

৩। বাঁ কান দেখার সময় ছেলেদের ডানদিকে মাথা ঘোরাতে বলতে হবে এবং অনুরূপভাবেই ডানদিকের কান দেখতে হবে।

৪। চোখের কোথাও ফোলা আছে কিনা দেখার জন্য শিক্ষক বলবেন, ঘাড় উঁচু ক'রে আমার দিকে তাকাও।

৫। তারপর হাঁ করার নির্দেশ দিয়ে ছেলেদের দাঁত পরীক্ষা করতে হবে।

৬। হাঁ ক'রে আ-আ করতে বলতে হবে, সে সময় তার গলার টনসিল পরীক্ষা করার সুযোগ হবে।

তারপর দেখতে হবে—

(ক) জর আছে কিনা।

(খ) নাক, চোখ ফোলা বা লাল কিনা।

(গ) গলায় কোন ঘা বা ফোলা আছে কিনা।

(ঘ) কোন জায়গায় চোট লাগা, ভাঙা বা মচকানো আছে কিনা।

পরিদর্শন অন্তে নিম্নলিখিত বিষয়ে সচেতন হ'তে হবে—

(১) কখনো কোন রোগ নির্ণয় ক'রে বসা ঠিক নয়।

(২) কোন চিকিৎসার নির্দেশ দেওয়া ঠিক নয়।

(৩) কোন ঔষধ ব্যবহার করতে বলা ঠিক নয়।

(৪) কোন বিশেষ ডাক্তারের কাছে পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া ঠিক নয়।

(৫) কোন অসুখের বিষয় নিয়ে অভিভাবকদের সঙ্গে তর্ক করা ঠিক নয়।

(৬) কোন রকম ঔষধ দেওয়া ঠিক নয়।

(৭) ছেলেদের স্বাস্থ্য-পরীক্ষার সময় সহজে কাউকে স্পর্শ করা ঠিক নয়।

চার্টের ব্যবহার ঃ

আজকাল স্বাস্থ্য-সম্পর্কীয় বিভিন্ন চার্ট, প্রগতি-পত্র, ছবি এবং সংশোধনী পত্রের বহুল প্রচলন দেখা যায়। সব ক্ষেত্রেই যে চার্টগুলি নির্ভুল এবং স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান-সম্মত, এমন নয়। তাই অনেক স্বাস্থ্যবিদ্ বলেছেন, যে সমস্ত চার্ট বা নজির-পত্রের কোন নির্দিষ্ট মান নেই, যা বিজ্ঞান-সম্মত নয়, সেগুলি ব্যবহার না করাই ভালো। কাজেই, নির্ভরযোগ্য চার্ট ডাক্তার ও বিশেষজ্ঞদের নির্দেশক্রমে ব্যবহার করাই উচিত। যে চার্ট ও ছবি শিশুদের মনে স্থায়ী রেখাপাত করে, সেগুলি নির্ভুল ও সুনির্দিষ্ট হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

স্বাস্থ্যকর জীবন-যাপন

স্বাস্থ্যকর জীবন একান্ত কাম্য হ'লেও, কামনা ক'রে তাকে সর্বদা পাওয়া যায় না। স্বাস্থ্য নির্ভর করে ব্যক্তিগত সু-অভ্যাস এবং শরীর-চর্চার উপর। আচরণ-পদ্ধতি যাতে সুনিয়ন্ত্রিত এবং স্বাস্থ্যপ্রদ হ'তে পারে, সেজন্য স্বাস্থ্য-নীতি সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞানের প্রয়োজন। জ্ঞান অভ্যাস যখন দৈহিক কল্যাণ-সাধনে নিয়োজিত হয়, তখনই বুঝতে হবে, স্বাস্থ্যকর জীবনানুশীলন আরম্ভ হয়েছে। তাই শরীর-তত্ত্ববিদ্‌রা বলেছেন,

(১) **স্বাস্থ্যতত্ত্ব-জ্ঞানের আগে প্রয়োজন স্বাস্থ্যানুশীলনের ;** অর্থাৎ, Learning healthy ways of living must precede learning about health.

(২) **নিত্য অভ্যাস-সূচীর প্রয়োজন** (Need for a regular Routine)—প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্য নিয়মিত অভ্যাসের প্রয়োজন আছে। স্বাস্থ্যকর অভ্যাস থেকে যে আচরণে শিশুরা অভ্যস্ত হবে, তার প্রভাব থাকবে শিশুর সমগ্র জীবনে ব্যাপ্ত হয়ে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রদের পক্ষে এ নীতি যেমন সত্য, অন্যান্য উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রদের ক্ষেত্রেও এ তত্ত্ব তেমনি সত্য। ব্যক্তিগত সাফাই, শরীরচর্চা, দেহের যত্নপ্রভৃতি সবই নিত্য অভ্যাসের অন্তর্ভুক্ত। এইজন্য স্বাস্থ্য-তত্ত্ববিদ্‌রা

বলেছেন যে, স্বাস্থ্যকর অভ্যাস-অনুশীলনের জন্য দৈনিক ৫ থেকে ১০ মিনিট সময় দিতে হবে। এই অভ্যাসের প্রয়োগ-পদ্ধতি একাধিক হ'তে পারে। শিশুর বয়স ও প্রয়োজনানুসারে তার রদ-বদল হ'তে পারে। কেউ হয়তো ছাত্রদের প্রাতঃকালীন স্বাস্থ্য-পরিদর্শনকে নিত্য অভ্যাসের অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন। শিশুদের মধ্যাহ্ন-ভোজনকে কেন্দ্র ক'রেও খাওয়া-দাওয়ার নীতি, দাঁতের যত্ন নেওয়া প্রভৃতি বিষয়ে রোজ কিছু কিছু আলাপ-আলোচনা করা যেতে পারে। প্রতিটি ক্ষেত্রে ব্যবহারিক অভ্যাস অন্তেই সেই বিষয়ের গুণাগুণ আলোচনা করা যেতে পারে।

(৩) **স্বাস্থ্যকর আচরণ স্বাস্থ্যকর অভ্যাস-সঞ্জাত**—যখনই স্বাস্থ্যের যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে হবে, তা সুপরিকল্পিত ও সুনির্দিষ্ট হওয়া উচিত। যাতে প্রত্যেকটি অভ্যাস ব্যক্তিবিশেষের আচরণে রূপান্তরিত হয়, সেজন্য বিষয়গুলি সহজ, সরল, ব্যক্তিগত এবং সরাসরি হওয়াই বাঞ্ছনীয়। উদাহরণস্বরূপ বলা চলে যে, শিক্ষক মহাশয় ছাত্রদের নির্দেশ দিলেন, হাত, মুখ, চুল, দাঁত, নাক, নখ প্রভৃতি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে; কিন্তু ছেলেরা সে অভ্যাসে পটু হ'ল কিনা, প্রতিদিন শিক্ষকদের তা লক্ষ্য করতে হবে। যতক্ষণ না সেগুলি শিশুর আচরণে রূপান্তরিত হয়, ততক্ষণ সে অভ্যাসের নিত্য প্রয়োজন আছে। অভ্যাসের মাধ্যমে শিশুরা জানতে পারে, শরীর-চর্চার সঙ্গে বিশ্রামের সম্পর্ক কি, ব্যায়াম ও নিদ্রার দরকার কেন, দৈহিক ক্ষয়নিবারণ ও বৃদ্ধির জন্য কি কি খাদ্যের প্রয়োজন, বায়ু-সঞ্চালন ও বিদ্যালয়ের কক্ষ পরিষ্কার রাখার প্রয়োজন কেন—এই জ্ঞান লাভ করার পরই শিশুরা অভ্যাসের দ্বারা তার ফলাফল লাভের জন্য সচেষ্ট হবে। অনেক সময় দেখা যায় যে, স্বাস্থ্য সম্পর্কে অনেকের হয়তো প্রভূত জ্ঞান আছে, কিন্তু তাঁরা কখনই তার ব্যবহার করেন না। তার কারণ, শৈশবে বা যৌবনে জ্ঞানার্জনের খাতিরে তাঁরা সেগুলি অধ্যয়ন করেছেন, কিন্তু কোনদিন অভ্যাস করেননি, তাঁরা স্বাস্থ্য-নীতি জেনেও স্বাস্থ্যকর জীবন-যাপনের আনন্দ থেকে বঞ্চিত।

এখন ভেবে দেখা দরকার, স্বাস্থ্যকর জীবনের জন্য কি কি প্রয়োজন। প্রাকৃতিক অবদান এবং ব্যক্তিগত অভ্যাসের উপরই স্বাস্থ্য নির্ভর করে। পর্যাপ্ত আলো, বাতাস এবং বিশ্রাম সুস্থ জীবনের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। স্বাস্থ্যকর জীবন-যাপনের জন্য প্রথমে প্রয়োজন বিশুদ্ধ বায়ু ও সূর্যালোক।

বিশুদ্ধ বায়ু ও সূর্যালোক:

বিশুদ্ধ বায়ু রক্ত পরিষ্কার করে এবং ফুসফুসের কার্যকরী শক্তিকে বাড়িয়ে দেয়। এই বিশুদ্ধ বায়ু পাওয়া যায় ঘরের বাইরে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে। এইজন্য ছেলেদের

শ্রেণী-কক্ষের বাহিরে খেলার মাঠে অবাধ বিচরণ ও খেলাধূলার সুযোগ দেওয়া উচিত। ভোরের আলো-বাতাসে শরীর কেবল সতেজ হয় না, ফুস্‌ফুস্‌ দিয়ে নিশ্বাসের সঙ্গে যে পর্যন্ত বিশুদ্ধ বায়ু দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করে, তার দ্বারা জীবনী-শক্তি বৃদ্ধি পায়। যে আলো ত্বক্‌ ও দেহের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়, সেই আলো-বাতাস যাতে ঘরে-বাইরে সব সময় পাওয়া যায়, তার ব্যবস্থা করা উচিত। রাত্রে ও দিনে ঘরের সমস্ত জানলা খুলে রাখা ভালো ; তাতে সব সময় বিশুদ্ধ বাতাস এবং প্রয়োজনীয় আলো পাওয়ার বিশেষ সম্ভাবনা থাকে।

শ্বাস-প্রশ্বাসের নিয়ম ঃ

যাতে ফুস্‌ফুস্‌ ভরে বিশুদ্ধ বাতাস পাওয়া যায়, সেজন্য মুক্ত আলো-বাতাসে ফুস্‌ফুসের ব্যায়াম বা দীর্ঘ শ্বাস গ্রহণ ও পরিত্যাগের অভ্যাস করা উচিত। জোরে জোরে ঘন ঘন নিশ্বাস গ্রহণ ও প্রশ্বাস ত্যাগের প্রকৃষ্ট উপায় হচ্ছে দৌড়ানো। ছুটাছুটি করার সময়ই ছেলেরা নাক দিয়ে তাড়াতাড়ি নিশ্বাস গ্রহণ করে, এবং ফুস্‌ফুস্‌ থেকে দ্রুত দূষিত বায়ু ত্যাগ করে। এইজন্য নাক পরিষ্কার ও বায়ু-প্রবেশের পথ সর্বদা উন্মুক্ত রাখা উচিত। মুখ দিয়ে কখনই নিশ্বাস নেওয়া ঠিক নয়। কারণ, তাতে বায়ুবাহী রোগের জীবাণু সহজেই দেহের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে। নাকের মধ্যে দিয়ে যে বাতাস ভিতরে যায়, তার সমস্ত ধূলিকণা নাকের ঝিল্লীতে আট্‌কে যায়, ঠাণ্ডা অবস্থায় বিশুদ্ধ বায়ু ভিতরে প্রবেশ করে। খারাপ গন্ধ যাতে নাকে প্রবেশ করতে না পারে, তার জন্য রুমাল ব্যবহার করা উচিত।

দৈহিক পরিচ্ছন্নতা ঃ

স্বাস্থ্যকর জীবন-যাপনের জন্য দৈহিক পরিচ্ছন্নতারও বিশেষ প্রয়োজন। দেহের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা একান্ত কর্তব্য। এই পরিচ্ছন্নতার প্রয়োজন কেবল ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়, অপরাপর সকলের জন্যও বটে। কারণ, একজনের অপরিচ্ছন্নতা শ্রেণীর অন্যান্য ছাত্রদের পক্ষে ক্ষতিকর হ'তে পারে। দেহে কোন ক্ষত বা ঘা থাকলে, অপরিচ্ছন্নতা থেকে সেগুলি বিষিয়ে উঠতে পারে ; এমন কি তা থেকে ধনুষ্টঙ্কার ব্যাধি পর্যন্ত হ'তে পারে। দেহ থেকেই দেহে ব্যাধি ছড়িয়ে পড়ে। এজন্য সর্বাগ্রেই দৈহিক পরিচ্ছন্নতার প্রয়োজন। নোংরা হাতে আহার্য পরিবেশন ও ভক্ষণ—কোনটাই করা ঠিক নয়।

সম্ভব হ'লে গরম জলেই সব ধোয়া-মোছা করা উচিত। ঔষধ খাওয়ার জন্য ঠাণ্ডা জলের দরকার ; আর মুখ, গলা, হাত ধোয়ার জন্যও ঠাণ্ডা জলের প্রয়োজন। সময়মতো নখ কাটা ও পরিষ্কার রাখা একান্ত কর্তব্য। কারণ, নখের ময়লা থেকে নানাপ্রকার পেটের অসুখ প্রভৃতি হ'তে পারে।

গরম দেশে শীতের দিনে সর্বাঙ্গে ভালো ক'রে তেল মাখা উচিত। তারপর গামছা দিয়ে রগড়ে স্নান করা উচিত। তোলা জলে স্নান করা অপেক্ষা অবগাহন স্নানই শ্রেয়ঃ। দৈনিক একবার নির্দিষ্ট সময়ে মলত্যাগ করার অভ্যাস করা উচিত। অপরিচ্ছন্ন দেহে প্রতিনিয়তই যে অস্বস্তিকর অনুভূতির সৃষ্টি হয়, তা যেন ক্রমশঃই জীবনের সমস্ত আনন্দ ও সুরুচি নষ্ট করে।

নিদ্রা ও বিশ্রাম ঃ

দেহের জন্য যেমন কাজের দরকার, তেমনি প্রয়োজন বিশ্রামের। দৈনন্দিন জীবনের কর্ম-ক্লান্তি দূরীভূত হয় বিশ্রামের মাধ্যমে। বিশ্রাম দেহকে কেবল গ্লানিমুক্ত করে না, তাকে সুস্থ ও সতেজ ক'রে তোলে। বিশেষ ক'রে কর্ম-ক্লান্ত দেহ যেন রোজ রাত্রিশেষে নবজন্ম লাভ করে। দেহ-মন তার পূর্ণ কার্য-ক্ষমতা ফিরে পায়।

শৈশবে এই নিদ্রা ও বিশ্রামের প্রয়োজন অনেক বেশী। কোন্ বয়সে কতটুকু ঘুমানো দরকার, শরীর-তত্ত্ববিদ্‌রা তার একটি তালিকা দিয়েছেন। নিম্নে সেটি উদ্ধৃত করা গেল :—

কোন্ বয়সে	কতক্ষণ ঘুমানো দরকার	শোয়ার সময়
৪ বৎসর বয়সে	১২ ঘণ্টা	সন্ধ্যা ৬-৩০ মিনিট
৫—৭ " "	১১-১২ "	সন্ধ্যা ৭টা
৮—১১ " "	১০-১১ "	সন্ধ্যা ৮টা
১২—১৪ " "	৯-১০ "	সন্ধ্যা ৮টা থেকে ৯টার মধ্যে

নিদ্রা ও বিশ্রামের জন্য উপযুক্ত স্থান ও পরিবেশের বিশেষ প্রয়োজন। যে ঘরে বহু লোক একত্রে বাস করে, ঘরের তুলনায় যেখানে লোকসংখ্যা অনেক বেশী, সেখানে ছেলেদের ভালো ঘুম হওয়া কি সম্ভব? রাত্রের অন্ধকার নিস্তব্ধতাই শিশুদের পূর্ণ-ঘুমের সুযোগ দেয়। যে শোয়ার ঘরে অবাধে বায়ু-সঞ্চালন হয়, বিশুদ্ধ বায়ু আসা-যাওয়া করতে পারে, সেটাই হবে ঘুমানোর উপযুক্ত পরিবেশ।

পোশাক-পরিচ্ছদ ঃ

শীত প্রধান দেশে সব ঋতুতেই পোশাক-পরিচ্ছদের বিশেষ প্রয়োজন। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে শীতকাল ছাড়া অন্যান্য ঋতুতে দেহাবরণের তেমন দরকার হয় না। পোশাক দেহ-তাপকে রক্ষা করে এবং সরাসরি দেহে শীত ও তাপ লাগে না। ঋতু-ভেদে পোশাক স্বতন্ত্র হওয়া উচিত। কোন অবস্থাতেই ভিজা জুতো বা জামা পরা ঠিক নয়। ভিজা জামা-কাপড় ঠিকমতো শুকিয়ে নিয়ে গায়ে দেওয়া উচিত।

জামা ও কাপড়ের নীচে যে গেঞ্জি ও আণ্ডারওয়ার ব্যবহার করি, সেগুলি সপ্তাহে দু'বার পরিষ্কার করা দরকার। দিনের ব্যবহৃত জামা-কাপড় প'রে রাত্রে শোয়া ঠিক নয়। রাত্রের পোশাক খুব আল্‌গা ও ঢিলা হওয়াই বাঞ্ছনীয়। ছোটদের অতিরিক্ত জামা-কাপড় পরানো উচিত নয়। পরিষ্কার ও ঢল্‌ঢলে পোশাক ছেলেদের পরানো ভালো। শীতের দিনে মাঝে মাঝে ছেলেদের গরম কোট ব্রাশ দিয়ে ঝেড়ে দেওয়া; জুতো পরিষ্কার ক'রে কালি দিয়ে দেওয়া উচিত।

চোখ-কানের যত্ন ঃ

ছোট বয়সেই ছেলেদের চোখ-কানের যত্ন নেওয়ার বিশেষ দরকার। দেখা-শোনার অভাবে বা অযত্নে প্রায়শঃ ছোটরা চোখ-কানের ব্যাধিতে ভোগে। শ্রেণীতে মাঝে মাঝে পরীক্ষা ক'রে দেখা উচিত যে, তাদের দৃষ্টিশক্তি প্রখর কিনা, অথবা তারা ঠিকমতো শুনতে পায় কিনা। কোন কারণে যদি শিশুদের শুনতে বা দেখতে এতটুকু অসুবিধা হয়, তাহ'লে তৎক্ষণাৎ ডাক্তার দেখানোর ব্যবস্থা করতে হবে। ছেলেরা অনেক সময় নাকে বা কানে শক্ত জিনিস দিয়ে খোঁচা দেয়, কখনো বা কুঁচফল ঢুকিয়ে ফেলে। তাতে শিশুরা যে কেবল কষ্ট পায় তা নয়, তাদের নাক-কানের ক্ষতিও হ'তে পারে। যাতে কোন দুর্ঘটনা না ঘটে, সেদিকে সজাগ থাকা উচিত। সর্বদা ছোটদের নাক-কান ভালো ক'রে পরিষ্কার ক'রে দেওয়া উচিত।

দাঁতের যত্ন ঃ

দাঁত মানুষের অমূল্য সম্পদ। খাদ্যবস্তু গ্রহণের ইহা সদর দরজা। দাঁত ভালো থাকলে পেট ভালো থাকে ; দাঁত থেকে যে পাচক রস নিঃসৃত হয়, তা-ই পরিপাকের সাহায্য করে। মুক্তাখচিত যে দাঁত মুখের অপূর্ব শোভা, তা খারাপ হ'লে আনুষঙ্গিক অনেক উপসর্গ দেখা দেয় ; পরোক্ষভাবে, দেহাভ্যন্তরে অনেক গোলযোগের সৃষ্টি হয়। কাজেই, এহেন দাঁতের যত্ন নেওয়াই স্বাস্থ্যরক্ষার প্রাথমিক দায়িত্ব। যতই দাঁতের যত্ন করা যায়, ততই দাঁতের স্বাস্থ্য ভালো থাকে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কেমন ক'রে এই দাঁত ভালো রাখা যায় ? রোজ দু'বার দিনে ও রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর ভালোভাবে ব্রাশ বা দাঁতনের সাহায্যে পরিষ্কার জলে দাঁত ধোয়া ও মাজা উচিত। যদি ব্রাশ ব্যবহার করতে হয়, তবে কেমন ক'রে ব্রাশ দিয়ে দাঁত মাজতে হবে ? উপর থেকে নীচে ব্রাশ চালনা করা উচিত। ডানদিক থেকে বাঁদিকে ব্রাশ চালালে, দাঁতের উপরিভাগে যে এ্যানামেল আছে, তা সহজেই ক্ষয়প্রাপ্ত হ'তে পারে। এ্যানামেলেই থাকে দাঁতের জীবনী-শক্তি। ভালো দাঁতের

মাজন, অথবা পেস্ট দিয়ে দাঁত মাজা উচিত। মাঝে মাঝে গরম জলে ব্রাশটি ভাল ক'রে পরিষ্কার ক'রে নিতে হয়, তা না হ'লে ব্রাশের গোড়ায় যে ময়লা জমে, তাতে দাঁতের ক্ষতি হ'তে পারে। শোয়ার আগেই এমন ক'রে মুখ ধোয়া দরকার, যাতে আহার্য-বস্তুর কোন কণা যেন দাঁতের ফাঁকে আট্‌কে না থাকে। শয়নের পূর্বে কখনই সন্দেশ অথবা বিস্কুট খাওয়া উচিত নয়। পনেরো দিন অন্তর দাঁত পরীক্ষা ক'রে দেখা উচিত। ঠাণ্ডা জল বা মিষ্টি খেয়ে যদি দাঁত সিরসির করে, বুঝতে হবে দাঁত খারাপ হয়েছে। মুখ নিয়ে নিশ্বাস নিলেও দাঁতের ক্ষতি হয়।

খাদ্য ও খাওয়ার অভ্যাস ঃ

উপযুক্ত পুষ্টিকর খাদ্যই দৈহিক বৃদ্ধি ও স্বাস্থ্যের জন্য বিশেষ প্রয়োজন। শ্রমে ও ক্লান্তিতে যে দৈহিক ক্ষতি হয়, পুষ্টিকর খাদ্য তাড়াতাড়ি সে ক্ষয় নিবারণ ক'রে দেহের পরিপুষ্টি সাধন করে।

ক্রমবর্ধমান শিশুদের জন্য শর্করা, ছানা প্রভৃতি পুষ্টিকর খাদ্য প্রয়োজন। এই কারণে শিশুদের প্রধান খাদ্য হওয়া উচিত দুধ, মাখন, ডিম, রুটি, তাজা ফল, সবুজ শাক-সব্‌জি প্রভৃতি। চর্বি-জাতীয় খাদ্য না দেওয়াই ভালো।

প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে পরিমাণমতো ছেলেদের আহার্য দেওয়া উচিত। খাওয়ার সময় বা পরে অন্য কোন খাবার দেওয়া ঠিক নয়। ছোটদের সব সময় নির্দেশ দিতে হবে, তারা যেন ধীরে ধীরে ভালো ক'রে চিবিয়ে খাওয়ার অভ্যাস করে। ছেলেদের কখনই বেশী মিষ্টি জিনিস দেওয়া উচিত নয়। নোংরা ও আ-ঢাকা খাবার, অতিশয় পাকা ফল, অথবা আত্মীয়-স্বজনের ভুক্তাবশেষ প্রভৃতি ছোটদের খেতে দেওয়া অনুচিত। পিপাসা পেলেই জল খাওয়া উচিত। খাবার-ভর্তি মুখে ঢক্‌ঢক্ ক'রে জল খাওয়া ঠিক নয়। খাওয়ার আগে ওপরে ভালো ক'রে হাত ধোয়া বিশেষ প্রয়োজন। ছেলেদের চা, কফি খাওয়ানো যুক্তিসঙ্গত নয়। খাওয়ার সময় একই গ্লাসে দু'জনের জল খাওয়া অনুচিত। ছোটদের দিয়ে খাদ্য পরিবেশন ও রন্ধন-পাত্রাদি যথাস্থানে রাখার অভ্যাস করানো উচিত।

পরিচ্ছন্ন বিদ্যালয় ও উপকরণের যোগ্য ব্যবহার ঃ

পরিবেশের প্রভাব শিশু-জীবনে বড় কম নয়। বিদ্যালয়ের যে পরিবেশ শিশুর জীবনকে প্রভাবিত করে, গড়ে-পিটে নেয়, সেই পরিবেশ পরিচ্ছন্ন, সুসজ্জিত এবং সুন্দর হওয়া উচিত। তাহ'লে বিদ্যালয়ের প্রতি শিশুর আকর্ষণ বাড়বে। সেই চেতনা থেকেই শিশুরা নিজ শ্রেণী তথা বিদ্যালয়-পরিবেশের সৌন্দর্যে গর্ব অনুভব করবে। ছেলেদের ডেস্ক-চেয়ার যাতে পরিষ্কার থাকে, সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে।

অপরিচ্ছন্ন হাতে ছেলেরা যাতে বইয়ের পাতা না উণ্টায়, শিক্ষোপকরণ ব্যবহার না করে, সেদিকেও লক্ষ্য দিতে হবে। ছেলেদের দিয়েই শ্রেণী-কক্ষ পরিষ্কার করানো উচিত। পায়খানা ও প্রস্রাবাগার পরিষ্কার রাখা ও ব্যবহার করা সম্পর্কে প্রত্যেকটি ছাত্রকে ব্যক্তিগতভাবে নির্দেশ দিতে হবে।

ডাক্তার, ধাত্রী ও দন্ত-চিকিৎসকের পরিদর্শন ঃ

শিশুদের স্বাস্থ্য-শিক্ষার সুযোগ আসে ডাক্তার, ধাত্রী এবং দন্ত-চিকিৎসকের সান্নিধ্যে। ডাক্তার, ধাত্রী এবং দন্ত-চিকিৎসকরা যে তাদের বিদ্যালয়েরই শিক্ষক বিশেষ, তাঁদের কাছ থেকে যে স্বাস্থ্য-সম্পর্কীয় অমূল্য নির্দেশ পাওয়া যাবে, শিশুদের মনে এই ধারণা জন্মে দিতে হবে।

প্রত্যেক বছরের গোড়াতে এবং শেষে ছেলেদের যে ওজন ও উচ্চতার মাপ নেওয়া হয়, তা থেকে শিশুদের মনে যে প্রেরণা জাগে, সেটাই শিশু-স্বাস্থ্য নিয়ন্ত্রণে যথেষ্ট সাহায্য করে।

নিরাপত্তার অগ্রাধিকার ঃ

আকস্মিক দুর্ঘটনা থেকে ছেলেদের দূরে রাখতে হবে। তারা যাতে সাবধানে হুঁশিয়ার হয়ে পথ চলতে শেখে, যানবাহন থেকে দূরে থাকে, ছুরি, কাঁচি, ব্লেড নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা না করে, সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। তরুণ বয়সে ছেলেরা যখন সব-কিছুই পরখ ক'রে দেখতে চায়—কেট্‌লি আগুনে বসিয়ে জল ফোটার মজা দেখে, বুনো ফল খেয়ে তার স্বাদ পরীক্ষা করতে চায়, পিছল ঢালু পথে দ্রুত নেমে বাহাদুরি নিতে চায়—সেই বয়সের ছেলেদের উল্লিখিত ক্রিয়াকলাপ থেকে কৌশলে দূরে রাখতে পারলে, অনেক দুর্ঘটনা থেকে তাদের রক্ষা করা যেতে পারে।

শরীর-চর্চা ঃ

ব্যায়াম বা শরীর-চর্চা শিশুদের দৈহিক বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন। ব্যায়াম শিক্ষার সঙ্গে যাতে স্বাস্থ্যকর জীবন-যাপনের উপযোগী একাধিক গুণাবলীর বিকাশ হয়, সেদিকেও নজর দিতে হবে। নিম্নলিখিত বিষয়গুলি হবে ব্যায়াম-শিক্ষার লক্ষ্য :—

১। ছেলেরা মিলেমিশে খেলতে শিখবে। ছেলেরা স্বাধীনভাবে নিজ নিজ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পরিচালনা করতে শিখবে, ভারসাম্য রক্ষা করতে শিখবে, গান ও নৃত্যের মাধ্যমে ছেলেদের মধ্যে ছন্দবোধ জাগ্রত হবে।

২। খেলাধূলাগুলি হবে অবাধ স্বাধীন, কিন্তু উদ্দেশ্যবিহীন নয়। সেগুলি সহজ সরল হ'লেও, তার আইন-কানুনগুলি ছেলেদের মেনে চলতে শেখাতে হবে। খেলার মধ্যে থেকে আসবে কর্মতৎপরতা, সতর্কতা, স্বাধীন কর্মক্ষমতা এবং পরিস্থিতির আহ্বানে সাড়া দেওয়ার ক্ষমতা।

৩। ব্যায়াম ও খেলা শিশুদের মধ্যে এনে দেবে আনন্দ, সহজ এবং স্বাধীন মনোভাব। শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্ষমতাকে বাড়িয়ে তোলাই ব্যায়ামের অন্যতম কাজ।

৪। সমস্ত খেলাধূলার মধ্যে বল খেলায় শিশুরা সবচেয়ে বেশী আনন্দ পায় এবং তার দ্বারা শিশুদের মানসিক ও শারীরিক যোগ্যতা বাড়ে। ঘোড়ায় চড়া, সাঁতার কাটা প্রভৃতিই শিশুদের উপযোগী ব্যায়াম।

দেহ এবং মন

সম্যক্ সুস্থতার লক্ষণ কি ?

বিকাশোন্মুখ শিশুর পক্ষে বিশুদ্ধ বায়ু, আহার, পানীয় এবং বিশ্রামের প্রয়োজন সমধিক। এর কোন একটার অভাব ঘট্‌লে শিশু-জীবনের বিকাশ ব্যাহত হ'তে পারে। শিশুর সম্যক্ স্বাস্থ্যকর জীবন ও তার বৃদ্ধির জন্য আরও একাধিক জিনিসের প্রয়োজন। এ ছাড়া, শিশু-পরিবেশের চারদিকে থাকা উচিত চলমান বিশুদ্ধ বায়ু-প্রবাহ, বিশুদ্ধ খাদ্য ও পানীয় এবং সেই বিশ্রাম-নিরত নিস্তব্ধতা, যেখানে শিশুদের গভীর সুখনিদ্রা হ'তে পারে। উপরন্তু প্রয়োজন আলো, উত্তাপ, পরিচ্ছন্নতা, খেলা, কাজ এবং আনন্দ। দেহ-মনের যে স্বাস্থ্য জীবজন্তুর পক্ষে অপ্রয়োজন, সেটাই কিন্তু শিশু-স্বাস্থ্যের পক্ষে একান্ত কাম্য।

শারীরিক স্বাস্থ্য উপভোগের জন্য ত্রিবিধ অবস্থা শিশু-জীবনের পক্ষে বাঞ্ছনীয়। যথা—সুস্থ নীরোগ দেহ, বংশগত গুণাবলীর সমাবেশ—যা পরিচর্যা ও অনুশীলনের অপেক্ষা রাখে। দ্বিতীয় প্রয়োজন বিরূপ পরিবেশের সঙ্গে সংগ্রাম করার ক্ষমতা। তৃতীয়তঃ, দৈহিক দোষ-ত্রুটি ও ব্যাধির আবিষ্কার করা এবং তার আশু চিকিৎসা ও প্রতিকারের ব্যবস্থা অবলম্বন। এই ত্রিবিধ উপায়ের ব্যবস্থা ও প্রতিকার করাটাই হচ্ছে স্বাস্থ্য-সম্মত উপায় উদ্ভাবনের ব্যবস্থা। এর অভাবে স্বাস্থ্যকর জীবন যাপন করা অসম্ভব।

স্বাস্থ্যকর জীবনের এই পথ অনভিজ্ঞ শিশুদের কাছে অজানা ব'লেই শিশুদের পরিচালনা করতে হয়, পথের নির্দেশ দিতে হয়। শিশুর আত্ম-বিশ্বাস, আত্ম-নিয়ন্ত্রণ শক্তি, বিশ্বস্ততা, পরিচ্ছন্নতা, মার্জিত রুচিবোধ—যা স্বাস্থ্যকর সুন্দর জীবনের পক্ষে একান্ত কাম্য, তা দেহ-মনের স্বাস্থ্যের উপর নির্ভর করে। এই সত্য তথ্যটি শিশুদের ভালো ক'রে বুঝিয়ে দিতে হবে।
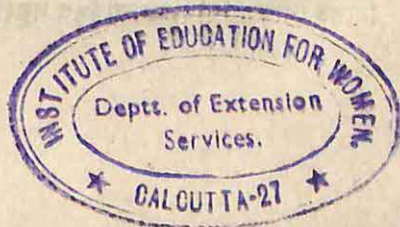
সুস্থ মনের প্রয়োজনীয়তা ঃ

দেহ-মনের সম্পর্ক যে কত নিগূঢ়, অপেক্ষাকৃত বয়স্ক শিশুদের কাছে সেই সব তত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে হবে। দেহ, মস্তিষ্ক ও মানসিক স্বাস্থ্য পরস্পর একান্তভাবে নির্ভরশীল। শুধু দৈহিক স্বাস্থ্য ভালো হ'লেই চলবে না, মনের স্বাস্থ্যও ভালো হওয়া দরকার। কারণ মনের ব্যাধি, মানসিক উৎকণ্ঠা দেহেরও ক্ষতিসাধন করে। কাজেই শারীরিক যোগ্যতা বা সামর্থ্যই স্বাস্থ্যের চূড়ান্ত নিদর্শন নয়, মানসিক, নৈতিক এবং চারিত্রিক উন্নতিও তার প্রধান লক্ষ্য। এই দেহ-মনের সমন্বয়ে যে শিশু, তার ব্যক্তিগত জীবন যেমন স্বতন্ত্র, তেমনি পৃথক। দেহ-মনের গঠনের দিক থেকে একটি শিশুর সঙ্গে অন্য শিশুর কোন মিল নেই, এমন কি তার আকাঙ্ক্ষা, ভাবাবেগ এবং প্রবণতাও পৃথক। সেই শিশুর শারীরিক বৃদ্ধি এবং বিকাশ যেমন নির্ভর করে দৈহিক পরিপুষ্টির উপর, তেমনি তার ব্যক্তিত্বের সম্যক্ স্ফুরণ ঘটে সমাজ-পরিবেশে। সুস্থ মন এই উভয়বিধ অবস্থা ও ব্যবস্থার মধ্যে সমতা রক্ষা করে। এইজন্য মানসিক সুস্থতার বিশেষ প্রয়োজন। সুস্থ মন যেখানে সবল দেহের চালক, সেখানে ব্যক্তির উপকার, সমাজের মঙ্গল সম্ভব। এই কারণে দৈহিক, মানসিক এবং নৈতিক কার্য-ক্ষমতার মধ্যে যে সমতা, সেটাই প্রকৃত সুস্থতার লক্ষণ।

এজন্য শিক্ষাবিদ্ বলেছেন যে, "Without sound mental development there can be no enduring bodily health or freedom from fatigue nor yet a healthy outlook on life."

স্বাস্থ্যকর দৃষ্টিভঙ্গীর মূল্য ঃ

দেহ-মনের সুস্থতার উপরই স্বাস্থ্যকর দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে উঠে। এই দৃষ্টিভঙ্গীর প্রকাশ-ক্ষেত্র দুটি ; যথা—ব্যবহারিক ও আদর্শগত। ব্যবহারিক দিকে আছে শিশুর স্বাস্থ্য-কর প্রচেষ্টা, শরীর পালনের নীতি, আর আদর্শগত অভ্যাসের মধ্যে আছে শিশুর নৈতিক চেতনা, শৃঙ্খলা-বোধ, মানসিক বল প্রভৃতি। যা দেহ-মনের পক্ষে ক্ষতিকর, তা অবশ্যবর্জনীয়। কাজেই, প্রত্যেকটি শিশুকেই ভালোভাবে জানতে হবে তার পরিবেশকে, বিদ্যালয়ের সঠিক নীতিগুলিকে। বিদ্যালয়-পরিবেশের চাহিদা অনুসারে শিশুরা কখনো বা অনুসরণ করবে, কখনো বা হবে চালক, নেতা। মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কে শিশুদের নিম্নলিখিত ত্রিবিধ গুণ থাকা দরকার। প্রথমতঃ, জানতে হবে, মানসিক বা দৈহিক বিকার ভাগ্যের লিখন নয়, ব্যাধি মাত্র। কাজেই, তার নির্দিষ্ট কারণ আছে এবং তা প্রতিকারসাপেক্ষও বটে। দ্বিতীয়তঃ, শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য যদি অবহেলিত হয়, তবে তার দুর্ভোগ থেকে শিশু রেহাই পাবে না। হয় সে হবে নিরেট বোকা, পিছিয়ে-পড়া শিশু নতুবা অস্বাভাবিক সমস্যা-শিশু। প্রকৃত মানসিক

বিকৃতি অবশ্য জন্মগত, তার প্রতিকার করা কঠিন। তৃতীয়তঃ, শিশুর দেহ-মন এমনভাবে গঠিত যে, উপরি-উক্ত তিনটি বিষয়ের সঠিক সমন্বয় না ঘট্‌লে, শিশুরা বাঞ্ছিত জীবন ও পরিপূর্ণ আয়ুষ্কাল লাভ করতে পারবে না। যখন স্বাস্থ্যকর দৃষ্টিভঙ্গীর মাধ্যমে শিশুর জীবনে এই সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়, তখনই তারা লাভ করে ঈপ্সিত স্বাস্থ্য।

দৈহিক গঠন ও তার কার্যকারিতা ঃ

মানুষের দেহের গঠন যেমন বিচিত্র, তেমনি অদ্ভুত। প্রত্যেকের দেহের ভিতর হাড়ের একটি কাঠামো আছে। কাঠামোর উপরটা মাংস, মেদ ইত্যাদির প্রলেপ দ্বারা চর্মের আবরণে ঢাকা। সুরূপ-কুরূপ বহিরাবরণ, ভিতর সকলেরই এক।

এই হাড়ের কাঠামোর নাম **কঙ্কাল** (Skeleton)। পূর্ণাঙ্গ দেহে সর্বসমেত **২০৬টি অস্থি** থাকে। কঙ্কালের কাজ কি? প্রথমতঃ, দেহটিকে খাড়া রেখে পেশীগুলিকে ধারণ ক'রে রাখা। দ্বিতীয়তঃ, মস্তিষ্ক, ফুস্‌ফুস্‌, হৃদ্‌যন্ত্র ইত্যাদি দেহ-যন্ত্রগুলিকে রক্ষা করা ও ঢেকে রাখা।

অস্থির চেহারা নানাপ্রকার। উরু, বাহু ইত্যাদি স্থানের অস্থি দীর্ঘ। কনুই, হাতের কব্জি ও পৃষ্ঠের অস্থি খর্ব ; করোটি, স্কন্ধাস্থি ও কটিবন্ধের অস্থি প্রশস্ত।

দীর্ঘ অস্থিগুলির দুই প্রান্তের প্রশস্তভাগে **তরুণাস্থির** (Cartilage) আচ্ছাদন আছে। হাড়ের ভিতরটা ফাঁপা, তার মধ্যে **মজ্জা** (Marrow) থাকে। হাড়ের বাইর দিক পাতলা পর্দা দিয়ে ঢাকা ; তার মধ্যে রক্তনালীর জাল বিস্তৃত হয়ে অস্থির পুষ্টিসাধন করে। খর্ব ও প্রশস্ত অস্থিগুলি ফাঁপা। তার বাইরেটা নিবিড় ও দৃঢ়, আর অভ্যন্তরটা কোমল, সচ্ছিদ্র স্পঞ্জতুল্য ; তার ভিতরে মজ্জা থাকে।

কঙ্কাল ঃ

কঙ্কাল হচ্ছে হাড়ের কাঠামো। মেরুদণ্ড বা শিরদাঁড়ায় **৩৩টি অস্থি** আছে। এই সকল অস্থির সম্মুখভাগ গোলাকার ও নিরেট ; পশ্চাতে দু'দিক থেকে শাখা বের হয়ে একটি গোলাকার রন্ধ্রপথ রচনা করেছে। করোটির তল থেকে এই সকল ছিদ্রপথে মেরুদণ্ডের ভিতর দিয়ে যে সুড়ঙ্গ গিয়েছে, মস্তিষ্ক থেকে বের হয়ে **বাতরজ্জু** বা **সুষুম্নাকাণ্ড** (Spinal cord) তার মধ্যে অবস্থিত।

মেরুদণ্ডের ৩৩টি অস্থির নাম **কশেরুকা** (Vertebra)। প্রথম ২৪টি ছাড়া কশেরুকা আছে, সেগুলির ফাঁকে ফাঁকে একটি ক'রে স্থূল তরুণাস্থির পট্টি থাকে। তার ফলে মেরুদণ্ড নোয়ানো যায়, তা না হ'লে মেরুদণ্ড আড়ষ্ট হয়ে থাকত। **প্রথম ২৪টার নীচের ৫টা কশেরুকা পরিণত বয়সে একসঙ্গে মিশে গিয়ে একটা চ্যাপ্টা হাড়ে পরিণত হয় ;** সে অস্থি ত্রিকাস্থি (Sacrum)।

তার নীচে সর্বনিম্নের ৪টা কশেরুকাও একখণ্ড সূক্ষ্মাগ্র **অনুত্রিকাস্থি** (Coccyx) ধারণ করেছে। বিবর্তনবাদীরা বলেন যে, মানুষের পূর্বপুরুষের পুচ্ছ ছিল ; সেই লেজের সাক্ষীস্বরূপ এই সরু হাড়টা আজও মানুষের দেহে বিদ্যমান।

মেরুদণ্ডের সমস্ত কশেরুকাগুলি **অস্থিবন্ধনী** (Ligament) দিয়ে মজবুত ক'রে একসঙ্গে বাঁধা থাকে।

পাঁজরা বা বক্ষ-পঞ্জর (Rib) :

পৃষ্ঠের ১২টা কশেরুকা থেকে দুদিকে ১২ জোড়া পাঁজরা বের হয়ে বক্রভাবে সামনে এসেছে। বক্ষের সম্মুখের **উরঃফলকের** (Sternum) চেহারা ছোরার মতো। কণ্ঠের নীচে থেকে পাকস্থলীর উপর পর্যন্ত নেমে এসেছে।

বক্ষঃপঞ্জর (Thorax) উপরিভাগে সামনে দুটি **কণ্ঠাস্থি** ও পিছনে দুটি **অংসফলক** (Scapula) আছে। **উপরের বাহুর** লম্বা অস্থিটির নাম **প্রগণ্ডাস্থি** (Humerus), **নীচের বাহুর** দুটি লম্বা অস্থির নাম **প্রকোষ্ঠাস্থি** (Radius and Ulna)।

প্রকোষ্ঠের নীচে থেকে আঙুলের প্রান্ত পর্যন্ত প্রত্যেক হস্তে ২০টা ক'রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্থি থাকে। মণিবন্ধে ৮, করতলে ৫, চার আঙুলে ৩টি ক'রে ও অঙ্গুষ্ঠে ২ খানি হাড় আছে। তলপেটে কয়েকটি অস্থি মিলে গামলার আকার ধারণ করেছে ; তাকে **কটিবন্ধাস্থি** (Pelvic bone) বলা হয়।

কটিবন্ধাস্থি থেকে দুদিকে দুটি **উরুর অস্থি** বা **উর্বস্থি** (Femur) বের হয়েছে। সে দুটি দেহের মধ্যে সবচেয়ে দীর্ঘ অস্থি। উরুর অস্থির নীচে **জঙ্ঘায়** দুটি অস্থি আছে। হাঁটুতে একটা **ত্রিকোণ পট্ট জঙ্ঘাস্থি** (Knee cap) আছে।

প্রত্যেক **পদে** আবার ২৬টা ক'রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্থি আছে। তা ছাড়া আছে পায়ের পাতায় ১২টা, চার আঙুলে ১২টা এবং অঙ্গুষ্ঠে ২টা।

মস্তক :

মস্তকের অস্থিগুলি সম্মিলিত হয়ে যে বৃহৎ গোলাকার অস্থির সৃষ্টি হয়েছে, তার নাম **করোটি** (Skull)। করোটির মধ্যে মস্তিষ্ক রক্ষিত থাকে। করোটির নিম্নভাগে **চোয়ালের** অস্থিগুলি অবস্থিত।

পেশী :

নরদেহে বহু **পেশী** (Muscle) আছে ; সেগুলি অস্থির উপরে অথবা অস্থি থেকে অস্থিতে সংলগ্ন থাকে। পেশী দ্বারা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চালনা করা যায়। পেশী দুই প্রকার ; যথা—প্রথম **আয়ত্ত** (Voluntary) অর্থাৎ ইচ্ছামত যাকে চালনা করা যায় ; দ্বিতীয় **অনায়ত্ত** (Involuntary) অর্থাৎ ইচ্ছামত যাকে চালনা করা যায় না।

(১) **আয়ত্ত** (*Voluntary*) অর্থাৎ ইচ্ছামতো যাকে চালনা করা যায়—দেহের অধিকাংশ পেশীই এই রকমের। মাংস বলতে সাধারণ লোকে এই পেশীকেই বোঝে। মস্তক, স্কন্ধ, বাহু, পদাদি অঙ্গে এইরূপ পেশী আছে। মস্তিষ্ক থেকে নার্ভের শাখা-প্রশাখা এসে পেশীর মধ্যে প্রবেশ করেছে বা পেশীর সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে। এই নার্ভের পথে ইচ্ছাশক্তি সঞ্চালিত ক'রে অঙ্গাদি নাড়াচাড়া করা যায়। পেশীর মাঝখানটা মোটা। দুই প্রান্ত আঁশালো শুভ্র বর্ণের মসৃণ রজ্জুবৎ (Tendons) গঠিত হয়ে অস্থির সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে।

পেশীর সংকোচন ও প্রসারণ করবার শক্তি আছে। ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে অথবা বৈদ্যুতিক শক্ দ্বারাও পেশী সংকোচন করানো যায়।

(২) **অনায়ত্ত** (Involuntary) অর্থাৎ যা ইচ্ছামতো চালনা করা যায় না। পাকস্থলী, অন্ত্র ও দেহাভ্যন্তরের অন্যান্য যন্ত্রাদি এবং রক্তনালীগুলি এইরূপ পেশী দ্বারা নির্মিত। এই পেশীসমূহ ইচ্ছামতো নিয়ন্ত্রিত করা যায় না। যতদিন প্রাণী জীবিত থাকে, ততদিন কি নিদ্রায়, কি জাগরণে এই সকল পেশী কাজ ক'রে যায়। তাদের নড়াচড়া, ক্রিয়াকলাপ প্রাণীরা অনুভব করতে পারে না।

পেশীগুলি কাজ করার শক্তি কোথায় পায়? ইঞ্জিন চালাতে যেমন জল ও কয়লা প্রয়োজন, দেহের জন্য তেমনি খাদ্য ও পানীয় দরকার। দেহ-যন্ত্রকে ক্রিয়াশীল রাখার জন্য দহন-ক্রিয়ার প্রয়োজন। দেহের সর্বত্র রক্ত প্রবাহিত হয়ে খাদ্য যোগান দেয় ও তার পুষ্টিসাধন করে।

সক্রিয় পেশীর ভিতরকার সঞ্চরণশীল রক্তকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে—

(ক) **ধমনী** (Artery) যে রক্ত পেশীতে যোগান দিচ্ছে, তার ভিতর আছে—শর্করা, স্নেহপদার্থ এবং অক্সিজেন-বহ বিশুদ্ধ বায়ু। পেশী যতই কাজ করছে, ততই এই সকল বস্তু অক্সিজেনের দ্বারা দগ্ধ হচ্ছে। সেই সঙ্গে কার্বন ডাই-অক্সাইড উৎসৃষ্ট হচ্ছে। সেইজন্য—

(খ) **শিরা** (Vein) দিয়ে যে রক্ত পেশী থেকে নিষ্ক্রান্ত হচ্ছে, তাতে শর্করা ও অক্সিজেন কম আছে; তা ছাড়া আছে কার্বলিক অ্যাসিড-পূর্ণ অশুদ্ধ বায়ু। এইরূপে শরীরে তাপ ও শক্তির সঞ্চার হয়।

বক্ষঃপঞ্জরের অভ্যন্তরে দেহ-যন্ত্রাদি রক্ষিত আছে। ধড়ের মাঝখান দিয়ে একটা পাতলা প্রাচীর আছে; তার নাম **মধ্যচ্ছদা** (Diaphragm)। মধ্যচ্ছদা ধড়ের মধ্যভাগকে দু'ভাগে বিভক্ত করেছে—তার উপরের অংশ বক্ষ এবং নীচের অংশ উদর। মধ্যচ্ছদার ভিতর দিয়ে নানা রন্ধ্রপথে **রক্তনালী, পৌষ্টিক নালী** প্রভৃতি

নালীসকল উপর থেকে নীচে নেমে গেছে। বক্ষের ভিতর হৃদ্‌যন্ত্র ও শ্বাসযন্ত্র বা ফুস্‌ফুস্ থাকে।

উদরের ভিতর থাকে **পাকস্থলী** (Stomach), মহাপ্রাচীরের ঠিক নীচে বাম দিকে ; **যকৃৎ** (Liver) থাকে উদরের উপরিভাগে দক্ষিণ দিকের পাঁজরার নীচে ঢাকা। **প্লীহার** (Spleen) অবস্থান বাঁদিকে উপরের পাঁজরের নীচে ও পাকস্থলীর বামে ; **প্যান্‌ক্রিয়স-যন্ত্র** থাকে পাকস্থলীর পিছনে মেরুদণ্ডের কাছে ; আর **ক্ষুদ্রান্ত্র** ও **বৃহদন্ত্রের** দীর্ঘনালী কয়েকবার পাক দিয়ে ও ভাঁজ হয়ে উদর-গহ্বরের অধিকাংশ স্থান অধিকার ক'রে থাকে। **মূত্রযন্ত্র** (Kidney) অন্ত্রের পিছনে উদরের নিম্নদিকে দু'ধারে দুটি ; **মূত্রাশয়** (Bladder) কুক্ষির সম্মুখভাগে উদরের নিম্নাংশে অবস্থিত রয়েছে।

ত্বক্ (Skin) :

দেহের বাইরে সর্বত্র চর্মের বা ত্বকের আবরণ আছে। চর্মের কাজ কি ?

(১) বাইরের যা-কিছু অনুভূতি আমরা ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে লাভ করি। চর্ম হচ্ছে সেই সব ইন্দ্রিয়ের মধ্যে একটি প্রধান ইন্দ্রিয়। চর্মের মধ্যে নার্ভতন্তুর অজস্র প্রান্তসকল প্রবিষ্ট আছে ; সেগুলি তাপ, চাপ, স্পর্শ ও বেদনার অনুভূতি চর্ম থেকে মস্তিষ্কে পৌঁছে দেয়। এইভাবে মস্তিষ্কে তাপ, চাপ, স্পর্শ ও বেদনার জ্ঞান জন্মে।

(২) শরীরের তাপ সমানভাবে রক্ষা করতে চর্মই প্রধান সহায়। সমস্ত দেহে চর্মের নীচে **স্বেদ-গ্রন্থি** (Sweat Glands) আছে ; কর ও পদতলেও সমধিক গ্রন্থি আছে। সমস্ত দেহে স্বেদ-গ্রন্থির সংখ্যা প্রায় ২০,০০,০০০। গ্রন্থি থেকে ঘর্ম নিঃসৃত হয়ে চর্মের উপরে আসে। ঘর্মের উপাদানের প্রায় সমস্তটাই জল ; সামান্য পরিমাণ লাবণিক পদার্থ তাতে দ্রবীভূত থাকে। ঘর্ম নিঃসৃত হওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে দেহ শীতল হ'তে থাকে।

(৩) শারীরিক ক্রিয়ার আনুষঙ্গিক নানারূপ বর্জনীয় পদার্থ (Waste matter) দেহে সকল সময় তৈরি হচ্ছে। নিশ্বাসের সঙ্গে কার্বন ডাই-অক্সাইড উৎসৃষ্টরূপে বের হয়ে যায়। মল-মূত্র শারীরিক ক্রিয়ার উৎসৃষ্ট। তেমনি স্বেদ রক্তস্রোতের উৎসৃষ্ট। রক্তস্রোত থেকে স্বেদ বের হয়ে গেলে, রক্ত বিশুদ্ধ হয়।

স্নায়ুতন্ত্র বা নার্ভতন্ত্র (Nervous System) :

স্নায়ুতন্ত্র সমস্ত দেহানুভূতির আধার। দেহের যেখানে যে কার্য-ই হোক না কেন, সবই নার্ভতন্ত্র কর্তৃক অনুষ্ঠিত ও পরিচালিত হয়। স্নায়ুতন্ত্র বুঝতে হ'লে নার্ভ-প্রক্রিয়া সম্পর্কে জ্ঞান থাকা দরকার।

নার্ভ বা স্নায়ু (Nerve) ঃ

আমাদের দেহস্থ নার্ভগুলির গঠন সূত্রবৎ। এদের বর্ণ পীতাভ। নার্ভকোষ থেকে এদের উৎপত্তি। নার্ভকোষগুলি আকারে ও আয়তনে পরস্পর থেকে পৃথক। এদের প্রত্যেকের মধ্যে আছে '**প্রোটোপ্লাজ্ম**' ও '**নিউক্লিয়স্**'। প্রত্যেক কোষেরই একটি ক'রে দীর্ঘপ্রায় শাখাহীন রজ্জু বা ডেনড্রন (Dendron) থাকে। ডেনড্রনের সংখ্যা কোষে একাধিক হ'তে পারে। অ্যাক্সনের (Axon) চারদিকে ক্রমে একটি আবরণ জন্মায় ; তাকে বলে **নার্ভসূত্র** (Nerve fibril)। এরা কোষ থেকে বের হয়ে সরাসরি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে না গিয়ে অন্য কোষের ডেনড্রনের সাথে মিলিত হয়। নার্ভগুলি অবশ্য নার্ভসূত্রের সমষ্টি অর্থাৎ স্নায়ুগুচ্ছ। অনেক সময় একেই নার্ভরজ্জু বলা হয়। কোথাও কোথাও এই নার্ভরজ্জুর উৎপত্তি-স্থান ঈষৎ স্ফীতাকার ; সেই স্ফীত স্থানের নাম স্নায়ুগ্রন্থি (Ganglion)।

নার্ভের প্রকারভেদ (Types of Nerves) ঃ

দৈহিক উত্তেজনা সঞ্চালন করাই নার্ভের ধর্ম। কার্য হিসাবে নার্ভকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা—(১) যে সকল নার্ভ শরীরের বিভিন্ন স্থান থেকে সুষুম্নাকাণ্ডের পশ্চাদ্ভাগে অথবা মস্তিষ্কের দিকে উত্তেজনা চালনা করে, তাদের বলা হয় **অন্তর্বাহী** (Afferent) বা **সংজ্ঞাবাহী** (Sensory) নার্ভ। সাধারণতঃ এদের সাহায্যে কোন বস্তুর অস্তিত্ব ও স্বরূপ আমরা বুঝতে পারি। (২) যে সকল নার্ভ সুষুম্নাকাণ্ডের সম্মুখভাগ কিংবা মস্তিষ্ক থেকে বের হয়ে দেহের সর্বস্থানের পেশী সঞ্চালন করায় কিংবা গ্রন্থির রস নিঃসরণে সাহায্য করে, তাদের বলে **বহির্বাহী** (Efferent) বা **চালক** (Motor) নার্ভ। এই উভয় প্রকার নার্ভই একই স্নায়ুকাণ্ডের মধ্যে অবস্থিত। তাদের গঠনের মধ্যেও কোন ভেদ নেই।

নার্ভতন্ত্র বা স্নায়ুতন্ত্র (Nervous System) ঃ

মস্তিষ্ক, সুষুম্নাকাণ্ড ও অসংখ্য নার্ভ নিয়েই স্নায়ুতন্ত্র গঠিত। মস্তিষ্ক থেকে ১২ জোড়া বা ২৪টি মস্তিষ্ক স্নায়ু (Cranial Nerves) বের হয়েছে। এরা গিয়ে পৌছেছে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, দাঁত, মুখমণ্ডল, ফুস্‌ফুস্, হৃৎপিণ্ড, মধ্যচ্ছদা এবং পাকস্থলীতে। এর মধ্যে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা ও জিহ্বার নার্ভগুলি সুষুম্নাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে না গিয়ে সরাসরি ঐ সব ইন্দ্রিয়গুলিতে গমন করে। সুষুম্নাকাণ্ডের উভয় পার্শ্ব থেকে ৩১ জোড়া বা ৬২ খানা সুষুম্না স্নায়ু (Spinal Nerves) নির্গত হয়ে দেহের বিভিন্ন স্থানে গিয়েছে। মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ডের সংপৃক্ত স্নায়ুকে বলে স্নায়ুমালা

(Cerebro Spinal Nervous System)। বিভিন্ন প্রকার অনুভূতি ও দেহ সঞ্চালন এই সকল স্নায়ুমালার সাহায্যে সংঘটিত হয়। আবার সুষুম্নাকাণ্ড হ'তে নির্গত সুষুম্না স্নায়ুগুলি কিছুদূর অগ্রসর হবার পর তাদের দেহ থেকে অনেক স্নায়ুর উৎপত্তি হয় এবং তারা সমব্যথী স্নায়ুমালার (Autonomic Nervous System) অন্তর্গত। এই জাতীয় স্নায়ুগুলি মস্তিষ্কের কর্তৃত্ব মেনে চলে না এবং আপনাদের আপনারাই চালনা করে ব'লে এদের বলে স্বাধীন। আকস্মিক বা অপ্রত্যাশিত উত্তেজনার বিরুদ্ধে দ্রুত ও চরমভাবে কার্য করাই সমব্যথী স্নায়ুতন্ত্রের প্রধান উদ্দেশ্য। অবশ্য, আধুনিক পরীক্ষায় স্থির হয়েছে যে, মস্তিষ্কের কিছু প্রভাব এই স্নায়ুতন্ত্রের উপর বর্তমান।

প্রতিক্ষিপ্ত ক্রিয়া (Reflex action):

নার্ভতন্ত্রের মূলে যেমন রয়েছে নার্ভকোষ, তেমনি আমাদের দেহ-চাঞ্চল্যের মূলে আছে প্রতিক্ষিপ্ত ক্রিয়া। প্রতিক্ষিপ্ত ক্রিয়ার অন্তর্বাহী উত্তেজনা বহির্বাহী উত্তেজনায় পরিবর্তিত হয়। এর জন্য সাধারণতঃ (ক) একটি গ্রাহক ইন্দ্রিয়, (খ) তৎসংশ্লিষ্ট একটি অন্তর্বাহী স্নায়ু, (গ) কেন্দ্র-সংলগ্ন একটি বহির্বাহী স্নায়ু ও (ঘ) চাঞ্চল্য উৎপাদনের জন্য পেশী বা গ্রন্থি আবশ্যক। সমস্ত প্রতিক্ষিপ্ত ক্রিয়ার একটি বিশেষ গুণ হ'ল এই যে, উত্তেজনায় সাড়া মস্তিষ্ক ব্যতিরেকে অন্য কোন কেন্দ্র হ'তে পরিচালিত হ'তে পারে।

রান্নাঘরে একখানা লোহার হাতা অত্যন্ত গরম অবস্থায় রয়েছে। তুমি তা না জেনে ওতে হাত দিলে। হাতের কতকগুলি নার্ভ তৎক্ষণাৎ সুষুম্নাকাণ্ডে সংবাদ পাঠাল যে, হাতাখানা অত্যন্ত গরম। সেখান থেকে অপর কতকগুলি নার্ভের দ্বারা হাতের পেশীর প্রতি আদেশ এল—হাত সংকুচিত ক'রে এক্ষুনি সরিয়ে নাও। সঙ্গে সঙ্গে সেই আদেশমতো কাজও হ'ল। এইরূপ সংবাদ-প্রেরণ ও আদেশ-বহন মুহূর্ত মধ্যেই ঘটে থাকে; এটা অবশ্য মস্তিষ্কের অনুভূতি-সাপেক্ষ নয়।

মনে কর রাস্তায় চলেছ। সম্মুখে রাস্তার উপর একটা রজ্জু পড়ে আছে। অস্পষ্ট আলোকে তোমার মনে হ'ল ওটা সাপ; তৎক্ষণাৎ তুমি দু'পা পিছিয়ে গেলে। সম্মুখে সাপ দেখে চক্ষুর নার্ভ মস্তিষ্কে সংবাদ পাঠাল এবং সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্ক থেকে নার্ভের দ্বারা পায়ের পেশীকেও পিছিয়ে নেওয়ার আদেশ হ'ল। কিন্তু মস্তিষ্কে খবর পৌছলে যখন জানা গেল, ওটা সাপ নয়—দড়ি মাত্র, তখন পুনরায় চলবার আদেশ হ'ল এবং তোমার পা আবার চলতে আরম্ভ করল। এক্ষেত্রে অবশ্য মস্তিষ্ক কাজ করছে।

নার্ভতন্ত্রের কার্য (Function of Nervous System) :

আমাদের দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ, আস্বাদন, বেদনাবোধ, উষ্ণতাবোধ, স্পর্শানুভূতি, ভালো-মন্দের বিবেচনা, সুখ-দুঃখের অনুভূতি, দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে ইচ্ছানুসারে অথবা কখনো সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারেই চালনা করা ইত্যাদি কার্যসমূহ নার্ভতন্ত্রের সাহায্যে সংঘটিত হয়। নার্ভগুলি টেলিগ্রাফের তারের মতো দেহের সমস্ত অংশের কোথায় কি হচ্ছে, সেই সংবাদ মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ডে বহন ক'রে আনে এবং সেখান থেকে আজ্ঞা বহন ক'রে দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে নিয়ন্ত্রিত করে।

সারাংশ—মস্তিষ্ক মনন-শক্তির কেন্দ্র। এই স্থান থেকে দেহের বিভিন্ন অংশে আদেশ প্রেরিত হয়। তদনুসারে আমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি সঞ্চালিত হ'য়ে থাকে। কতকগুলি নার্ভের দ্বারা শরীরের নানা স্থানের সংবাদ সুষুম্নাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে না গিয়ে স্বতন্ত্র নার্ভ দিয়ে মস্তিষ্কে পৌছায়। মস্তিষ্কের নিম্নদেশ থেকে এক গোছা নার্ভ মেরুদণ্ডের নালীর মধ্য দিয়ে কাণ্ডের দিকে গিয়েছে ; তার নাম সুষুম্নাকাণ্ড। সুষুম্ন-কাণ্ড থেকে শাখা-প্রশাখা বের হয়ে দেহমধ্যে বিস্তৃত হয়েছে।

জ্ঞানেন্দ্রিয় (Sense-organs) :

চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্—এই পাঁচটি ইন্দ্রিয়পথ দিয়ে বহির্জগতের বস্তুর রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ-বিষয়ক সাড়া নার্ভের সাহায্যে আমাদের মস্তিষ্কে উপস্থিত হয় এবং সেখানে সেই বস্তু সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান জন্মে থাকে। এখন ইন্দ্রিয়গুলি সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক্।

চক্ষু (Eye—Organ of sight) :

আমাদের মুখমণ্ডলের নাসিকার দুই পার্শ্বে অস্থি-কোটরের (Socket) মধ্যে দুটি অক্ষিগোলক (Eye-ball) আছে। প্রত্যেক অক্ষিগোলককে রক্ষা করবার জন্য এক জোড়া ক'রে চোখের পাতা (Eye-lids) রয়েছে। অক্ষিগোলকের গঠন-প্রণালী একটু জটিল। এর তিনটি স্তর আছে। প্রথমে একটি সাদা রঙের ঘন অস্বচ্ছ ও শক্ত পর্দা (Sclerotic) দেখা যায়। সেটা গোলকের প্রায় $\frac{4}{5}$ ভাগ অধিকার ক'রে আছে। অবশিষ্ট $\frac{1}{5}$ অংশ অর্থাৎ যেটুকু আমরা দেখতে পাই ও যেটুকু শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির দ্বারা আবৃত ও স্বচ্ছ, তাকে অচ্ছোদপটল (Cornea) বলে। কঠিন স্তরের ভিতরের দিকে আর একটি রঞ্জিত স্তর (Choroid) দেখা যায়। অচ্ছোদপটলের আবরণের পিছনে একটি গোলাকার কালো পেশী-নির্মিত পর্দা আছে ; একে কনীনিকা (Iris) বলে। কনীনিকার মাঝখানের ছিদ্রকে

তারারন্ধ্র বা পিউপিল (Pupil) বলে। দুই প্রস্থ অনৈচ্ছিক পেশী কর্তৃক এই কনীনিকা পর্দাটি সংকুচিত ও প্রসারিত হ'তে পারে এবং এর সংকোচন ও প্রসারণে তারারন্ধ্রটি ছোট ও বড় হয়। সুতরাং আলোকের পরিমাণ নিয়মিত রাখাই কনীনিকার কাজ। তারারন্ধ্রের পশ্চাতে আছে একখানি স্বচ্ছ লেন্স (Lens) বা অক্ষি-মুকুর। লেন্সের সম্মুখে ও পশ্চাতে আছে একপ্রকার স্বচ্ছ তরল পদার্থ (Aqueous humour & Vitreous humour), সর্বপশ্চাতে আর একখানি কালো পর্দা রয়েছে। তার নাম অক্ষিপট (Retina)। এই অক্ষিপটের সঙ্গে চক্ষুনার্ভ (Optic nerve) সংযুক্ত থাকে।

চোখের পাতার গোড়ায় অশ্রুগ্রন্থি আছে। এ থেকে অশ্রু বের হয়ে অক্ষিগোলককে সিক্ত ক'রে রাখে এবং চোখে ময়লা পড়লে তা ধুয়ে ফেলে। শোক, দুঃখ প্রভৃতি মানসিক উত্তেজনা ও আবেগে এই অশ্রু-প্রবাহ অধিক পরিমাণে নির্গত হয়।

যখন আমরা কোন বস্তুর প্রতি তাকাই, তখন সেই বস্তু হ'তে প্রতিফলিত আলোকরশ্মি পিউপিলের ভিতর দিয়ে লেন্সের উপর পড়ে এবং ফটোগ্রাফ যন্ত্রের মতো অক্ষিপটের উপর বস্তুটির প্রতিবিম্ব সৃষ্টি ক'রে থাকে। নার্ভের দ্বারা সেই সংবাদ মস্তিষ্কে উপস্থিত হয়। তখন সেই বস্তুটির আকৃতি, আয়তন ও বর্ণ সম্বন্ধে আমাদের অনুভূতি জন্মে। চক্ষু আমাদের দর্শনেন্দ্রিয়।

নাসিকা (Nose—Organ of smell) ঃ

নাসিকা একটি ত্রিকোণ-বিশিষ্ট গহ্বর। এর দু'টি ভাগ আছে—(১) বহির্নাসিকা (External nose)। ইহা মুখমণ্ডলের মধ্যস্থল হ'তে বিস্তৃত। (২) অন্তর্নাসিকা (Nasal cavity)—ইহা একটি প্রাচীর (Septum) দ্বারা দুটি নাসিকা-প্রকোষ্ঠে (Nasal chambers) বিভক্ত। নাসিকার সম্মুখভাগে দুটি ও পশ্চাদ্ভাগে (মুখবিবরে) দুটি দ্বার আছে। পশ্চাদ্দিকে যেখানে গলবিলে (Pharynx) শ্বাসনালী ও খাদ্যনালী আরম্ভ হয়েছে, সেখানে নাসাপথ শেষ হয়েছে। নাসিকার অগ্রভাগ কোমল তরুণাস্থি দ্বারা গঠিত। নাসিকার সম্মুখাংশের প্রাচীর-গাত্র লোমাবৃত ও অভ্যন্তরভাগ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী (Mucous membrane) দ্বারা আবৃত। নাসাপথের ঐ ঝিল্লীতে অসংখ্য রক্তবহ শিরা ও ধমনী থাকে ; এই ঝিল্লীর কাজ আঁটালো শ্লেষ্মা তৈরী করা। নাসিকার অভ্যন্তরভাগে ঘ্রাণ-স্নায়ুর অসংখ্য ক্ষুদ্র শাখা এসে বিস্তৃত হয়েছে। যখন কোন গন্ধ-বিশিষ্ট দ্রব্য থেকে নিঃসৃত গন্ধ-কণা বাতাসের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে নাসারন্ধ্রে প্রবেশ ক'রে ঐ সকল স্নায়ুতে

আঘাত করে, তখন মস্তিষ্কে তার গন্ধের অনুভূতি জন্মে। সুতরাং নাসিকা আমাদের ঘ্রাণেন্দ্রিয়। ইহা শুধু ঘ্রাণেন্দ্রিয় নহে ; ইহা আমাদের নিশ্বাস-প্রশ্বাসের পথ।

কর্ণ (Ear—Organ of hearing) ঃ

কর্ণ আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয়। মস্তকের দুই পার্শ্বে দুটি কর্ণ আছে। এই যন্ত্রটির বর্ণনার সুবিধার জন্য একে তিন ভাগে ভাগ করা হয় ঃ—বহিঃকর্ণ (External ear), মধ্যকর্ণ (Middle ear) ও আভ্যন্তরীণ কর্ণ (Internal ear)।

(ক) **বহিঃকর্ণ**—কর্ণের যে অংশ হাত দিয়ে ধরতে পারা যায়, তাকে বহিঃকর্ণ বলে। ইহা কোমল তরুণাস্থি দ্বারা গঠিত। শব্দের স্বরূপ বাতাসের তরঙ্গমাত্র। বাতাসের শব্দগুলিকে ধ'রে কর্ণবিবরে প্রেরণ করবার জন্য কর্ণের বহিরাংশ নানাভাবে বক্র ও কুঞ্চিত রয়েছে। বহিঃকর্ণের মাঝখানে একটি গর্ত বা কর্ণরন্ধ্র আছে। এই গর্তের শেষপ্রান্তে একটি পর্দা আছে ; একে কর্ণপটহ (Tympanic membrane) বলে। বহিঃকর্ণ বহির্জগৎ থেকে শব্দ-তরঙ্গ গ্রহণ ক'রে কর্ণরন্ধ্রের মধ্য দিয়ে কর্ণপটহ্-পর্দায় আঘাত করতে থাকে। এই বহিঃকর্ণ অংশটায় কতকগুলি লোম ও একপ্রকার আঁটালো পদার্থ আছে ; উহা ধূলা ও পোকামাকড় প্রভৃতিকে কর্ণবিবরে প্রবেশ করতে দেয় না।

(খ) **মধ্যকর্ণ**—কর্ণপটহ থেকে মধ্যকর্ণ আরম্ভ হয়েছে। ইহা একটি অসমান গহ্বর (Tympanic cavity)। ইহা সচরাচর বায়ুপূর্ণ থাকে এবং এই বায়ু একটি নলের মধ্য দিয়ে গলবিল (Pharynx) হ'তে আসে। মধ্যকর্ণ বা টিম্প্যানিক গহ্বরের মধ্যে পরস্পর-সংলগ্ন তিনখানি অস্থি আছে—Malleus, Incus এবং Stapes। এদের মধ্যে প্রথম অস্থিখানি (Malleus) কর্ণপটহের সঙ্গে এবং শেষ অস্থিখানি (Stapes) আভ্যন্তরীণ কর্ণের একস্থানের পর্দার সঙ্গে সংযুক্ত থাকে। এই অস্থিত্রয় কর্ণপটহ হ'তে শব্দ-তরঙ্গ এনে আভ্যন্তরীণ কর্ণের দ্বারদেশে পৌঁছিয়ে দেয়। এই দ্বারদেশের ছিদ্র কিঞ্চিৎ গোল ব'লে একে গোল ছিদ্র (Fenestra ovalis) বলে।

(গ) **আভ্যন্তরীণ কর্ণ**—আভ্যন্তরীণ কর্ণের মধ্যেই প্রকৃত শ্রবণ-যন্ত্র অবস্থিত ; আর এর মধ্যেই শ্রবণ-স্নায়ু (Auditory nerve) এসে বিস্তৃত হয়েছে। আভ্যন্তরীণ কর্ণ একটি গহ্বর-বিশেষ এবং এর গঠন-প্রণালী চক্রাকার ও জটিল ; সেজন্য একে চক্রাকার-প্রণালী (Labyrinth) নামে অভিহিত করা হয়। এই চক্রাকার-যন্ত্র দু'ভাগে বিভক্ত—অস্থিময় ও ঝিল্লীময় প্রণালী। অস্থিময়-প্রণালীর মধ্যে ঝিল্লীময়-প্রণালী সন্নিবিষ্ট ; এই দু'টি চক্রাকার প্রণালীর রসকে বহিঃরস (Perilymph) বলে। অস্থিময় চক্রাকার প্রণালী তিনটি অংশে বিভক্ত—ভেষ্টিবুল (Vestibule), কর্ণকম্বু

(Cochlea) ও অর্ধ বৃত্তাকার নলসমূহ (Semi-circular canals)। মধ্যকর্ণের অস্থিত্রয়ের সাহায্যে আনীত শব্দ-তরঙ্গ আভ্যন্তরীণ কর্ণের চক্রাকার প্রণালীতে ধাক্কা দিয়ে তথাকার তরল পদার্থে তরঙ্গ উৎপন্ন করে। ঐ তরল পদার্থের মধ্যে বিভিন্ন স্বরের দ্বারা বিভিন্ন আকারের তরঙ্গ উৎপন্ন হ'লে, চক্রাকার প্রণালী-স্থিত (Labyrinth) শ্রবণ-স্নায়ুর চাবিতে ধাক্কা দেয় ; সেই ধাক্কাগুলি শ্রবণ-স্নায়ুর সাহায্যে মস্তিষ্কে শব্দরূপে গৃহীত হয়।

কর্ণের বহিরাংশ বাতাসের শব্দ-তরঙ্গকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কর্ণবিবরে চালিত করে। এই শব্দ-তরঙ্গ কর্ণপটহকে আঘাত ক'রে তাকে কম্পিত করে ; সেই কম্পন মধ্যকর্ণের ক্ষুদ্র অস্থিত্রয় দ্বারা নীত হয়ে, আভ্যন্তরীণ কর্ণের ভিতর অস্থিময় ও ঝিল্লীময় প্রণালী অতিক্রম ক'রে, শ্রবণ-স্নায়ুতে আঘাত করে ; সেই শ্রবণ-স্নায়ু নানাপ্রকার শব্দ-তরঙ্গকে মস্তিষ্কে বহন ক'রে নিয়ে যায় এবং এরূপে শব্দের অনুভূতি হয়। এই শব্দ-তরঙ্গের পথিমধ্যস্থ কোন অংশ বিকৃত হ'লে, শব্দ-জ্ঞান লুপ্ত হ'তে পারে।

জিহ্বা (Tongue—Organ of taste) :

জিহ্বা গলদেশ থেকে আরম্ভ ক'রে দন্ত পর্যন্ত প্রসারিত। ইহা পেশীময় ও শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী দ্বারা আবৃত। উপরিভাগে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুটিকা বা স্বাদ-কোরক (Taste bud) আছে। মস্তিষ্ক হ'তে কতকগুলি নার্ভ এসে ঐ সকল গুটিকার মধ্যে শেষ হয়েছে। বিভিন্ন গুটিকার সাহায্যে আমরা বিভিন্ন রসের স্বাদ পেয়ে থাকি। জিহ্বার কিনারায় গুটিকা দ্বারা আমাদের লবণ ও মিষ্ট স্বাদের অনুভূতি এবং পশ্চাতে গুটিকা দ্বারা তিক্ত স্বাদের অনুভূতি হয়। যদিও ইহা স্বাদনেন্দ্রিয়ের প্রধান স্থান, তথাপি পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়েছে, মুখবিবরের অন্যান্য স্থানেও অর্থাৎ তালু (Soft plate), আলজিভ (Uvula), তালুগ্রন্থি (Tonsil) ইত্যাদিও স্বাদ গ্রহণক্ষম। কারণ, স্বাদনেন্দ্রিয়-স্নায়ুর শাখা-প্রশাখাগুলি এই সকল স্থানে বিস্তৃত হয়েছে। দ্রব না হ'লে কোন দ্রব্যের আস্বাদ পাওয়া যায় না। যে দ্রব্য গলে না তা স্বাদহীন। জিহ্বা দ্বারা চর্বণ-ক্রিয়ার ও কতকগুলি শব্দ উচ্চারণের সাহায্য হয়।

ত্বক্ (Skin—Organ of touch) :

ত্বক্ বা চর্ম আমাদের সমস্ত দেহকে আচ্ছাদিত ক'রে আছে। ইহা আমাদের দেহের বহিরাবরণ। সাধারণতঃ এর তিনটি স্তর আছে।

(ক) **উপচর্ম (Epidermis)**—ইহা ত্বকের বাইরের স্তর ও ঘন আচ্ছাদক তন্তু দিয়ে গঠিত। এতে অসংখ্য ঘর্মকূপ ও লোমকূপ আছে; কিন্তু কোন শিরা বা ধমনী নেই। ঘর্ষণের ফলে এই স্তর নিত্যই উঠছে এবং দ্রুত নূতন হচ্ছে। এই স্তরেই কড়া (Corn) ও ফোস্কা (Blister) পড়ে ও ঘামাচি হয়। রক্তবহ-নালী নাই ব'লে ফোস্কা বা কড়া ছিঁড়ে ফেললেও রক্ত বেরোয় না। এই স্তরে নার্ভও নেই, সেজন্য ছুঁচ ফুটালেও লাগে না।

(খ) **বর্ণ কোষ ত্বক্ (Papillary or Colour layer)**—ইহাই আসল চর্মের উপরের স্তর। এই স্তরে রজন কোষ (Pigment cell) অবস্থিত এবং এই রজন কোষগুলির মধ্যে একপ্রকার রঙ থাকে। দেহের বর্ণ এই রঙের উপর নির্ভর করে।

(গ) **চর্ম (Dermis)**—ইহা ত্বকের ভিতরাকর স্তর এবং স্থিতিস্থাপক আচ্ছাদক তন্তু দিয়ে গঠিত। এই স্তরে বহুসংখ্যক নার্ভ, শিরা ও ধমনী, মেদ-গ্রন্থি (Sebaceous glands), ঘর্ম-গ্রন্থি (Sweatglands), কেশের মূল প্রভৃতি আছে। ত্বকের নার্ভ দিয়ে যে সাড়া মস্তিষ্কে পৌছে, তা থেকে আমাদের স্পর্শজ্ঞান জন্মে থাকে। সেজন্য ত্বকের অপর নাম স্পর্শেন্দ্রিয়। শিরা ও ধমনী দ্বারা ত্বকের মধ্যে রক্ত-সঞ্চালন ও তার পুষ্টিসাধন হয়।

ঘর্ম-গ্রন্থি (Sweat-glands)—এই জাতীয় অসংখ্য গ্রন্থি ত্বকের সকল স্থানে, বিশেষতঃ হাত ও পায়ের তলায়, সর্বাপেক্ষা অধিক দেখা যায়। সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম নলসমূহ ঘর্ম-গ্রন্থি হ'তে আরম্ভ ক'রে ত্বকের উপচর্মের ঘর্মকূপ পর্যন্ত এসেছে। দেহাভ্যন্তরের কতকগুলি দূষিত পদার্থ (Inorganic salts, Carbon dioxide, Urea, etc.) এবং দেহের অনাবশ্যক জলের কিয়দংশ এই সকল নলের সাহায্যে ঘর্মরূপে দেহ থেকে বেরিয়ে যায়। এই সকল ঘর্মকূপ পরিষ্কার রাখা প্রয়োজন; কারণ, এইগুলি বন্ধ হয়ে গেলে, দেহের দূষিত পদার্থ বেরোবার পথ পাবে না। ফলে নানাপ্রকার রোগের সৃষ্টি হ'তে পারে।

কেশ (Hair)—আসল চর্মের (Dermis) ভিতরে ঘামাচির মতো ছোট টবে এক-একটি কেশ প্রবিষ্ট থাকে; একে কেশের টব (Hair follicle) বলে। এই টবের মধ্যে নার্ভ, ধমনী প্রভৃতি থেকে কেশের পুষ্টিসাধন করে। মেদ-গ্রন্থি (Sebaceous glands) কেশের টবের নিকট অবস্থিত এবং এই সকল গ্রন্থি থেকে তৈলজাতীয় পদার্থ (Sebum) লোমকূপ ভেদ ক'রে উপচর্মে পৌছে। সেজন্যই চর্ম ও কেশ মসৃণ থাকে। প্রত্যেক কেশের গোড়ায় একটি মাংসপিণ্ড থাকে। ভয়ে, সুখে বা হর্ষে যে রোমাঞ্চ হয়, তা ঐ পেশীগুলি সংকুচিত হয়ে কেশ-গুলিকে খাড়া করারই ফল।

নখ (Nail)—অঙ্গুলির অগ্রভাগের শক্ত পদার্থটিকে নখ বলে। উপচর্ম (Epidermis) মোটা ও কঠিন হ'য়ে নখ সৃষ্টি করে। নখের অগ্রে কোন নার্ভ নেই ; সেজন্যই কাটার সময় কোন বেদনা অনুভব করা যায় না। ইহা শক্ত হ'লেও অস্থি নহে।

ত্বকের কার্য (Functions of skin)—ত্বক্ বহু কার্য সাধন করে : (১) শরীরের অভ্যন্তরস্থ কোমল অংশকে অনাহত অবস্থায় রাখে এবং জীবাণুকে দেহের মধ্যে প্রবেশ করতে দেয় না। (২) অসংখ্য শিরা ও ধমনীর সাহায্যে ত্বক্ শরীরের তাপের সমতা রক্ষায় সহায়তা করে। (৩) ঘর্মের উৎপাদন ও নিষ্কাশন ক'রে শরীরের অভ্যন্তরস্থ দূষিত মল নিঃসরণ করে। (৪) ত্বক্ দিয়ে তৈলাক্ত পদার্থ বেরিয়ে চর্মকে মসৃণ রাখে। (৫) উহা অধিকাংশভাবে বায়ু থেকে অম্লজান গ্রহণ ক'রে এবং তৈল, ঔষধাদি পদার্থ শোষণ ক'রে আংশিকভাবে খাদ্যগ্রহণের কাজ করে। (৬) ত্বকে অন্তর্মূল নার্ভসমূহ অবস্থিত ব'লে এর অনুভূতি মস্তকে গমন ক'রে স্পর্শবোধ জন্মায়।

সারাংশ—আমাদের পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্। মুখমণ্ডলের সম্মুখে দুটি চক্ষু আছে। এর সাহায্যে আমরা বাইরের বস্তুর রূপ দেখতে পাই। চক্ষু আমাদের দর্শনেন্দ্রিয়। বাতাসের শব্দ-তরঙ্গ কর্ণের ভিতর প্রবেশ ক'রে নার্ভের সাহায্যে আমাদের মস্তিষ্কে শব্দ-জ্ঞানের সৃষ্টি করে থাকে। নাসিকার সাহায্যে সাহায্যে আমাদের গন্ধের অনুভূতি জন্মে। উহা ঘ্রাণেন্দ্রিয়। নাসাপথ দিয়ে নিশ্বাস-প্রশ্বাস কার্যও চলে থাকে। জিহ্বার সাহায্যে আমাদের স্বাদ-জ্ঞান জন্মে ; উহা স্বাদনেন্দ্রিয়। তা ছাড়া জিহ্বা দ্বারা চর্বণ ও শব্দ-উচ্চারণ কার্যে সহায়তা হয়। ত্বকের সাহায্যে আমাদের স্পর্শ-জ্ঞান জন্মে। উহা স্পর্শেন্দ্রিয়। তা ছাড়া, ত্বক্ আমাদের দেহকে ঢেকে রাখে এবং দেহের খানিকটা জল ও দূষিত পদার্থকে ঘর্ম-রূপে বের করে দেয়।

রক্ত-সঞ্চালন তন্ত্র (Circulatory System) :

রক্তের প্রধান কার্য সর্বত্র জীবকোষের আহার্য ও অম্লজান পরিবেশন এবং দেহ থেকে দূষিত পদার্থের বহিষ্করণ। এই দু'প্রকার কার্যের জন্য প্রত্যেক অংশে রক্ত সঞ্চালিত হওয়া আবশ্যক। আমাদের হৃদযন্ত্রের সাহায্যে এই রক্ত-সঞ্চালন কার্য সাধিত হয়। সুতরাং, রক্ত-সঞ্চালন বুঝতে হ'লে হৃদযন্ত্র সম্বন্ধে ভালো জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

হৃৎপিণ্ড (Heart) :

বক্ষমধ্যে, অংস ফলকের পশ্চাতে, দুই পার্শ্বের ফুস্‌ফুস্ দ্বারের মধ্যে ও মধ্যচ্ছদার (Diaphragm) উপরে হৃৎপিণ্ড একটু বাঁদিকে হেলানোভাবে অবস্থিত। হৃৎপিণ্ড

দেখতে একটা ছোট ফাঁপা থলির মতো এবং এর দুটি দিকের কতকটা অংশ ফুস্‌ফুস্ দ্বারা আবৃত। পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির হৃদয় দৈর্ঘ্যে ৫ ইঞ্চি এবং এর সর্বাপেক্ষা প্রশস্ত স্থানের বিস্তার ৩½ ইঞ্চি। ইহার চওড়া দিকটিকে বেস্ (Base) ও সরু দিকটিকে অ্যাপেক্স (Apex) বলা হয়।

হৃৎপিণ্ডের দেহ মাংসপেশী (Myocardium) দিয়ে গঠিত। এই পেশীর মধ্যে স্নায়ু ও একপ্রকার বিশিষ্ট জাতীয় পেশী (Pace maker) আছে, যার আজ্ঞায় হৃৎপিণ্ড স্বতঃই তালে তালে কুঞ্চিত ও প্রসারিত হয়। হৃৎপিণ্ডের চারদিকে একটি তৈলাক্ত পদার্থপূর্ণ থলির মতো কঠিন আবরণ আছে; একে হৃৎপিণ্ডাবরক (Pericardium) বলে। এই আবরণের জন্যই হৃৎপিণ্ডের অত্যধিক প্রসারণ সম্ভব হয় না। এর অন্তর্ভাগ একটি মসৃণ, সূক্ষ্ম অথচ দৃঢ় পর্দা (Endocardium) দ্বারা আবৃত।

হৃৎপিণ্ডের কক্ষ (Chambers of the heart) :

হৃৎপিণ্ডের অভ্যন্তরভাগ সমান্তরাল পর্দা (Longitudinal partition) দ্বারা দক্ষিণ ও বাম—এই দুটি পেশীময় গহ্বরে (Mascular cavities) বিভক্ত। প্রত্যেক গহ্বরে দুটি ক'রে কক্ষ আছে—একটি উপরে ও একটি নীচে; অর্থাৎ, দ্বিতল গৃহের মতো। উপরের কক্ষ দুটিকে **অলিন্দ** (Auricle) ও নীচের কক্ষ-দ্বয়কে **নিলয়** (Ventricle) বলে। নিলয় অপেক্ষা অলিন্দ আয়তনে ছোট। অলিন্দের প্রাচীর পাতলা, কিন্তু নিলয়ের প্রাচীর মোটা। প্রত্যেক অলিন্দ থেকে তার নিম্নস্থ নিলয়ে রক্ত যাবার পথ আছে। দক্ষিণ অলিন্দ থেকে দক্ষিণ নিলয়ে আসার রন্ধ্রে একটি **তিন-পাল্লাযুক্ত কপাটিকা** (Tricuspid valve) আছে। সেরূপ বাম অলিন্দ থেকে বাম নিলয়ে আসার রন্ধ্রেও একটি **দুই-পাল্লাযুক্ত কপাটিকা** (Biscuspid valve) আছে। কপাটিকা দুটি এরূপভাবে সংলগ্ন যে, উপর থেকে চাপ দিলে নীচের দিকে খোলে, কিন্তু নীচের দিক থেকে চাপ দিলে বন্ধ হয়ে যায়। ফলে, অলিন্দ থেকে আগত রক্তে নিলয় পূর্ণ হ'লে রক্তের চাপে কপাটিকা দুটি বন্ধ হয়ে যায়; সেইজন্য রক্ত নিলয় থেকে উপরে অলিন্দে যেতে পারে না।

শরীরের যাবতীয় দূষিত রক্ত দুটি মহাশিরার সাহায্যে—**উত্তরা মহাশিরা** (Superior vena cava) ও **অধরা মহাশিরা** (Inferior vena cava)—দক্ষিণ অলিন্দে নীত হয়। দক্ষিণ নিলয়ের সঙ্গে **ফুস্‌ফুসাধিক ধমনী** (Pulmonary artery) সংযুক্ত আছে; এর মুখে **অর্ধচন্দ্র কপাটিকা** (Semilunar valve) থাকার দরুন ফুস্‌ফুসাধিক ধমনী থেকে রক্ত নিলয়ে ফিরে

আসতে পারে না। ফুস্‌ফুসাধিক ধমনী কিছুদূরে দুটি শাখায় বিভক্ত হয়ে ফুস্‌ফুস্‌ দুটিতে প্রবেশ করেছে।

বাম অলিন্দের সঙ্গে চারটি **ফুস্‌ফুসাধিক শিরা** (Pulmonary veins) সংযুক্ত আছে। বিশুদ্ধ রক্ত এদের মধ্য দিয়ে বাম নিলয়ে উপস্থিত হয়; বাম নিলয়ের সঙ্গে একটি মোটা নল সংযুক্ত আছে। এর নাম **মহাধমনী** (Aorta)। এর দ্বারা শরীরের সর্ব স্থানে বিশুদ্ধ রক্ত প্রবাহিত হয়। এর মুখে অর্ধচন্দ্র কপাটিকা (Semilunar valve) থাকার জন্য রক্ত মহাধমনী (Aorta) থেকে নিলয়ে ফিরে আসতে পারে না।

হৃদ্‌স্পন্দনের (Heart beat) নিয়ম :

মানুষ যখন মাতৃগর্ভে ৪ বা ৫ মাসের ভ্রূণ, তখন হ'তে হৃদয়ের স্পন্দন আরম্ভ হয়। মৃত্যুকাল পর্যন্ত এই স্পন্দন সমানে তালে চলে। বক্ষের বাঁদিকে কান পাতলে বা **বক্ষোপরীক্ষণ যন্ত্র** (Stethoscope) রাখলে, হৃৎপিণ্ডে ডুপ্‌ ডাপ্‌ শব্দ শুনতে পাওয়া যায়। ইংরেজীতে এই শব্দকে **লাব্‌** (Lubb) **ডুব্‌** (Dub) বলে। প্রথম শব্দটি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ ও দ্বিমাত্রিক, শেষের শব্দটি হ্রস্ব ও একমাত্রিক ; এর পর একটু বিরাম। অর্থাৎ, কয়েক মুহূর্ত বন্ধ থাকে। হৃৎপিণ্ডের নিয়ত সংকোচন ও প্রসারণের জন্য এরূপ শব্দ হয়। প্রথম লার, শব্দটি হয় নিলয়দ্বয়ের সংকোচনের ফলে, আর অলিন্দ ও নিলয়ের মাঝের কপাটিকাদ্বয় সজোরে বন্ধ হওয়ায়, দ্বিতীয় ডুব্‌ শব্দটি হয়। হৃদয়ের এই ক্রমান্বয় সংকোচনকে Systole ও প্রসারণকে Diatole এবং এই দুয়ের মিলিত অবস্থাকে Cardiac Cycle বলে। হৃৎপিণ্ডের ফার্স্ট সাউণ্ড+সেকেণ্ড সাউণ্ড+বিরাম=Cardiac Cycle. হৃৎপিণ্ড সাধারণতঃ মিনিটে প্রায় ৭২ বার স্পন্দিত হয়।

ফুস্‌ফুস্‌ (Lungs) :

দুটি ব্রঙ্কাস্‌ থেকে ফুস্‌ফুস্‌ দুটি গঠিত হ'য়ে বক্ষঃপিঞ্জরের মধ্যে মধ্যচ্ছদার উপর স্থাপিত আছে। দক্ষিণ ফুস্‌ফুস্‌ তিন খণ্ডে (Lobes) বিভক্ত। Pleura নামক পাতলা **রক্তস্রাবী আবরণ** (Serous membrane) দ্বারা এরা আবৃত। বায়ু-নালিকা, বায়ু-কোষ ও রক্ত-জালক দ্বারা ফুস্‌ফুস গঠিত। সেজন্য এর গঠন ফোঁপরা। প্রশ্বাস-বায়ু প্রথমে নাসাপথ দিয়ে প্রবেশ করে এবং শ্বাসনল ও ব্রঙ্কাসের ভেতর দিয়ে শেষ পর্যন্ত ফুস্‌ফুসের বায়ু-কোষে উপস্থিত হয়। রক্ত যখন ফুস্‌ফুসের জালকের মধ্যে যায়, তখন এর হিমোগ্লোবিন বায়ু-কোষের সূক্ষ্ম পর্দার ভিতর দিয়ে কোষ-মধ্যস্থ বায়ু হ'তে অম্লজান (Oxygen) শোধন ক'রে নেয় এবং অঙ্গারাম্ল (Carbon dioxide) কোষের মধ্যে পরিত্যাগ করে। এর পর

ফুস্‌ফুস্‌ সংকুচিত হয়, তখন এই অঙ্গারাম্ল-যুক্ত দূষিত বায়ু নিশ্বাসরূপে নাসাপথ দিয়ে বেরিয়ে আসে।

পাচন-তন্ত্র বা পরিপাক তন্ত্র—(**Digestive System**) ঃ

প্রাণধারণের জন্য আমাদের খাদ্যের প্রয়োজন। বৈজ্ঞানিক উপায়ে স্থির করা হয়েছে যে, আমাদের দেহের বৃদ্ধি, ক্ষতিপূরণ এবং উত্তাপ ও শক্তি সৃজনের জন্য ছয়টি মূল উপাদানের আবশ্যক—**প্রোটিন** (Protiene), **শ্বেতসার ও শর্করা** (Carbo-hydrates), **চর্বি** (Fat), **লবণ** (Salt), **জল** (Water) এবং **ভিটামিন** (Vitamin)। আমাদের যে-কোন একটি খাদ্যে এদের সবগুলো থাকে না ; সেজন্য আমাদের প্রাণিজ, উদ্ভিজ্জ এবং আকরিক নানাপ্রকার জিনিস খেতে হয়। আমরা যে খাদ্য খাই, সকল সময় তার সবটাই আমাদের দেহের জন্য প্রয়োজনীয় নয় ; তাতে অনাবশ্যক অংশও থাকে। তা ছাড়া, তার আবশ্যক অংশটিও তার স্বাভাবিক অবস্থায় দেহের কাজে লাগে না ; সেজন্য ভুক্ত দ্রব্যগুলি আমাদের পরিপাক-যন্ত্রের বিভিন্ন স্থান দিয়ে ধীরে ধীরে চালিত হয় এবং ভিন্ন ভিন্ন স্থান থেকে মিশ্রিত নানাপ্রকার পাচক রসের সঙ্গে মিশ্রিত হয়। ফলে, তাতে নানারূপ রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে। শেষ পর্যন্ত সেটা তরল আকারে রক্তের সঙ্গে মিশে বিভিন্ন জীবকোষে নীত হয়ে থাকে। এই সকল প্রক্রিয়াকে **পাচন-তন্ত্র** (Digestive system) বলে।

দেহকাণ্ডস্থ এক দীর্ঘ নালীর মধ্যে পরিপাক-ক্রিয়া সম্পন্ন হয় ; এর নাম **পৌষ্টিক নালী** (Alimentary canal)। এটি মুখবিবর থেকে পায়ু পর্যন্ত বিস্তৃত। এর চারটি অংশ আছে—মুখ-গহ্বর, খাদ্যনালী, আমাশয় ও অন্ত্র। খাদ্য এই চারটি অংশের ভিতর দিয়ে পরিচালিত হবার কালে সম্পূর্ণরূপে জীর্ণ হয় এবং তাকেই পাচন ক্রিয়া বলে।

(১) মুখের মধ্যে ক্রিয়া ঃ

খাদ্য প্রথমে মুখের মধ্যে জিহ্বার সাহায্যে দন্ত দ্বারা চর্বিত, কর্তিত ও পৃষ্ট হয়ে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অংশে বিভক্ত হয়। আমাদের মুখের মধ্যে তিন জোড়া **লালা-নিঃসারক গ্রন্থি** (Salivary glands) আছে—(ক) কর্ণদ্বয়ের নিকটবর্তী প্যারাটিড (Parotid) গ্রন্থিদ্বয়, (খ) নিম্ন চোয়ালের গাত্রলগ্ন সাব্‌-ম্যাক্সিলারী (Sub-maxilary) গ্রন্থিদ্বয় ও (গ) জিহ্বার তলদেশ স্থিত সাব-লিঙ্গুয়াল (Sub-lingual) গ্রন্থিদ্বয়। এই সব গ্রন্থি থেকে চর্বণের সময় প্রচুর পরিমাণে লালা (Saliva) বা রস নিঃসৃত হয়। লালা খাদ্যদ্রব্যকে নরম, সিক্ত ও পিচ্ছিল করে। সেজন্য আমরা সহজে খাদ্য গিলতে পারি। তা ছাড়া, সেই লালার মধ্যে **টায়ালিন**

(Ptyalin) নামক একপ্রকার **কিথসত্ত্ব** (Enzyme) আছে। এই কিথসত্ত্ব খাদ্যের অদ্রবণীয় শ্বেতসারকে দ্রবণীয় যব শর্করায় (Maltose) পরিণত করে। একখণ্ড রুটি বা একমুঠো খই মুখের মধ্যে দিলে প্রথমেই সেটা মিষ্ট লাগে না ; কিছুক্ষণ পরে সেটা শর্করায় পরিবর্তিত হ'লে, তার মিষ্ট স্বাদ অনুভূত হয়ে থাকে। খাদ্য চর্বিত হ'লে আমরা গলাধঃকরণ করি এবং সেই সময় কণ্ঠদেশের সংকোচনের জন্য **অধিজিহ্বা** বায়ুনালীর ঊর্ধ্বমুখে নীত হয়। সেই অল্প সময়ের জন্য ঢাকনিখানি দ্বারা বায়ুনালী ঊর্ধ্বমুখে আবৃত হয় এবং শ্বাসকার্য বন্ধ থাকে। সেই অল্প সময়ের মধ্যেই সু-চর্বিত লালা-মিশ্রিত খাদ্য ঐ ঢাকনির উপর দিয়ে এসে খাদ্যনালীর (Oesophagus) মধ্যে পতিত হয়। তারপর খাদ্যনালীর ভেতর দিয়ে সেই খাদ্য আমাশয়ে গিয়ে পৌছায়।

(২) আমাশয়ের মধ্যে ক্রিয়া ঃ

আমাশয় অনেকটা থলির আকার-বিশিষ্ট। ইহা দৈর্ঘ্যে প্রায় ১ ফুট ও প্রস্থে ৪ হ'তে ৫ ইঞ্চি। ইহা আমাদের বক্ষঃস্থলের নীচে উদরের বাম পাশে থাকে। ইহা মাংসপেশী-যুক্ত একখানা পর্দা দ্বারা নির্মিত। আমাশয়ের তিনটি অংশ—(ক) আগম দ্বার (Cardiac end) (খ) মধ্যভাগ ও (গ) নিগম দ্বার (Pyloric end) ; এরই প্রান্তদেশ থেকে ক্ষুদ্রান্ত্র আরম্ভ।

আমাশয়ের ভেতরকার গাত্রে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থি আছে। এই সব গ্রন্থি থেকে একপ্রকার পাচক রস নির্গত হয়। এই গ্যাসকে **আমাশয় রস** (Gastric juice) বলে। ইহা একপ্রকার পাতলা অম্লরস এবং এতে তিনটি কিথসত্ত্ব আছে— হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড (Hydrochloric acid), পেপ্‌সিন (Pepsin) ও রেনিন্ (Renin)। আমাশয় এদের সাহায্যেই প্রোটিন-জাতীয় খাদ্যকে আংশিক-ভাবে জীর্ণ করে। খাদ্যের সঙ্গে যে সব জীবাণু আমাশয়ে প্রবেশ করে, তারা আমাশয়ের অম্লরসে বিনষ্ট হয়। এইরূপে দেহ ব্যাধি থেকে রক্ষা পায়। আমাশয়ের মধ্যে যতক্ষণ পর্যন্ত ভুক্ত দ্রব্য থাকে, ততক্ষণ ইহা আমাশয়ের প্রাচীরের পেশীগুলির সংকোচনের ফলে উক্ত রসের সঙ্গে আন্দোলিত ও মথিত হ'তে থাকে। ভুক্ত দ্রব্য মণ্ডের (Chyme) আকার ধারণ না করা পর্যন্ত এই আন্দোলন ও মন্থন ক্রিয়া চলতে থাকে। একে আমাশয়ের **মন্থন-ক্রিয়া** (Churning movement of the stomach) বলে।

(৩) অন্ত্রের মধ্যে ক্রিয়া ঃ

ভুক্ত দ্রব্য আমাশয়ে আংশিকভাবে জীর্ণ ও মণ্ডে পরিণত হবার পর আমাশয় ও অন্ত্রের মধ্যস্থিত পেশী-নির্মিত কপাট খুলে যায় এবং ঐ মণ্ড অন্ত্রের মধ্যে প্রবেশ

করে। অন্ত্রের দুটি অংশ--(ক) **ক্ষুদ্রান্ত্র** (Small intestine) ও (খ) **বৃহদন্ত্র** (Large intestine)। উভয় অন্ত্রই পরস্পর সংলগ্ন, এবং এদের মধ্যে একটি পেশী-নির্মিত ছিদ্র আছে। এই ছিদ্রের উপরিস্থিত কপাটের নাম **ইলিওসিকেল ভালভ্** (Illiocaecal valve)। এই ছিদ্রের মধ্য দিয়েই জীর্ণ দ্রব্য ক্ষুদ্রান্ত্র থেকে বৃহদন্ত্রে প্রবেশ করে।

(ক) **ক্ষুদ্রান্ত্র (Small intestine) :**

ক্ষুদ্রান্ত্র একটি ফাঁপা নলবিশেষ। এটি সরু ব'লে আয়তনে ক্ষুদ্র দেখায়, কিন্তু ইহা দৈর্ঘ্যে প্রায় ২০ ফুট। উদরের মধ্যে ইহা কুণ্ডলী আকারে থাকে ; চল্‌তি কথায় একেই নাড়ি-ভুঁড়ি বলে। ক্ষুদ্রান্ত্রের তিনটি অংশ—(ক) ডিওডেনাম (Duodenum)—এই অংশটি আমাশয়ের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে এবং এর মধ্যস্থিত ছিদ্রের সঙ্গে সংযুক্ত নলের সাহায্যে যকৃৎ ও অগ্ন্যাশয় থেকে পাচক রস অন্ত্রে পৌছায়। দৈর্ঘ্যে ইহা ১০ ইঞ্চি হ'তে ১২ ইঞ্চি পর্যন্ত হয় ; (খ) জেজুনাম (Jejunum)—ডিওডেনামকে বাদ দিলে সমগ্র ক্ষুদ্রান্ত্রের অবশিষ্টাংশের ২/৫ ভাগ ও (গ) ইলিয়াম্ (Illium)—৩/৫ ভাগ মাত্র। ক্ষুদ্রান্ত্রের ভেতরকার গায়ে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থি আছে। এই সব গ্রন্থি থেকে একপ্রকার পাচক রস বেরোয়। এই রসকে ক্ষুদ্রান্ত্রের ক্ষরিত আন্ত্রিক রস (Succus intericus) বলে।

আমাশয় হ'তে আগত আংশিকভাবে জীর্ণ ও ভুক্ত দ্রব্য ক্ষুদ্রান্ত্রের ভেতর কতকগুলি পাচক রসের সাহায্যে আরও জীর্ণ হয়। তিন প্রকার পাচক রস ক্ষুদ্রান্ত্রের ঐ সকল জীর্ণ দ্রব্যের উপর কাজ করে—যকৃৎ থেকে নিঃসৃত পিত্তরস (Bile), অগ্ন্যাশয় হ'তে নিঃসৃত রস (Succus intericus)। যকৃৎ থেকে নিঃসৃত পিত্তরসে কোন কিণ্বসত্ত্ব নেই। ইহা অগ্ন্যাশয় রসকে (Pancreatic juice) ক্ষুদ্রান্ত্রের মধ্যে কাজ করতে সাহায্য করে। ইহা চর্বি শোষণ-কার্যের সহায়ক এবং দেহ থেকে নানাপ্রকার বিষাক্ত দ্রব্য বে'র করে দেয়।

অগ্ন্যাশয় রসে নিম্নলিখিত কিণ্বসত্ত্বগুলি আছে :—

(১) ট্রিপ্‌সিন (Trypsin)—ইহা প্রোটিনাংশের উপর কার্য করে এবং প্রোটিনাংশের জটিল অবস্থা থেকে তাকে সরল অবস্থায় পরিবর্তিত করে।

(২) এমাইলেজ (Amylase)—ইহা শ্বেতসার ও শর্করার উপর কার্য ক'রে সরল শর্করায় পরিণত করে।

(৩) লিপেজ (Lypase)—ইহা চর্বি-জাতীয় অংশের উপর কার্য ক'রে তাকে সম্পূর্ণরূপে জীর্ণ করে।

ক্ষুদ্রান্ত্রের পাচক রসে নিম্নলিখিত কিণ্বসত্ত্বগুলি আছে :—

(১) ইরেপ্‌সিন (Irepsin)—ইহা প্রোটিনাংশের উপর কার্য করে এবং ট্রিপ্‌সিনের সঙ্গে একযোগে তাকে অ্যামাইনো অ্যাসিডে (Amino acid) পরিবর্তিত করে।

(২) এণ্টারোকাইনেজ (Enterokinase)—ইহা ট্রিপ্‌সিনকে প্রোটিনাংশের উপর কার্য করতে সাহায্য করে।

(৩) ইন্‌ভার্টেজ (Invertase)—ইহা জটিল শর্করাগুলিকে সরল করতে সাহায্য করে। তা ছাড়া, অগ্ন্যাশয় রসে ম্যালটেজ ও ল্যাকটেজ (Maltase and Lactase) নামে আরও দুটি কিণ্বসত্ত্ব আছে এবং তারা শর্করাংশকে সরল করতে সাহায্য করে। ক্ষুদ্রান্ত্রের মধ্যে চর্বি-জাতীয় অংশ সম্পূর্ণরূপে জীর্ণ হয় এবং অন্যান্য অংশের পরিপাক-ক্রিয়া প্রায় শেষ হয়। এর ভিতর সূক্ষ্ম শুঁয়ার ন্যায় কতকগুলি শোষক যন্ত্র (Villi) আছে। তাদের সাহায্যে জীর্ণ দ্রব্যের সারাংশ শোষিত হয়ে রক্ত কৈশিকার মধ্যে প্রবেশ ক'রে এবং দেহের সর্বত্র সঞ্চালিত হয়। শোষিত খাদ্য দেহ-কোষগুলিতে পৌছিয়ে দেওয়া রক্তের একটি প্রধান কাজ। রক্ত এই কাজ ক'রে ফেরবার সময় দেহ-কোষগুলির পরিত্যক্তাংশ সংগ্রহ ক'রে ফুস্‌ফুস্‌, বৃক্ক ও চর্মের ছিদ্রপথ দিয়ে বের ক'রে দেয়। খাদ্যের পরিপাক ও শোষণ ক্রিয়া ধীরে ধীরে সাধিত হয়ে থাকে ; সুতরাং, ভুক্ত বস্তু অন্ত্রের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে চালিত হওয়া আবশ্যক। এজন্য ক্ষুদ্রান্ত্র একটি দীর্ঘ নল এবং উহা জড়ানো অবস্থায় থাকে।

(খ) বৃহদন্ত্র (Large intestine) :

এই অন্ত্র অপেক্ষাকৃত স্থূল এবং দৈর্ঘ্যে প্রায় ৬ ফুট। ইহা ক্ষুদ্রান্ত্রকে বেষ্টন ক'রে আছে। এর চারটি অংশ—(ক) সিকম্‌ (Secum)—ক্ষুদ্রান্ত্রের শেষ পর্যন্ত বিস্তৃত ; (খ) কোলন্‌ (Colon)—বৃহদন্ত্রের একটি প্রধান অংশ, এর আবার তিনটি বিভাগ আছে—(১) ঊর্ধ্বগামী কোলন্‌, (২) অনুপ্রস্থ কোলন্‌ ও (৩) অধোগামী কোলন্‌ ; (গ) কোলনের পর **মলভাণ্ড** (Rectum) এবং সর্বশেষে **মলদ্বার** (Anus)।

ক্ষুদ্রান্ত্র হ'তে জীর্ণাবশিষ্ট খাদ্য আংশিক তরল অবস্থায় বৃহদন্ত্রে প্রবেশ করে। এখানে কোন পাচক রসের নিঃসরণ হয় না। খাদ্যের জলীয় অংশ এবং কিছু লবণ এখানে শোষিত হয়। অতঃপর খাদ্যের পরিত্যক্তাংশ মলভাণ্ডে উপস্থিত হয় এবং শেষ পর্যন্ত মলের আকারে পায়ু দিয়ে বেরিয়ে আসে।

সারাংশ—খাদ্যবস্তু প্রথমে মুখের মধ্যে লওয়া হয়। সেখানে উহা চর্বিত ও লালার সঙ্গে মিশ্রিত হওয়ার ফলে শ্বেতসার-জাতীয় খাদ্য শর্করায় পরিবর্তিত হয়।

মুখ থেকে উহা খাদ্যনালীর ভিতর দিয়ে আমাশয়ে পৌঁছায়। আমাশয়ের গাত্র হ'তে ক্ষরিত অম্ল পাচক রসের সাহায্যে প্রোটিন-জাতীয় খাদ্যের পরিবর্তন ঘটে। আমাশয় থেকে খাদ্য যায় ক্ষুদ্রান্ত্রে। তথায় যকৃৎ, অগ্ন্যাশয় ও ক্ষুদ্রান্ত্রের গাত্র থেকে ক্ষরিত পাচক রসের সাহায্যে পাচন-ক্রিয়া সম্পূর্ণ হ'য়ে থাকে। সকল জাতীয় খাদ্য এখানে জীর্ণ হয়ে থাকে। তা ছাড়া, রস ও রক্তবাহী নালীগুলি এখান হ'তে খাদ্যের সারাংশ গ্রহণ ক'রে থাকে। ক্ষুদ্রান্ত্র থেকে অবশিষ্ট খাদ্য বৃহদন্ত্রে প্রবেশ করে। সেখানে খাদ্যের জলীয় অংশ ও কিছু লবণ শোষিত হয়ে থাকে। খাদ্যের অবশিষ্টাংশ মলদ্বার দিয়ে মলের আকারে বেরিয়ে আসে। খাদ্যের পথ :—

মুখ→খাদ্যনালী→আমাশয়→ক্ষুদ্রান্ত্র→বৃহদন্ত্র→পায়ু→দেহের বাহির।

মাংসপেশী (Muscles) :

শরীর থেকে চর্ম বিযুক্ত করলে, চর্বির নীচে লাল রঙের ও চ্যাপ্টা ধরনের যে লম্বা আঁশযুক্ত মাংসরাশি বেরিয়ে আসে, তারই নাম **মাংসপেশী** (Muscles)। আমাদের দেহে ছোট, বড়, লম্বা, চ্যাপ্টা, গোল প্রভৃতি নানা আকারের কয়েকশ' মাংসপেশী রয়েছে। দেহের ওজনের পাঁচ ভাগের দু'ভাগ মাংসপেশীর ওজন। মাংস-কোষগুলি সংযোজক পদার্থের দ্বারা একসঙ্গে গ্রথিত হয়ে মাংস-তন্তুতে পরিণত হয়। অনেকগুলি মাংস-তন্তু গুচ্ছাকারে একখানা শক্ত অথচ পাতলা (Sarcolema) পর্দা দ্বারা আবদ্ধ হয়ে এক-একটি মাংসপেশীতে পরিণত হয়ে থাকে। মাংসপেশীর মধ্যভাগ কিছু মোটা। এর উভয় প্রান্ত ক্রমশঃ পাতলা ও শক্ত হয়ে ফিতা বা রজ্জুতে পরিণত হয়। মাংসপেশীর এই অংশের নাম **টেণ্ডন** (Tendon)। টেণ্ডনের দ্বারা মাংসপেশী হাড়ের সঙ্গে বাঁধা থাকে। এখন তোমরা বুঝতে পারছ যে, মাংসপেশী আঁশের সমষ্টি। পাঁঠার পায়ের একখণ্ড মাংস সিদ্ধ করবার পর টিপে দেখা দেখবে, তাতে অনেকগুলি আঁশ রয়েছে। মাংসপেশীর পুষ্টিসাধনের জন্য ওর মধ্যে বহুসংখ্যক সূক্ষ্ম রক্তবাহী ও রসবাহী জালক রয়েছে।

কার্যকারিতা হিসাবে পেশীসমূহ দু'ভাগে বিভক্ত হ'তে পারে। যথা—(ক) ঐচ্ছিক বা ইচ্ছাধীন (Voluntary) ও (খ) অনৈচ্ছিক বা স্বাধীন (Involuntary)। যে সকল মাংসপেশী হাড়ের সঙ্গে বাঁধা এবং আমাদের ইচ্ছানুসারে যাদের সংকোচন ও প্রসারণের ফলে দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঞ্চালন হয়, তা ঐচ্ছিক বা ইচ্ছাধীন মাংসপেশী। আমাদের হস্ত-পদের পেশীগুলি এই শ্রেণীর। যে সমস্ত পেশী আমাদের দেহের যন্ত্রসমূহে থেকে আমাদেরই অজ্ঞাতে কার্য সম্পাদন করে, তাদের অনৈচ্ছিক

বা স্বাধীন মাংসপেশী বলে। আমাশয়, অন্ত্র প্রভৃতি যন্ত্রে যে সকল পেশী আছে তারা এই শ্রেণীর।

মাংসপেশীর কার্য (Functions of muscles) :

জীবের এক স্থান হ'তে অন্য স্থানে ইচ্ছাক্রমে গমনাগমন কিংবা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঞ্চালন ও অভ্যন্তরস্থ যন্ত্রাদির কার্যকলাপ সম্পাদন প্রভৃতি ক্রিয়া পেশীসমূহের সংকোচন ও প্রসারণের দ্বারা সম্পন্ন হয়ে থাকে। দেহখানা যাতে সহজে নাড়াচাড়া করতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে ২০৬ খানি অস্থি-সংযোগে নরকঙ্কাল গঠিত। হাড়ের সংযোগগুলি এরূপভাবে গঠিত, যেন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলিকে আমরা সহজে প্রয়োজন অনুসারে চালনা করতে পারি। কিন্তু হাড়গুলি তো আর নিজেরা নড়তে পারে না। তাদের সঙ্গে সংবদ্ধ মাংসপেশীগুলি যখন সংকুচিত বা প্রসারিত হয়, তখন তাদের সঞ্চালন হয়ে থাকে।

অস্থি (Bone) :

নরকঙ্কালের অস্থিসমূহ খনিজ ও জৈব পদার্থের সংমিশ্রণে গঠিত। খনিজ পদার্থের পরিমাণ শতকরা ৬৩ ভাগ ও জৈব পদার্থের পরিমাণ শতকরা ৩৭ ভাগ।

খনিজ পদার্থের প্রধান উপাদান ক্যাল্সিয়াম্ ফস্ফেট্; কিন্তু তাতে ক্যাল্সিয়াম্ কার্বনেট্, ক্যাল্সিয়াম্, ক্লোরাইড্ ও ম্যাগনেসিয়াম্ ফস্ফেট্ থাকে। জৈব পদার্থের উপাদান **কোলাজেন** (Collagen); তা ফুটিয়ে **জিলেটিন** (Gelatine) পাওয়া যায়। খনিজ ও জৈব পদার্থ অস্থি মধ্যে এমনভাবে মিশ্রিত আছে যে, রাসায়নিক প্রক্রিয়া ভিন্ন উভয়কে পৃথক করা যায় না। অগ্নি-সংযোগে জৈব পদার্থ এবং রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় খনিজ পদার্থ বিশ্লিষ্ট হয়।

অস্থির বহির্ভাগ কঠিন। এর ভেতরের অংশ ঝাঁঝরা এবং অপেক্ষাকৃত কোমল। ঐ কোমল অংশকে **মজ্জা** (Marrow) বলে। অস্থির উপরিভাগে একখানা পাতলা অথচ শক্ত পর্দা আছে; একে **পেরিস্টিয়ম্** (Periosteum) বলে। এই পর্দার সঙ্গে রক্তবাহী শিরা ও ধমনীগুলি সংলগ্ন থাকে। হাড়ের গায়ে দুই-একটি ছিদ্র আছে। সেই পথ দিয়ে মজ্জার পুষ্টিসাধন হয়। পৃথক পৃথক হাড়ের সংযোগস্থল একপ্রকার বন্ধনী দ্বারা শক্তভাবে বাঁধা থাকে; তাকে **অস্থি-বন্ধনী** (Ligament) বলে। কিন্তু এই বন্ধনের জন্য তাদের নড়াচড়ার কোন অসুবিধা হয় না। যেখানে দুখানা হাড় সংযুক্ত, তাদের উভয়ের মধ্যে একখানা ক'রে অপেক্ষাকৃত নরম তরুণাস্থি (Cartilage) থাকে; তা গদির কাজ করে। তা ছাড়া, সেখানে তেলের মতো একপ্রকার জিনিসও থাকে। সেজন্য হাড় দুখানা সহজে নড়াচড়া করতে পারে না এবং ঘর্ষণে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। সর্বসমেত **২০৬ খানা ক্ষুদ্র বৃহৎ অস্থির সংযোগে মানব-দেহ গঠিত।**

অস্থির কার্য (Functions of bones) ঃ

দেহের বিভিন্ন অংশ মাংসপেশীর সাহায্যে সঞ্চালন, মাংসপেশী আট্‌কাবার জন্য ও দেহের কোমল অংশগুলিকে সুরক্ষিত রাখবার জন্য অস্থির প্রয়োজন।

অস্থিসন্ধি ও বন্ধনী (Joints and ligaments) ঃ

অস্থিসমূহ বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত অবস্থায় থাকলে, তাদের দ্বারা নরকঙ্কাল বা মানব-দেহের কাঠামো গঠিত হ'তে পারত না; সুতরাং অস্থিগুলোকে যথাস্থানে সংযুক্ত করবার জন্য অন্য প্রকার বস্তুর প্রয়োজন হয়। অস্থিসন্ধির (Joints) দ্বারা অস্থি-গুলির মিলন সাধিত হয়। অস্থিসন্ধি দুপ্রকার—(১) **অচল সন্ধি** (Immovable joints) ও (২) **সচল সন্ধি** (Movable joints)। অচল সন্ধির মধ্যে কতকগুলি মোটেই নড়াচড়া করতে পারে না; যেমন—**মাথার খুলির অস্থিসন্ধি** ও **বস্তির অস্থিসন্ধি**; আর কতকগুলি সামান্য নড়তে পারে, যেমন—মেরুদণ্ডের অস্থিসন্ধি। সচল সন্ধির অস্থিগুলিকে (যেমন হাতের কব্জি, কনুই, হাঁটু) আমরা ইচ্ছামত নানা দিকে ও নানা ভাবে নড়াচড়া করতে পারি। সচল সন্ধিস্থলে দুখানি অস্থি দুদিক হ'তে এসে কব্জার মতো মিলিত হয়। এই সংযোগস্থল একপ্রকার বন্ধনী দ্বারা শক্ত-ভাবে বাঁধা থাকে; তাকে **অস্থি-বন্ধনী** (Ligament) বলে। কিন্তু এই বন্ধনীর জন্য তাদের সঞ্চালনের কোন অসুবিধা হয় না। যেখানে দুখানি হাড় সংযুক্ত, তাদের উভয়ের মধ্যে একখানা ক'রে অপেক্ষাকৃত নরম তরুণাস্থি (Cartilage) থাকে। তা গদির কাজ করে। তরুণাস্থির নীচের পর্দাকে **সাইনোভিয়াম** বলে; তা থেকে নির্গত তৈল জাতীয় পদার্থের জন্যই সন্ধিস্থলের অস্থিগুলি সহজেই সঞ্চালিত হ'তে পারে এবং ঘর্ষণে কিছুমাত্র ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। এই তৈলজাতীয় পদার্থ যেন মানব-দেহের কঙ্কালের মবিলঅয়েল।

রক্ত-প্রবাহ ঃ

রক্তনালীর ভিতর দিয়ে অবিরত রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে। এক মুহূর্তও তার বিরাম নেই। হৃদ্‌যন্ত্র মিনিটে **৭২ বার ধুক্‌ ধুক্‌ করে**। এই স্পন্দনের ফলেই অবিরাম রক্ত-চলাচল করে।

বস্তুতঃ হৃদ্‌যন্ত্র একটি পাম্পবিশেষ—কয়েকটা ভাল্‌ভ-যুক্ত ডবল পাম্প। এর গঠন একটা স্থূল থলির মতো। থলিটি দুভাগে বিভক্ত—প্রত্যেক ভাগে দুটি ক'রে কক্ষ আছে। দেহের সর্বত্র পরিক্রমণ ক'রে অশুদ্ধ রক্ত হৃদ্‌যন্ত্রের ডানদিকের উপরের কক্ষে প্রবেশ করে; তাকে বলে দক্ষিণ অলিন্দ। সেখান থেকে একটা ভাল্‌ভের দ্বার দিয়ে নিম্নের বড় আয়তনের কক্ষে (Right Ventricle) যায়। এই

রাইট্‌ ভেণ্টি্রকিল্‌ যখন সংকুচিত হয়, তৎক্ষণাৎ উপরের ভাল্‌ভের দ্বার বন্ধ হয়ে যায়। তখন পাশের রক্তনালী দিয়ে রক্তস্রোত শ্বাসযন্ত্রে প্রবেশ করে। দেহে প্রবাহিত সমস্ত রক্ত এইভাবে শ্বাসযন্ত্র বা ফুসফুসে প্রবেশ ক'রে বিশুদ্ধ হয়। সেখান থেকে আর একটি রক্তনালী দিয়ে **লেফ্‌ট্‌ অরিকিল্‌**-এ প্রবেশ করে। তখন সেই রক্ত ঘোর রক্তবর্ণ ও বিশুদ্ধ থাকে। সেখান থেকে আর একটি ভাল্‌ভের দ্বার দিয়ে **লেফ্‌ট্‌ ভেণ্টি্রকিল্‌**-এ প্রবেশ করে। লেফ্‌ট্‌ ভেণ্ট্রিকিল সংকুচিত হ'লেই বিশুদ্ধ রক্তস্রোত **প্রধান ধমনী** (Aorta) দিয়ে বের হয়ে বহু ধমনী ও তাদের অসংখ্য শাখা-প্রশাখা দিয়ে সমস্ত শরীরে চালিত হয়। সমস্ত শরীর ঘুরে রক্ত-প্রবাহ অবশেষে **প্রধান শিরা** দিয়ে পুনরায় হৃদ্‌যন্ত্রের রাইট্‌ অরিকিল্‌-এ ফিরে আসে। এভাবে সর্বশরীরে রক্ত সঞ্চালিত হয়ে থাকে।
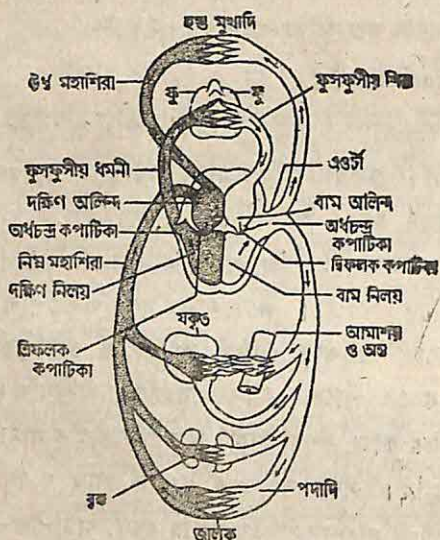
রক্তনালী (Blood vessel) তিন প্রকার। যথা—

(১) যে সকল রক্তনালী হৃদ্‌যন্ত্রের বিশুদ্ধ রক্ত গ্রহণ ক'রে শরীরে সরবরাহ করে, তাদের **ধমনী** (Artery) বলে। ধমনীর রক্ত বিশুদ্ধ, তার বর্ণ টক্‌টকে লাল। হৃদ্‌যন্ত্রের স্পন্দনের সঙ্গে সঙ্গে রক্ত ধমনীতে প্রবাহিত হয়। ধমনী কেটে গেলে, তা থেকে ধুক্‌ ধুক্‌ ক'রে লাল রক্ত বের হয়। ধমনীর রক্ত হৃদ্‌যন্ত্র থেকে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দিকে প্রবাহিত হয়।

(২) ধমনীগুলি ক্ষুদ্র হ'তে ক্ষুদ্রতর শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে শরীরের সকল অংশে অতি সূক্ষ্ম জাল বিস্তার ক'রে আছে। এই সব সূক্ষ্ম রক্তনালীর নাম **কৈশিক রক্তনালী** (Capillary)। এখানে রক্ত-প্রবাহের গতি খুবই মন্থর।

(৩) কৈশিক রক্তনালীর জাল থেকে ধমনীর বিপরীত দিকে আবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নালীপথে রক্ত প্রবেশ করে। এই নালীগুলির নাম **উপশিরা**। কয়েকটা উপশিরা একত্র হয়ে এক-একটা **শিরায়** (Vein) পরিণত হয়। শিরাগুলি আবার বাড়তে বাড়তে অবশেষে বৃহৎ শিরা দিয়ে হৃদ্‌যন্ত্রে রাইট্‌ অরিকিল্‌-এ মিশেছে।

শিরার রক্তের গতি ধীর নয়, তার গতি একটানা—অব্যাহত। এই রক্ত শরীর থেকে কার্বনিক অ্যাসিড গ্যাস ও অন্যান্য উৎস্পৃষ্ট দ্রব্য বহন ক'রে আনে। এজন্য এর রঙ টক্‌টকে লাল নয়, এর বর্ণ ঘোলা রঙের। শিরা কাট্‌লে তা থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়ে। শিরার রক্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে হৃদ্‌যন্ত্রের দিকে প্রবাহিত হয়।

শিরার মধ্যে কিছুদূর অন্তর একটা ক'রে ভাল্‌ভ আছে। সেগুলি **ভাল্‌টিউবের** কাজ করে। শিরাগুলি এমনভাবে তৈরি যে, রক্তস্রোত শিরা দিয়ে হৃদ্‌যন্ত্রের দিকে যাওয়ার সময় ভাল্‌টিউবটি মুক্ত থাকে, কিন্তু রক্তস্রোতকে বিপরীত দিকে প্রবাহিত হ'তে দেয় না।

পরিপাক-যন্ত্র ও তার প্রক্রিয়া ঃ

আহার-গ্রহণ ও পরিপাক-ক্রিয়া জীবমাত্রেরই করতে হয়। খাদ্য হজম হওয়ার আগে কতকগুলি প্রক্রিয়ার প্রয়োজন হয়। (১) খাদ্য প্রথমে ভালো ক'রে চিবিয়ে ক্ষুদ্র খণ্ডাকারে বিভক্ত ক'রে নিতে হয়। (২) তারপর গলাধঃকরণ করলে, তা পাকস্থলীতে যায়। (৩) সেই খাদ্য শেষে রক্তের সঙ্গে মিশে ও তার ফলে আমরা শরীরে বেশ আরাম পাই এবং আমাদের দৈহিক শক্তি বাড়ে।

পরিপাক-ক্রিয়া দেহের অভ্যন্তরে একটি দীর্ঘ নালীর মধ্যে সম্পন্ন হয়। এই নালীটির নাম **পৌষ্টিক নালী**। মুখ-গহ্বর থেকে তা বরাবর মলদ্বার পর্যন্ত বিস্তৃত। পৌষ্টিক নালী মোটামুটি পাঁচ ভাগে বিভক্ত ; যথা—(১) **অন্ননালী**, (২) **পাকস্থলী**, (৩) **ক্ষুদ্রান্ত্র**, (৪) **বৃহদন্ত্র** ও (৫) **মলনালী**। এ ছাড়া, পৌষ্টিক নালীর বহির্ভূত দুটি দেহ-যন্ত্র আছে। সেগুলির সাহায্যে পাচক রস নালীপথে বের হয়ে পৌষ্টিক নালীতে এসে পরিপাক-ক্রিয়ার সাহায্য করে। যন্ত্র দুটির নাম **যকৃৎ** ও **প্যানক্রিয়স**।

অন্ননালী (Gullet) ঃ

খাদ্যসামগ্রী মুখ থেকে গলাধঃকরণ হওয়ার পর অন্ননালী দিয়ে পাকস্থলীতে যায়। অন্ননালীটি একটি গোলাকার পেশীর নল। পেশীর ক্রিয়ায় খাদ্যসামগ্রী ধাক্কা খেয়ে অগ্রসর হয়। অন্ননালীর মাঝপথে খাদ্যবস্তুকে আটক রাখার সাধ্য আমাদের নেই। পৌষ্টিক নালীর সকল অংশ সম্বন্ধেই এ কথা খাটে। পৌষ্টিক নালী যে পেশী দিয়ে তৈরী, তা অনায়ত্ত পেশী।

পাকস্থলী (Stomach) ঃ

অন্ননালীর নীচে পৌষ্টিক নালী বিস্তৃত এবং মোটা হয়ে থলির আকার ধারণ করেছে। সেই থলিটির নাম পাকস্থলী। খাদ্য এখানে এসে কিছুক্ষণ থাকে। আসল

পরিপাক-ক্রিয়ার এখানেই আরম্ভ। খাদ্যসামগ্রী পাকস্থলীতে এসে ঘন তরল অবস্থায় পরিণত হয়।

পাকস্থলীর প্রাচীর তিনটি স্তরে তৈরী। বাইরের স্তর অতিশয় মসৃণ ও পিচ্ছিল; সেজন্য পাকস্থলী নড়াচড়া করতে বাধা পায়। মাঝখানের স্তর পেশী-নির্মিত। ভিতরের স্তরটি একটি কোমল পর্দার আচ্ছাদন, তার গায়ে অজস্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্লাণ্ড আছে। গ্লাণ্ড থেকে যে পাচক রস নিঃসৃত হয়, তার নাম গ্যাস্‌ট্রিক জুস্। খাদ্য এই রসে মিশ্রিত ও দ্রবীভূত হয়। পাকস্থলীতে খাদ্যের প্রোটিন ভাগ কিয়দংশ হজম হয়।

পাকস্থলী থেকে খাদ্যের নির্গমের পথে একটা পেশী-দ্বার আছে। যতক্ষণ পাকস্থলীতে হজম-ক্রিয়া চলে, ততক্ষণ দ্বারটি রুদ্ধ থাকে; কেবল কিছুক্ষণ অন্তর অন্তর এক-একবার মুক্ত হয়ে দ্রবীভূত খাদ্যাংশকে ক্ষুদ্রান্ত্রে যাওয়ার পথ ক'রে দেয়। পাকস্থলীর পেশী সংকুচিত হয়ে মুক্ত-দ্বার-পথে দ্রবীভূত তরল বস্তুকে ঠেলে নীচে নামিয়ে দেয়।

ক্ষুদ্রান্ত্র (Small intestine):

পাকস্থলী থেকে দ্রবীভূত খাদ্যসামগ্রী পৌষ্টিক নালীর যে অংশে যায়, তার নাম ক্ষুদ্রান্ত্র। এর গঠন নলের মতো। প্রায় ১ ইঞ্চি ব্যাস ও ২২ ফুট দীর্ঘ নলটি বহুবার পাক খেয়ে ও ভাঁজ হয়ে উদরের ভিতর জড়ো হয়ে থাকে। খাদ্যসামগ্রী এখানে এসে আবার রসাচ্ছাদিত হয়, তারপর পরিপাক হয়ে রক্তস্রোতে মিশে দেহসাৎ হয়। যা বাকী থাকে, তা আবার অন্য একটি দ্বারপথে বৃহদন্ত্রে চালিত হয়। যকৃৎ ও প্যান্‌ক্রিয়স নামক দুটি গ্রন্থির দুটি নালী ক্ষুদ্রান্ত্রের উর্ধ্বভাগে **পিত্তরস** (Bile) ও **প্যান্‌ক্রিয়ার রস** (Pancreatic Juice) ঢেলে দেয়। পাকস্থলী থেকে নামবার পথে খাদ্যসামগ্রী এই সকল পাচক রসে সিক্ত ও মিশ্রিত হয়।

ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রাচীরও তিন প্রকার স্তরে গঠিত। ভিতরের আবরণে অজস্র অতি-ক্ষুদ্র উচ্চভাগ-সকল থাকাতে, এর গাত্র কোমল মখমলের মতো। ভিলির (Villi) ভিতরের খাঁজের মধ্যে রক্তনালীর উপনালী আছে; সেই পথে দ্রবীভূত ও বিশ্লিষ্ট খাদ্যসামগ্রী শোষিত হয়ে রক্তস্রোতে মিশে যায়। এইরূপে খাদ্য দেহসাৎ হয়।

বৃহদন্ত্র (Large intestine):

ক্ষুদ্রান্ত্র উদরের নীচে ডানদিকে শেষ হয়েছে। এখানে পৌষ্টিক নালীর অন্যতম অংশ বৃহদন্ত্র আরম্ভ হয়েছে। দ্রবীভূত খাদ্যসামগ্রী ক্ষুদ্রান্ত্র থেকে বৃহদন্ত্রে যাওয়ার পথে আর একটি পেশীচক্রের দ্বার পার হয়; এই দ্বার সময়মতো মুক্ত ও বন্ধ হয়। যে সকল বস্তু পূর্বেই পরিপাক হয়নি, অথবা দুষ্পাচ্য অর্থাৎ

পরিপাক করা যায় না, খাদ্যসামগ্রীর সেই সকল অংশমাত্র বৃহদন্ত্রে আসে। বৃহদন্ত্র ন্যূনাধিক ৫ ফুট দীর্ঘ এবং ব্যাসে ক্ষুদ্রান্ত্রের ২।৩ গুণ বড়।

খাদ্যসামগ্রী বিশ্লিষ্ট হয়ে ক্ষুদ্রান্ত্রের ভিতরের পর্দায় কৈশিক রক্তনালী-পথে দেহে শোষিত হয়ে দেহসাৎ হয়। তারপর অবশিষ্ট তরল অংশ বৃহদন্ত্রে যায়। পরিপাক-ক্রিয়া আর এখানে হয় না, যা হবার তা ক্ষুদ্রান্ত্রেই হয়ে যায়। অবশিষ্ট দুষ্পাচ্য ও অজীর্ণ বস্তু এখানে মলরূপ ধারণ করে।

কিছু খাওয়ার পর থেকে তা বৃহদন্ত্রে আসতে চার ঘণ্টা সময় লাগে। বৃহদন্ত্রের ভিতর দিয়ে পার হয়ে **পেল্‌ভিক কোলনে পৌঁছুতে প্রায় আট ঘণ্টা সময় লাগে। অর্থাৎ, আহারের পর থেকে পেল্‌ভিক কোলনে এসে মল জমতে প্রায় ১২ ঘণ্টা সময় লাগে।** তারপর তা মলনালীতে আসে।

কেমন ক'রে খাদ্য পরিপাক হয়ঃ

খাদ্য উদরে প্রবেশ করার পর খাদ্যের শ্বেতসার লালারসে শর্করায় পরিণত হয়। গ্যাস্ট্রিক জুসে খাদ্য অম্লতাপ্রাপ্ত হ'লে, লালার কাজ বন্ধ হয়।

পাকস্থলীর রস প্রধানতঃ প্রোটিন বিশ্লিষ্ট করে ও দুগ্ধকে কিয়ৎ পরিমাণে হজম করে। খাদ্যদ্রব্য **পাকস্থলীর ভিতর এক থেকে চার ঘণ্টা পর্যন্ত থাকে।** পিত্তরস পাকস্থলীর রসের অম্লতা নাশ ক'রে অন্ত্রে তার কাজ বন্ধ ক'রে দেয়।

প্যান্‌ক্রিয়া-রসের দ্বারা শ্বেতসার শর্করায় পরিণত হয়, প্রোটিন বিশ্লিষ্ট হয় ও মেদ গাঢ় তরল অবস্থায় আনীত হয়।

খাদ্যের যে সামান্য অংশ পাকস্থলীতে সম্পূর্ণরূপে বিশ্লিষ্ট ও পরিপাক হয়, তা রক্ত-স্রোতের পথে দেহসাৎ হয়।

কিন্তু অধিকাংশ বিশ্লিষ্ট খাদ্য ক্ষুদ্রান্ত্র থেকে দেহসাৎ হয়ে থাকে। বৃহদন্ত্রের কাজ জল শোষণ করা। তা ছাড়া, এখানে পরিপাকের আর কোন কাজ হয় না।

সাধারণ শিশু-ব্যাধিঃ

শিশু-বয়সে নানা ব্যাধি দেখা দেয়—বিশেষ ক'রে কতকগুলি সংক্রামক শিশু-ব্যাধি। কাজেই জানা দরকার বিভিন্ন বয়সের শিশু-ব্যাধি কি কি, তার লক্ষণ ও প্রতিকারের উপায় কি। কারণ রোগ নির্ণয় হ'লে, তাড়াতাড়ি প্রতিষেধক ও প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা অবলম্বিত হ'তে পারে। তার ফলে ব্যক্তি ও সমাজ-স্বাস্থ্য রক্ষা পেতে পারে। এখন জানা দরকার শিশু-ব্যাধিগুলি কি? নিম্নে শিশু-ব্যাধি ও শিশু-দুর্বলতার একটা তালিকা দেওয়া গেল :—

(ক) অনভিপ্রেত অবসাদ, ক্লান্তি, মাথা-ধরা, পাণ্ডুরতা, অপরিপুষ্টি ; (খ) কৃমি, শৈত্য-জনিত ক্ষত, খোস, পাঁচড়া প্রভৃতি ; (গ) দাঁতের ক্ষয় ; (ঘ) মুখ দিয়ে

নিশ্বাস-গ্রহণ, সেপ্‌টিক টন্‌সিল এবং গলার বীচি ফোলা; (ঙ) তোতলামি, কথা বলার দোষ; (চ) সাধারণ চোখের অসুখ, দৃষ্টিক্ষীণতা; (ছ) কানপাকা, বধিরতা; (জ) সর্দি, কাশি; (ঝ) আঙ্গিক বিকৃতি—রিকেট, ফ্লাট্‌ফুট্‌, বাঁকা মেরুদণ্ড। শিশুদের এই সব ব্যাধির লক্ষণ দেখা দিলে, অবিলম্বে চিকিৎসকের দৃষ্টিগোচরে আনতে হবে। ছেলেদের মধ্যে কোন সংক্রামক ব্যাধি দেখা দিলে, তার প্রতিকার ও প্রতিষেধক ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। এ ছাড়া, বমির ভাব বা গলার ঘা থেকে শিশুদের কঠিন ব্যাধি হ'তে পারে। শিশু-দেহের ক্রমবর্ধমান ব্যথাটা যে বাতের লক্ষণ,—এ কথাটাও জানতে হবে। এ ছাড়া, অস্বাভাবিক শিশুদের দিকেও দৃষ্টি দিতে হবে।

এই অস্বাভাবিক শিশুদের চারটি শ্রেণীতে ভাগ করা চলে; যথা—(১) আঙ্গিক ত্রুটি (Physically defective), (২) বোবা ও অন্ধ, (৩) মানসিক বিকৃতি এবং (৪) মৃগীব্যাধিগ্রস্ত। মানসিক ব্যাধিগ্রস্তদের জন্য বিশেষ বিদ্যালয়ের যে ব্যবস্থা আছে, সেখানে তাদের ভর্তি করা উচিত। এ ছাড়া, অন্যান্য যে সব ত্রুটি—যেমন পিছিয়ে-পড়া শিশু, সমস্যা-শিশু, তাদের জন্য ব্যক্তিগত শিক্ষা ও যত্ন নেওয়ার বিশেষ দরকার। এ ছাড়া ভঙ্গীগত যে সব শারীরিক ত্রুটি আছে, তা সংশোধনাত্মক ব্যায়ামের দ্বারা নিরাময় করা চলে।

দৈহিক স্বাস্থ্য কিসের উপর নির্ভর করে ঃ

কিসের উপর দৈহিক স্বাস্থ্য নির্ভর করে? একজন বিখ্যাত রাশিয়ান চিকিৎসককে জনৈক ভদ্রলোক এই প্রশ্ন করেছিলেন। তার উত্তরে, তিনি যা বলেছিলেন, সেটা দীর্ঘজীবন লাভের শ্রেষ্ঠ পন্থা। তিনি স্বাস্থ্য-রক্ষার ত্রিবিধ অভ্যাসের কথা উল্লেখ করেছিলেন। তার প্রথম নির্দেশ ছিল যে, (১) প্রথমতঃ, সকল ভাবনা-চিন্তা-উৎকণ্ঠা থেকে মনটাকে মুক্ত রাখতে হবে; (২) দ্বিতীয়তঃ, প্রয়োজন নির্দিষ্ট সময়ে পরিমিত আহার্যগ্রহণ এবং (৩) তৃতীয়তঃ, দরকার উপযুক্ত বিশ্রাম। অর্থাৎ, সর্ব-ভাবনা-মুক্তি, উপযুক্ত বিশ্রাম ও নিয়মিত পরিমিত আহার—এই তিনটি ব্যবস্থার যেখানে সামঞ্জস্য ঘটে, সেখানে যে নীরোগ জীবন দীর্ঘায়িত হবে, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। শারীরিক স্বাস্থ্যের পরম শত্রু হচ্ছে চিন্তা। ভাবনা যখন জোঁকের মতো তিল তিল ক'রে দেহ-মনের সুখ-স্বস্তিকে শোষণ করে, তখন মানুষের স্বাস্থ্যে ভাঙন ধরে। নিত্য চিন্তায় যে কি পরিমাণ স্বাস্থ্যহানি ঘটে, তার একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত আছে। সেই কথাই বলি। শোনা যায় যে, রোগা হওয়ার ঔষধ যে কি, তা জানার জন্য জনৈক মারোয়াড়ী ভদ্রলোক এসেছিলেন ডাঃ রায়ের চেম্বারে। তিনি রোগীর বিপুল দেহের দিকে এক নজর চেয়ে বললেন, "আর ঔষধ দিয়ে কি হবে? তুমি তো বাপু আর বেশীদিন বাঁচবে

না। বড়জোর এক মাস তোমার মেয়াদ। কাজেই ঘরে ফিরে যাও। বেঁচে থাকলে এক মাস পরে এসো।”

তাঁর কথা শুনে তো ভদ্রলোকের চক্ষুস্থির! তিনি বিষণ্নমনে বাড়ী ফিরলেন। তারপর শুরু হ'ল তাঁর ভাবনা। স্নান-আহার-নিদ্রা মাথায় উঠল, অধীর প্রতীক্ষায় দিন গণনা শুরু হ'ল। এক মাস পরে ভদ্রলোক যখন ডাক্তারের কাছে উপস্থিত হলেন, তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা হ'য়েছে, এই কথা জানাবার জন্য, তখন দেখা গেল, ভদ্রলোকের চেহারা আধখানা হয়ে গেছে। ডাক্তার তাঁকে দেখে হাসলেন। বললেন—ঔষধে কোন ফল হবে না জেনেই, আমি আপনাকে চরম দাওয়াই দিয়েছিলাম। রোগা হওয়ার জন্য হাজার টাকার ঔষধ খেলেও যা না হ'ত, দুশ্চিন্তার দাওয়াই সেই কাজ করছে। ওজন নিয়ে দেখা গেল যে, এক মাসে তাঁর অনেক ওজন কমে গেছে। দুশ্চিন্তায় স্বাস্থ্যের যে কি ক্ষতি হয়, এটা তার একটা জলন্ত দৃষ্টান্ত।

তেমনি উপযুক্ত বিশ্রামের অভাবে, অপরিমিত আহারে স্বাস্থ্যের যথেষ্ট ক্ষতি হয়। লোভের বশবর্তী হয়ে অতিরিক্ত খাওয়া বা ক্ষুধা না থাকলেও আহার্য গ্রহণ করা উচিত নয়। স্বাস্থ্যহীন মানুষের পরিসংখ্যান থেকে জানা গেছে, বেশী খাওয়ার ফলে যত মানুষ কষ্ট পেয়েছে, যত রোগভোগ করেছে, তার সিকি পরিমাণ খেয়েও ঢের বেশী লোক নীরোগ দীর্ঘজীবন লাভ করেছে।

এ ছাড়াও, স্বাস্থ্যকর জীবন-যাপনের জন্য দরকার প্রাকৃতিক অবদান, স্বাস্থ্যকর পরিবেশ এবং বিচিত্র কৃত্রিম ব্যবস্থার। স্বাস্থ্যকর জীবন-ব্যবস্থার জন্য আনুষঙ্গিক যা-কিছুর প্রয়োজন, নিম্নে তার বিশদ বর্ণনা দেওয়া গেল :—

(ক) বিশুদ্ধ বায়ুর মূল্য ও প্রয়োজন :

স্বাস্থ্যকর সব ব্যবস্থার সঙ্গে প্রয়োজন বিশুদ্ধ আলো-বাতাসের। এই কারণে স্বাস্থ্যকর সব ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও, যারা চিরদিন ঘরে বসবাস করে, তাদের চেয়ে খোলা আলো-বাতাসে যারা থাকে, তাদের স্বাস্থ্য অনেক ভালো। শহরবাসীরা ভালো ঘরে, স্বাস্থ্যকর পরিবেশে থেকেও গ্রামবাসীদের চেয়ে বেশীদিন বাঁচতে পারে না। তাই দেখা যায়, অসভ্য পার্বত্য জাতি বা যারা বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়, তারা অটুট স্বাস্থ্যের অধিকারী। যদিও তাদের আহার্য যৎসামান্য, সভ্যতার অনেক সুযোগ থেকে তারা বঞ্চিত, তথাপি তাদের সহজ স্বাভাবিক জীবন মুক্ত আলো-বাতাসের প্রাচুর্যে স্বাস্থ্যোজ্জল হয়ে উঠে। বিশুদ্ধ বায়ু দেহে ও রক্তে যে অক্সিজেন সরবরাহ করে, যে ক্ষুধা বৃদ্ধি করে, দেহাভ্যন্তরে যে রাসায়নিক পরিবর্তন আনে, তার ফলেই তাদের স্বাস্থ্যোন্নতি ঘটে।

(খ) বিশুদ্ধ বায়ুর বিভিন্ন উপাদান :

বাতাসের মূল্যবান উপাদান হচ্ছে অক্সিজেন, বিশুদ্ধতা এবং প্রাকৃতিক উপাদান। দেহ-ত্বক যখন ঠাণ্ডা থাকে, তখন ঐ উপাদানগুলি দেহের কাজে লাগে। কিন্তু গৃহ-পরিবেশ যদি অত্যন্ত গরম, স্যাঁৎসেঁতে বা বদ্ধ বাতাসে পূর্ণ থাকে, তা হ'লে স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটে। সে পরিবেশে দেহ মোটা হয়ে যায় এবং রোগ-প্রতিষেধক ক্ষমতা কমে আসে। এইজন্য বায়ু-সঞ্চালনের বিশেষ প্রয়োজন। স্বাস্থ্যের দিক থেকে বাতাসের কৃত্রিম পরিবর্তনের চেয়ে বায়ুজ প্রাকৃতিক উপাদানের প্রয়োজন অনেক বেশী। এই কারণে বায়ু-চলাচল যত অবাধ ও ব্যাপক হবে, ততই সংক্রামক ব্যাধির বিস্তার কমে আসবে।

(গ) শরীর ও দেহকোষের উপযোগী অক্সিজেন সরবরাহ :

জীবন্ত দেহের প্রত্যেকটি কোষেই অক্সিজেন সরবরাহের প্রয়োজন। অতি নিম্ন পর্যায়ের এক-কোষবিশিষ্ট যে অ্যামিবা, সে দেহকোষের জন্য অক্সিজেনের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু উন্নত পর্যায়ের প্রাণীর, বিশেষ ক'রে মানুষের ক্ষেত্রে, বাতাসবাহী অক্সিজেনের নিত্য প্রয়োজন। মানুষের দেহে শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে প্রবিষ্ট বাতাস ফুস্‌ফুসের মাধ্যমে রক্ত-প্রবাহে মিশ্রিত হয়ে সর্বদেহে ছড়িয়ে পড়ে। এই যে সমস্ত কোষ-সমষ্টি দ্বারা মানুষের দেহ নির্মিত, তার প্রত্যেকটি কোষ বায়ুবাহী অক্সিজেনের সংস্পর্শে আসে। দেহকোষের সংস্পর্শে এসে দহন-ক্রিয়ার ফলে যে অপচয় ঘটে, যার দ্বারা কার্বন ডাই-অক্সাইড সৃষ্টি হয়, তা আবার ফুস্‌ফুসে ফিরে আসে এবং প্রশ্বাসের সঙ্গে সেই দূষিত বায়ু নির্গত হয়ে যায়। এইভাবে অক্সিজেন সরবরাহের ফলে দেহকোষ সর্বদা সজীব ও সক্রিয় থাকে।

(ঘ) বায়ু-সঞ্চালন-ব্যবস্থার প্রয়োজন :

বাসগৃহে এবং শ্রেণী-কক্ষে বায়ু-সঞ্চালন-ব্যবস্থার বিশেষ প্রয়োজন। ঘরে বা শ্রেণী-কক্ষে যেখানে একাধিক লোক থাকে, সেখানে বাতাসে যেটুকু অক্সিজেন থাকে, তা প্রতি জনের নিশ্বাস-গ্রহণের সঙ্গে যেমন খরচ হয়, তেমনি প্রশ্বাসবাহী কার্বন ডাই-অক্সাইড এসে পরিবেশের বাতাসে জমতে থাকে। ফলে, অল্পক্ষণেই ঘরের বাতাস দূষিত হয়ে যায়। এই দূষিত বাতাস যেমন গরম, তেমনি জলীয় বাষ্পাশ্রিত জীবাণুপূর্ণ। এই কারণে বসত-গৃহে, শ্রেণী-কক্ষে বায়ু-সঞ্চালনের ব্যবস্থা থাকা দরকার। বায়ু-সঞ্চালনের সুব্যবস্থার জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থার দিকে নজর দিতে হয়। যথা—(১) প্রচুর বিশুদ্ধ বায়ু প্রবেশের ব্যবস্থা রাখতে হবে; (২) এক জানালা দিয়ে বাতাস ঢুকে যাতে বিপরীত দিকের জানালা দিয়ে চলে যেতে পারে,

সে ব্যবস্থা রাখতে হবে* ; (৩) গৃহোপযোগী উত্তাপ বজায় রাখতে হবে ; (৪) বাতাসে যেন খুব কম বা বেশী জলীয় পদার্থ না থাকে ; (৫) ঘরে যখন জন-সমাগম হয়, তখন পূতিগন্ধ দূর করার ব্যবস্থা করতে হবে এবং (৬) ধূলা বা জীবাণুতে বাতাস যাতে দূষিত না হয়, তা দেখতে হবে।

(ঙ) ঘরের তাপ-নিয়ন্ত্রণ :

বিদ্যালয়ে শীত ও তাপ নিয়ন্ত্রণের কোন ব্যবস্থাই আমাদের দেশে নেই। শীত-প্রধান দেশে, বিশেষ ক'রে ইউরোপে, এর প্রয়োজন আছে। কিন্তু ভারতবর্ষের মতো গ্রীষ্মপ্রধান দেশে গরমের দিনে তাপ-নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন হ'তে পারে। শীতের দিনে দার্জিলিং, সিমলা প্রভৃতি অঞ্চলে বিদ্যালয় বন্ধ থাকে ; কাজেই সেখানে শীতের দিনে শ্রেণী-কক্ষে কৃত্রিম উত্তাপের বিশেষ প্রয়োজন হয় না। পূর্বকালে শীতের দেশে বিদ্যালয়গুলিতে যে পরিমাণ উত্তাপের প্রয়োজন হ'ত, আজ তার চেয়ে ঢের কম উত্তাপ রক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ-সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের অভিমত এই যে, ৫৬° থেকে ৮০° ফারেনহিট-ই হচ্ছে প্রয়োজনীয় তাপ, যে অবস্থায় ছেলেরা ভালো কাজ করতে পারে।

(চ) শ্বাস-গ্রহণের রীতি :

নাক দিয়েই নিশ্বাস গ্রহণ করা উচিত। গভীরভাবে শ্বাসগ্রহণ ও দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করাই স্বাস্থ্যসম্মত। নাক দিয়ে বাতাস ভিতরে প্রবেশ করার সময় পরি-শোধিত, বিশুদ্ধ হয়ে ফুসফুসে যায় ; নাকের ঝিল্লিপথে অনেক জীবাণু আট্‌কে যায়, মুখ দিয়ে নিশ্বাস নিলে রোগের জীবাণুগুলি অতি সহজেই দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করে।

হাঁচি-কাশির সময় নাকে রুমাল দেওয়ার অভ্যাস করা উচিত। আমরা সাধারণতঃ গভীর নিশ্বাস-গ্রহণে অভ্যস্ত নই ; তাই সে-অভ্যাস গঠনের জন্য মাঝে মাঝে শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যায়াম করানো উচিত।

(ছ) সূর্যালোকের প্রয়োজন :

দৈহিক স্বাস্থ্যের জন্য সূর্যালোকের যে কত প্রয়োজন, অতি আধুনিক কালেই তার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। রোদ লাগলে অসুখ করে (অবশ্য, সময়-বিশেষের রৌদ্র ক্ষতিকর) ; কাজেই, রৌদ্র সেবন বিধেয় নয়, এই ধারণা অনেকদিন বদ্ধমূল ছিল। সংস্কৃত শাস্ত্রকাররা অবশ্য বলেছেন যে, 'পৃষ্ঠেন, সেবয়েৎ অর্কম্' ; অর্থাৎ

---

* A thorough current of air to be ensured (i. e. arrangement for cross-ventilation should be made).

পৃষ্ঠের দ্বারা সূর্যালোক গ্রহণ করতে হবে। বৈজ্ঞানিকগণ বলেছেন যে, সূর্যালোক কেবল স্বাস্থ্য ও শক্তিবর্ধক নয়, জীবাণুনাশকও বটে। মাথায় টুপি দিয়ে ছেলেরা যদি রৌদ্রে খেলা করে, তাতে কোন ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা নেই, বরং তাতে তাদের উপকার-ই হবে। বাসগৃহে যত পর্যাপ্ত আলো আসে, ততই ভালো। গ্রামের তুলনায় জনবহুল শহরে অবাধ সূর্যালোক পাওয়ার অনেক অসুবিধা আছে। সূর্যের আল্ট্রা-ভাইলেট রশ্মি শরীরের পক্ষে বিশেষ উপকারী। ক্ষত-চিকিৎসা ও অন্যান্য ব্যাধিতে এই রশ্মি মানব-দেহের অমূল্য ঔষধ-স্বরূপ।

(জ) ধোঁয়ায় কি ক্ষতি হয়ঃ

ধোঁয়া বাতাসকে দূষিত এবং গৃহ-পরিবেশকে নোংরা করে। ধোঁয়া-মিশ্রিত বাতাসে ফুস্‌ফুসেরও ক্ষতি হ'তে পারে। বড় শহর বা শিল্পাঞ্চলে যেখানে ঘন বসতি, সেখানকার পরিবেশ—সকাল-সন্ধ্যায়—যেন প্রায় ধোঁয়ায় সমাচ্ছন্ন থাকে। শীতের সন্ধ্যায় কলকাতা শহর এমন ধোঁয়ার মেঘে ঢেকে যায় যে, দূরে দৃষ্টি চলে না। পথ চলতে চলতে ধোঁয়ায় চোখ জ্বালা করে। সেই দম-আট্‌কানো পরিবেশে দীর্ঘদিন বসবাস করলে যে ফুস্‌ফুসের ক্ষতি হবে, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ধোঁয়ার মধ্যে কার্বন, অ্যাসিড এবং আলকাতরা-জাতীয় এমন সব পদার্থ আছে, যা শাক-সব্‌জি জন্মাতে দেয় না, এবং ফুস্‌ফুসের ক্ষতি করে। ঘর-দোরও ঝুলে বিবর্ণ এবং নোংরা হয়।

(ঝ) উন্মুক্ত বিদ্যালয়ের প্রকৃতি (Open air School):

উন্মুক্ত পরিবেশের বিদ্যালয়কে অনেকে বলেছেন 'প্রকৃতি-নিকেতন'। খোলা আকাশের নীচে গাছের তলায় যে বিদ্যালয় বসে, সে বিদ্যালয়ের ছাত্রদের দেহ-মন ভরে ওঠে প্রকৃতির অবদানে। আনন্দ-কৌতূহলে সহজ স্বাভাবিক পথে তাদের শিক্ষা চলে। এই কারণে পাশ্চাত্য দেশের শিক্ষাবিদ্‌রা প্রত্যেকটি 'প্রকৃতি-নিকেতন'কে 'আরোগ্য-নিকেতন'-এ রূপান্তরিত করেছেন। সেখানকার উন্মুক্ত বিদ্যালয়গুলিতে ভর্তি করা হয় এমন সব ছাত্রদের, যারা রুগ্ন, শীর্ণ, ক্ষীণ, দুর্বল, অথবা যাদের কোন-না-কোন আঙ্গিক ত্রুটি-বিচ্যুতি আছে। স্বাভাবিক সুস্থ ছাত্রদের সঙ্গে যে দুর্বল শিশুরা সমতালে অগ্রসর হ'তে পারে না, এখানে সেই সব শিশুর উপর ব্যক্তিগত নজর দেওয়া হয়। প্রয়োজনবোধে তাদের দেখাশোনা ও চিকিৎসার ব্যবস্থাও করা হয়। এখানে এসে প্রকৃতির কল্যাণে, শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে যেসব ছাত্র স্বাভাবিক স্বাস্থ্য ফিরে পায়, তাদের আবার সাধারণ বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করবার জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হয়। কেমন ক'রে সুস্থ জীবন-

যাপন করা যায়, মূলতঃ সেখানে এই শিক্ষা দেওয়ারই ব্যবস্থা আছে। এই ধরনের বিদ্যালয়ের শিক্ষণ-পদ্ধতির নিম্নলিখিত সাতটি বৈশিষ্ট্য আছে :—

(১) যতদূর সম্ভব ছাত্রদের বিশুদ্ধ বায়ু ও পর্যাপ্ত সূর্যালোকের মধ্যে রাখার ব্যবস্থা করা। (২) পর্যাপ্ত এবং উপযুক্ত খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা করা। (৪) প্রত্যহ মধ্যাহ্নে এক ঘণ্টা বিশ্রামের ব্যবস্থা থাকা। (৪) স্বাস্থ্যকর জীবন-যাপন—খাওয়া-দাওয়া, স্নান প্রভৃতির পন্থা নিরূপণ করা। (৫) বিশেষ শিক্ষা-পদ্ধতির—প্রকৃতি-পর্যবেক্ষণ, বাগানের কাজ, দৈহিক শ্রম –ব্যবহারিক প্রয়োজন। (৬) শিশু-দুর্বলতা দূরীকরণের বা সংশোধনের ব্যবস্থা। (৭) ডাক্তার ও ধাত্রীদের পর্যবেক্ষণ-পরীক্ষা ও সেবার সুব্যবস্থা থাকবে।

---

(২) পরিচ্ছন্নতা

(ক) স্বাস্থ্যকর জীবন-যাপনের ভিত্তি :

স্বাস্থ্যকর জীবনের প্রথম স্তর ব্যক্তিগত এবং সামাজিক পরিচ্ছন্নতা। শিশুদের অভ্যাস ও আচরণগত পরিচ্ছন্নতাই তাদের ব্যক্তিগত জীবন ও পারিপার্শ্বিক পরিবেশকে উপভোগ্য ও মনোরম ক'রে তোলে। পক্ষান্তরে, অপরিচ্ছন্নতাই প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ-ভাবে নানা ব্যাধির কারণ। দুর্ভাগ্যবশত: আমাদের দেশের গ্রাম্য অভিভাবকদের আদৌ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকার অভ্যাস নেই। ফলে, মাতাপিতার সেই নোংরা থাকার অভ্যাস তাদের সন্তানদের মধ্যেও বিশেষভাবে দেখা যায়। সেজন্য শিশুদের ব্যক্তিগত অভ্যাসের একান্তভাবে পরিবর্তনের দরকার। এজন্য সর্বদা লক্ষ্য রাখতে হবে—ছাত্ররা যেন ময়লা কাপড়, নোংরা হাত এবং মলিন মুখে বিদ্যালয়ে না আসে।

এখানেই শিক্ষকদের লক্ষ্য রাখতে হবে, নোংরা থাকাটা কোন্ কোন্ শিশুর স্বভাবগত অভ্যাস এবং কোন্ কোন্ ছাত্রদের কখনো কখনো নোংরা থাকতে দেখা যায়। নোংরা থাকাটা যাদের স্বভাবগত অভ্যাস, তাদের দিকে বিশেষ নজর দিতে হবে। নোংরা থাকাটা যাদের স্বভাব নয়, তাদের সে মনো-ভাবের পরিবর্তন করা সহজসাধ্য। **কিন্তু সেটা যাদের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে, তাদের চোখে চোখে রেখে সে অভ্যাসের পরিবর্তন করতে হবে।**

(খ) অপরিচ্ছন্নতার দোষ :

দৈহিক অপরিচ্ছন্নতা থেকে নানা চর্মরোগ হ'তে পারে। ত্বক্ পরিষ্কার হ'লে লোমকূপ দিয়ে স্বেদ নির্গত হ'তে পারে না। শুধু তাই নয়, কোন কারণে একটু কেটে গেলে, বা শরীরের কোথাও একটু ছড়ে গেলে, ক্ষতস্থান বিষিয়ে উঠতে পারে। এমনকি সেই বিষাক্ত ক্ষত থেকে রক্ত পর্যন্ত দূষিত হ'তে পারে। দৈহিক অপরিচ্ছন্নতা থেকেই খোস, পাঁচড়া, চুলকানি প্রভৃতি নানাবিধ চর্মরোগ হয়। নোংরা দেহ থেকে দুর্গন্ধ নির্গত হয়। এতে শ্রেণী বা শয়ন-কক্ষে বসা যায় না। নোংরা হাত বা নখ থেকে খাবারের সঙ্গে নানা রোগের জীবাণু উদরে প্রবেশ করতে পারে। নাক, কান, চোখ, দাঁত প্রভৃতি অপরিষ্কার থাকলে, নাকে ঘা, কানে পুঁজ, চোখের পাতায় ঘা এবং দাঁতের অসুখ করতে পারে। অপরিষ্কার দাঁতের গোড়ায় খাদ্যের টুকরো অংশ পচে যে বিষাক্ত রসের সৃষ্টি করে, তাতে কেবল যে হজমের ব্যাঘাত ঘটে তা নয়, অগ্নিমান্দ্য, কোষ্ঠকাঠিন্য এবং আরও নানাপ্রকার উদর-পীড়ার সৃষ্টি হ'তে পারে। কোষ্ঠকাঠিন্য-জনিত অপরিষ্কার উদরই বহু ব্যাধির কারণ।

(গ) সমাজ-জীবনে অপরিচ্ছন্নতার প্রভাব :

যে পরিবেশে আমরা বাস করি, সেই পরিবেষ্টনী যদি নোংরা থাকে, তাহ'লে নিম্নলিখিত কারণে সমাজ-স্বাস্থ্যের ক্ষতি হ'তে পারে। পরিবেশের পচা আবর্জনা, আঁস্তাকুড়, মাছির জন্মস্থান—জীবাণুর আস্তানা। সেই নোংরা স্থান থেকে এসে মাছি যখন আমাদের আঢাকা খাদ্যে, দুধে, কাটা ফল-মূলে বসে, তখন মাছিবাহী অনেক রোগের জীবাণু আমাদের খাদ্যের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে যায়। কলেরা, বসন্ত, যক্ষ্মা প্রভৃতি ব্যাধি মাছির দ্বারাই সংক্রামিত হয়। বদ্ধ পচা জলাশয়ে যে মশার বংশবৃদ্ধি হয়, তার দ্বারা ম্যালেরিয়া প্রভৃতি রোগ গ্রামের সর্বত্র ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে।

অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের ধূলাবালি, ধোঁয়া বাতাসকে দূষিত করে, সূর্য-রশ্মিকে প্রতিহত করে, সেখানকার নোংরা পরিবেশে সংক্রামক ব্যাধি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। অপরিচ্ছন্নতার দোষে গ্রাম্য পরিবেশ এমনিভাবে দুর্বিষহ এবং চির-নিরানন্দময় হ'য়ে উঠতে পারে।

(৩) ব্যায়াম ও বিশ্রাম

(ক) সাধারণ ব্যায়ামের মূল্য :

অল্প-বিস্তর ব্যায়ামের প্রয়োজন সব বয়সেই। বিশেষ ক'রে শিশু-দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বড় পেশীগুলির জন্য। এই পেশীর ব্যায়াম বা অঙ্গ-সঞ্চালনের প্রয়োজন

শিশু-দেহের ক্রমবৃদ্ধির জন্য। এটা তার দেহ এবং মনের ক্ষুধা। ব্যায়াম দেহ-পেশীকে শক্তিশালী করে, দেহের পুষ্টির সঙ্গে মগজ বৃদ্ধি পায়—দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে ত্বক্ দিয়ে স্বেদ নির্গত হয়, রক্ত-সঞ্চালন বৃদ্ধি পায়, ফুস্‌ফুস্ সক্রিয় হয়; দৈহিক ক্ষয়-অপচয় পূরণ ও নিবারণের জন্য পরিপাক-যন্ত্র স্বভাবতঃই বেশী পরিমাণ খাদ্য-সার সংগ্রহ করে। এইভাবে ব্যায়াম ও বিশ্রামের মাধ্যমে যখন সমস্ত দৈহিক কাজের মধ্যে একটা সমতা আসে, তখনই আমরা সুস্থ, সবল, নীরোগ দেহ লাভ করি।

(খ) চিত্ত-বিনোদনের ব্যবস্থাঃ

শরীরের সঙ্গে মনেরও পরিচর্যা দরকার। ব্যায়ামের সঙ্গে যখন আনন্দ যুক্ত হয়, তখন শ্রম-অবসন্ন দেহ-মন বিশ্রামের ফাঁকে ফাঁকে যেন মুক্তির স্বাদ পায়। সেই পরিতৃপ্তিতে যখন শিশুর দেহ-মন ভরে উঠে, তখন কোন ক্লান্তিই শিশুকে স্পর্শ করতে পারে না। এইজন্য কাজের সঙ্গে শিশুরা চায় অকাজকে, ব্যায়ামের সঙ্গে বিশ্রামকে এবং অবকাশকে চায় চিত্ত-বিনোদনের আনন্দে ভ'রে তুলতে। এইজন্য অবকাশ বিনোদনের উপায় উদ্ভাবনের একান্ত প্রয়োজন। শিশুরা যাতে আনন্দ পায়, তার জ্ঞান ও কৌতূহল চরিতার্থ হয়, সেটাই শিশুদের সত্যিকার স্বাস্থ্যানুশীলন বা শারীরিক শিক্ষা। নিম্নলিখিত উপায়ে তা করা সম্ভব ব'লেই একজন শিক্ষাবিদ্ চিত্ত-বিনোদনের পথ ব'লে দিয়েছেন। সেগুলি হচ্ছে যথাক্রমে **বেড়ানো, বই পড়া, চিড়িয়াখানা ও জাদুঘর পরিদর্শন**; অথবা **চলচ্চিত্র দেখা** ইত্যাদি। এ ছাড়া, ঘরে ও বাইরে আরও বিচিত্র ধরনের আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা অবলম্বিত হ'তে পারে। যেমন সাংস্কৃতিক বিচিত্র অনুষ্ঠান, পাঠচক্র, নৃত্যগীত, সৃজনাত্মক শিল্পকাজ প্রভৃতি।

(গ) নিয়ন্ত্রিত শরীর-চর্চাঃ

ব্যায়াম শিশুদের দৈহিক বিকাশে সহায়তা করে। তাদের দৈহিক ও মানসিক প্রয়োজনেই যে ব্যায়ামের দরকার, সেই ব্যায়াম শারীরিক অনুশীলন, দৈহিক কর্ম-তৎপরতা অর্জন এবং পেশীর পরিপুষ্টির জন্যই নিয়ন্ত্রিত বা সুপরিকল্পিত হওয়া উচিত। দেহের সামগ্রিক উন্নতির জন্যই নিয়ন্ত্রিত ব্যায়াম প্রয়োজন। সুপরিকল্পিত ব্যায়ামের দ্বারা দৈহিক উন্নতি, আঙ্গিক ত্রুটির সংশোধন হয় এবং সহজেই আত্ম-সংযমের, শক্তি-শৃঙ্খলা-বোধ প্রভৃতি জাগ্রত হয়। তা ছাডা, যে-কোন পরিস্থিতির প্রয়োজনে দেহ-মন যে সক্রিয়ভাবে সাড়া দিতে পারে, সেটাও নিয়মিত ব্যায়ামের সুফল। হাঁটা, বসা ও চলাফেরার অভ্যাসের দোষে বিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে ভঙ্গীগত যে-সব দোষ-ত্রুটি (যেমন—শিরদাঁড়া বাঁকা, কুঁজো ভাব, ঘাড় বাঁকা, পায়ের দোষ প্রভৃতি) দাঁড়ানো বা বসার জন্য দেখা দেয়, সংশোধনাত্মক ব্যায়ামের দ্বারা সেগুলির সংস্কার করা যায়। দৌড় বা সাঁতার প্রতিযোগিতায় অতিরিক্ত শ্রমজনিত যে ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা আছে,

নিয়মিত ব্যায়ামে সে ধরনের কোন ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা নেই। এইজন্য ব্যায়ামকে বলা হয় **বিকলাঙ্গ শিশু-দেহের টনিক**, তার চিকিৎসার **সুসঙ্গত প্রাকৃতিক পদ্ধতি**।

(ঘ) নিদ্রা ও বিশ্রামের সু-অভ্যাস :

শিশু-দেহের জন্য যেমন প্রয়োজন কাজের, তেমনি দরকার বিশ্রামের। শিশুর দেহ যখন বেড়ে উঠছে, তার দেহ-মনে যখন অস্থিরতার চাঞ্চল্য, তখনই সেই অনুপাতে দরকার দীর্ঘ বিশ্রামের। ঘুম বা বিশ্রামের পরিবেশ যত শান্ত নির্জন হবে, ততই বিশ্রামের দ্বারা শিশুর দেহ-মন্ উপকৃত হবে। সব শিশুদের গৃহে কিন্তু উপদ্রবহীন বিশ্রামের সুযোগ মেলে না। ফলে, সেই গোলমাল-মুখরিত পরিবেশে শিশুদের কেবল নিদ্রার ব্যাঘাত হয় না, তার মানসিক ক্ষতিও হ'তে পারে। তাই লণ্ডনের পল্লী-সমিতি সম্প্রতি স্বাস্থ্য-বিদ্যা সম্পর্কে এই মতবাদ প্রচার করেছেন, যে বিশ্রাম শিশুর দেহ-মনের বিকাশকে অক্ষুণ্ণ রাখে এবং তার মানসিক সামর্থ্য ও সস্কৃতিকে বজায় রাখে, সেই শিশুদের জন্য প্রয়োজন 'Early to bed and a long night's rest.' বিশ্রামের এই সু-অভ্যাস যাতে আপনা থেকেই ছেলেদের মধ্যে গড়ে উঠে, সেদিকে বিশেষ নজর দিতে হবে। যেখানে গৃহ-পরিবেশের অবস্থা অনুকূল নয়, তার প্রতিকারের জন্য অভিভাবকদের সঙ্গে শিক্ষকদের সহযোগিতা করতে হবে। মিতাহার-ই সুখনিদ্রার সহায়ক। লণ্ডন পল্লী-সমিতিই তাই বলেছেন—'Healthy sleep cometh of moderate eating.'

(৪) তাপ ও পোশাক-পরিচ্ছদ

(ক) দেহের তাপ :

সুস্থ দেহের জন্য কি পরিমাণ দেহ-তাপের প্রয়োজন, সেটা শিশুদের বুঝিয়ে দেওয়া উচিত। সেজন্য জানা দরকার কেমন ক'রে দেহ-তাপের সৃষ্টি হয় এবং কেমন ক'রে সেই দেহ-তাপের সমতা রক্ষা করা যায়। দৈহিক তাপ রক্ষার জন্য প্রয়োজন খাদ্য, ব্যায়াম এবং বস্ত্রাদি। যে প্রাণীর দেহের রক্ত ঠাণ্ডা, সেই প্রাণীর সঙ্গে মানুষের বা অন্য জীবজন্তুর—যাদের রক্ত গরম—পার্থক্য কি, ঋতুভেদে দেহ-তাপের কি প্রয়োজন এবং কেমনভাবে তা সংরক্ষণ করা যায়, এ-বিষয়েও শিশুদের জ্ঞান দান করতে হবে। তা হ'লে শিশুরা বুঝতে শিখবে, কোন্ ঋতুতে কি ধরনের বস্ত্রের প্রয়োজন। গ্রীষ্মকালে গরম দেশে অতিরিক্ত বস্ত্রের তেমন কোন প্রয়োজন

নেই, কিন্তু শীতপ্রধান দেশে উপযুক্ত গরম বস্ত্র না হ'লে নানাপ্রকার অসুখ-বিসুখ হ'তে পারে। এই কারণে ঋতুভেদে বস্ত্র-পরিবর্তনের প্রয়োজন আছে।

(খ) স্বাস্থ্যোপযোগী পরিচ্ছদ পরিধান :

আমরা সাধারণতঃ রঙচঙে চটকদার জামা-কাপড় ছেলেদের কিনে দেই। রঙিন জামা ছোট-বড় সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে ; কিন্তু সেটা ঋতু-উপযোগী কিনা, সে পরিচ্ছদ প'রে ছেলেমেয়েরা স্বস্তি পায় কিনা, তা আমরা কেউ ভেবে দেখি না। ধূলা, বালি, তাপ থেকে দেহকে রক্ষা করাই বস্ত্রের কাজ ; আর পরিচ্ছদের প্রয়োজন দেহ-তাপ রক্ষা করার জন্য। কোন্ বস্ত্র শিশু-স্বাস্থ্যের উপযোগী, কখন কোন্ পরিচ্ছদ পরা উচিত, শিক্ষকরা অতি সহজেই ছেলেদের তা বুঝিয়ে দিতে পারেন। শিশুদের পরিচ্ছদ সাদাসিধে, পরিষ্কার, রঙিন এবং ঢলঢলে হওয়া উচিত। গরমের দিনে অতিরিক্ত আঁটো জামা ছেলেদের পরানো উচিত নয়। অপেক্ষাকৃত বয়স্ক ছেলে-মেয়েদেরও এ শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে। শয়নকালে এমন বস্ত্র পরিধান করা উচিত নয়, যাতে শ্বাস-প্রশ্বাসের কোন ব্যাঘাত ঘটে। সৌখিন মায়েরা অনেক সময় ছেলেমেয়েদের অতিরিক্ত জামা-কাপড় পরিয়ে পুতুল সাজান, সে প্রসাধনের অত্যাচারে ছেলেমেয়েরা অকারণ অস্বস্তি ভোগ করে ; শিশু-স্বাস্থ্যের দিক থেকে সেটা আদৌ বাঞ্ছনীয় নয়।

(গ) ছেলেমেয়েদের পরিচ্ছদ :

সব দেশেই ছেলেমেয়েদের পোশাক পৃথক। গ্রীষ্মপ্রধান ও শীতপ্রধান দেশের মধ্যেও পরিচ্ছদের বিভিন্নতা দেখা যায়। দেশের আবহাওয়ার উপরই পোশাক নির্ভর করে। পাশ্চাত্য দেশে বর্তমানে মেয়েরা যে ধরনের পোশাক পরে, তাকে প্রয়োজনোপযোগী এবং স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান-সম্মত ব'লে স্বাস্থ্যবিদ্‌রা অভিহিত করেছেন। যে পোশাক খুব আঁটো এবং যা জলে ধোয়া যায় না, আজকাল তা ব্যবহারের রেওয়াজ নেই। অনুরূপভাবে, গলাবন্ধ টাই-ও ছেলেরা আর তেমন ব্যবহার করে না।

গ্রীষ্মপ্রধান দেশে গরমকালে হাফ্‌সার্ট ও হাফ্‌প্যাণ্ট ছেলেদের উপযুক্ত পোশাক। গৃহে থাকাকালীন এদেশে দেহাবরণের তেমন প্রয়োজন হয় না। কিন্তু শীতপ্রধান দেশে কোন অবস্থাতেই খালি গায়ে থাকাটা নিরাপদ নয়। এদেশের পর্দানশীন মেয়েরা (বিশেষ সম্প্রদায়ের) যে বোরকা ব্যবহার করে, তা আদৌ স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান-সম্মত নয়। প্রাকৃতিক অবদান থেকে কোন অবস্থায় দেহকে অমনভাবে ঢেকে রাখাটা কখনই উচিত নয়। শীতকালে যখন অতিরিক্ত শীতবস্ত্রের প্রয়োজন হয়, তখন উলের তৈরী সোয়েটার বা পুলওভার পরাই বিশেষ আরামপ্রদ এবং স্বাস্থ্যকর

পোশাক। শীতপ্রধান দেশে অবশ্য শীতের দিনে জুতো, মোজা, মাফলার এবং ওভার-কোটের প্রয়োজন হয়। আমাদের দেশে সর্বদা জুতো পায়ে দেওয়ার দরকার হয় না এবং তা বিধেয়ও নয়। কখনো ছোট জুতো পায়ে দেওয়া ঠিক নয়, তাতে খুঁড়িয়ে চলার দরুন ছেলেমেয়েদের পায়ের গঠন বিকৃত হ'তে পারে। চীন দেশের মেয়েদের পা অসম্ভব ছোট করার জন্য লোহার জুতো ব্যবহৃত হ'ত; তার ফলে বয়সকালে তারা প্রায় চলচ্ছক্তিহীন হয়ে পড়ত। সে ব্যবস্থাকে পোশাক-পরিচ্ছদের নামে দৈহিক শাস্তিই বলা চলে।

(ঘ) বস্ত্র-পরিবর্তন ঃ

সরাসরি যে বস্ত্র দেহ-চর্মের সংস্পর্শে থাকে, তা গ্রীষ্মকালে এক বা দুই দিন অন্তর এবং শীতপ্রধান দেশে সপ্তাহে একবার বদল করা বিশেষ দরকার। কিন্তু সেদিকে অনেকের কোন লক্ষ্যই থাকে না। অনেক সময় আদ্দির জামা পাঞ্জাবি প'রে আমরা ফিট্‌ফাট্ বাবু হই, অথচ সেই ফর্সা পাঞ্জাবি ও ধুতির নীচে থাকে এমন ময়লা গেঞ্জি এবং আণ্ডারওয়ার, যা ভদ্রসমাজে বের করা যায় না। সেটা ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকর। বল খেলা বা ব্যায়াম করার পর যখন সমস্ত জামা, জার্সি বা গেঞ্জি ঘামে ভিজে যায়, তখন সেই পোশাক খুলে ফেলে, তোয়ালে দিয়ে গায়ের ঘাম মুছে অন্য জামা পরা উচিত। বর্ষার দিনে যখন বৃষ্টির জলে হঠাৎ আমাদের জামা-কাপড় ভিজে যায়, তখন অধিকক্ষণ সেই ভিজে কাপড়ে থাকা উচিত নয়। তাতে শুধু যে দেহের উত্তাপ কমে যায়, আমরা অস্বস্তি বোধ করি তা নয়, সেই জল বুকে পিঠে বসে সর্দি-কাশি, এমনকি জ্বর পর্যন্ত হ'তে পারে। এইজন্য ভিজে কাপড় অতি সত্বর ছেড়ে ফেলা উচিত। সপ্তাহে দুবার (কমপক্ষে একবার) জামা-কাপড় বদল করা উচিত।

(৫) চোখের যত্ন

(ক) দৃষ্টিশক্তির যত্ন ঃ

দেহের আলো হচ্ছে চোখ। এর সাহায্যেই আমাদের দেখা-জানা-পাওয়া-চলাফেরা—সব-কিছুই চলে। এহেন যে চক্ষুরত্ন, তার যত্ন নেওয়া একান্ত কর্তব্য। শিশুদের যে চোখ অপরিণত, যে চোখ ক্রমশঃ তৈরি হয়ে উঠছে, অল্প কারণেই সেই চোখের ক্ষতি হ'তে পারে। কম বা বেশী আলোতে, দেখার দোষে, চোখ ধাঁধানো রঙে, লিখন-পঠনের পক্ষে অসুবিধাকর দ্রব্যের ব্যবহারে, বইয়ের উপর ঝুঁকে প'ড়ে অনেকক্ষণ ধ'রে পড়লে শিশুদের চোখ খারাপ হ'তে পারে। চোখের

ব্যবহার ও পর্যায়ক্রমে বিশ্রাম-ই দৃষ্টিশক্তিকে প্রখর রাখে। বৈজ্ঞানিক, শিল্পী এবং কারিগররা সেই প্রখর দৃষ্টি ও পর্যবেক্ষণ শক্তিকে কাজে লাগিয়েই স্বনামধন্য হয়েছেন। চোখের প্রয়োজন যে কত, তার ব্যবহার যে কত বিচিত্র, এটাই বার বার ছেলেদের বুঝিয়ে দিতে হবে। এইভাবে তাদের মনে একটা বদ্ধমূল ধারণা জন্মে দিতে হবে যে, তারা যেন আজীবন চোখের যত্ন নিতে শেখে। শিশুরা যেখানে থাকবে, সেখানে যেন দিনের বেলায় জানালা দিয়ে পর্যাপ্ত আলো আসতে পারে, তার ব্যবস্থা রাখতে হবে। পড়াশুনা করার সময় যাতে বাঁদিকের পিছন থেকে আলো আসে, তার ব্যবস্থা করতে হবে। খারাপ-ছাপা বই ছেলেদের পড়তে দেওয়া উচিত নয়। চোখ-ধাঁধানো উজ্জ্বল আলোয়, অথবা কম আলোয় নাকের ডগায় বই রেখে পড়া অনুচিত। সূর্যের দিকে কখনও চাওয়া উচিত নয়। এ ছাড়া, ছেলেদের নির্দেশ দিতে হবে যে, (ক) যখনই পড়তে বা লিখতে, বোর্ডের লেখা পড়তে এতটুকু অসুবিধা হবে, তখনই তা শ্রেণী-শিক্ষককে জানাতে হবে। (খ) ডাক্তারে চশমা নেওয়ার উপদেশ দিলে অবিলম্বেই চোখ পরীক্ষা করিয়ে চশমা নিতে হবে। চোখ পিটপিট করা, চোখ রগড়ানো, মাথা ধরা প্রভৃতিই হচ্ছে দৃষ্টিক্ষীণতার প্রাথমিক লক্ষণ। মুখের কাছে বই নিয়ে বিছানায় শুয়ে কখনো বই পড়া উচিত নয়। চোখের সামান্যতম অসুবিধা দেখা দিলে, ডাক্তার দেখানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

(খ) শ্রবণ-সতর্কতা ঃ

চোখের পরই শ্রবণ ইন্দ্রিয়ের কাজ। দেখে আর শুনে শিশুরা শেখে। কাজেই, শিশুদের শ্রবণ-শক্তি যাতে প্রখর থাকে, সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে। তাই প্রথমেই জানা দরকার, কি কি কারণে শিশুদের কানের দোষ হ'তে পারে। কখনও আকস্মিক দুর্ঘটনায়, কখনও বা কর্ণপীড়া বা অন্য কোন ব্যাধি থেকে শিশুদের শ্রবণেন্দ্রিয় খারাপ হ'তে দেখা যায়। প্রায় দেখা যায় যে, ছোটরা নাকে বা কানে নানান্ ফুলের বীচি, সরু কাঠি ইত্যাদি ঢুকিয়ে ফেলে, কখনও মারামারি করার সময় একজন অন্যের কানে সজোরে আঘাত করে ; তার ফলে কর্ণপটহ যখনই ছিন্ন হয়ে যায়, তখনই হয়তো ছেলেরা শ্রবণ-শক্তি হারায়। কোন কোন ব্যাধির পরিণামেও কানের দোষ হ'তে দেখা যায়। কানে ময়লা বা খোল জমলে, অনেকেই তা বের করার জন্য লোহার কাঁটা, সরু কাঠি, কলম, পেন্সিল প্রভৃতি দিয়ে কান পরিষ্কার করার চেষ্টা করে ; তার ফলে অনভ্যস্ত হাতের খোঁচা লেগে কর্ণপটহের ক্ষতি হ'তে পারে। কান পরিষ্কার করানোর যদি প্রয়োজনই হয়, তবে ডাক্তারের সাহায্য নেওয়াই ভালো। অনেক সময় ছেলেদের কানে পুঁজ

হয়, কান পাকে ; দীর্ঘদিন তার কোন চিকিৎসা না হ'লে পরিণামে কান খারাপ হ'তে পারে। আরও মনে রাখতে হবে যে, কানের সঙ্গে নাক ও গলার সংযোগ আছে। কাজেই, একটি পথ রুদ্ধ হ'লে, সেই বধিরতার ফলে অন্য দুটি অংশেও ক্ষতি হ'তে পারে।

(গ) দৃষ্টি ও শ্রবণ শক্তির পরীক্ষা ঃ

কেমন ক'রে শ্রবণ ও দৃষ্টি শক্তির পরীক্ষা করা যায়, সে প্রক্রিয়াগুলি শিশুদের দেখিয়ে দিলে, তারা যখন নিজ নিজ দৃষ্টি ও শ্রবণ শক্তির পরিচয় পাবে, তখন তারা কান ও চোখের যত্ন নিতে সচেষ্ট হবে। বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের দ্বারা নিয়মিত এই পরীক্ষা করানোর পর ছাত্রদের স্বাস্থ্য-পত্রে তার ফলাফল লিপিবদ্ধ করলে ভালো হয়। পরীক্ষায় ধরা পড়ার আগে যাদের শ্রবণ ও দৃষ্টি শক্তি ক্ষীণ ছিল, নিয়মিত যত্ন নেওয়ার পর দেখা যাবে যে, তাদের কিছুটা উন্নতি হয়েছে। কানে ব্যথা, চোখে ঠাণ্ডা লাগা, চোখ দিয়ে জল পড়া, অথবা কানে পুঁজ হ'লে অবিলম্বে তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। একটি কানে কম শুনতে পেলে, শ্রেণী-শিক্ষককে তা সত্বর জানাতে হবে। শোনা বা দেখার এতটুকু অসুবিধা হ'লে কখনই অবহেলা করা উচিত নয়। ঘুম থেকে উঠে এবং রাত্রে শুতে যাওয়ার আগে রোজ ঠাণ্ডা জলে চোখ ধোয়া উচিত।

(৬) দাঁতের যত্ন

শিশু বয়সে ছেলেরা দাঁতের মর্যাদা বোঝে না। দাঁত খারাপ হ'লে তার পরিণাম যে কি, তা শিশুদের বোঝানো মুশ্‌কিল। ছোটবেলায় সাধারণতঃ দাঁত ভালো থাকে ; এইজন্য দাঁতের অসুখ থেকে যে পেটের ব্যাধি হ'তে পারে, একথাটা যেন কিছুতেই শিশু-মনে রেখাপাত করে না। এই কারণে ছেলেদের দাঁত পরীক্ষা ও পরিদর্শন করার সঙ্গে সঙ্গে দাঁত মাজার মহড়ার ব্যবস্থা করা দরকার। সপ্তাহে একদিন সমস্ত শ্রেণীর ছাত্রদের নিয়ে মাজন, ব্রাশ বা দাঁতন দিয়ে দাঁত মাজানোর ব্যবস্থা করতে হবে। দাঁত মাজা শেষ হ'লে দেখতে হবে, কার দাঁত কেমন পরিষ্কার হ'ল, কার দাঁত অপেক্ষাকৃত অপরিষ্কার রইল,—এ সমস্তই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে হবে। অপেক্ষাকৃত বয়স্ক ছেলেমেয়েদের দাঁতের গঠন-প্রক্রিয়া এবং তার প্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য যা-কিছু আছে, তা জানিয়ে দিতে হবে।

(ক) দন্ত-ক্ষয়ের পরিণাম ঃ

প্রথমতঃ, দাঁতের ব্যাধি ও দন্ত-ক্ষয় যে কি, তার পরিণাম কত ভয়াবহ হ'তে পারে, ছেলেদের ভালো ক'রে সেটা বুঝিয়ে দিতে হবে।

দ্বিতীয়তঃ, প্রথম অবস্থায় দন্ত-ব্যাধির কোন লক্ষণ (যেমন দাঁতের ব্যথা, ক্ষয়, বিকৃতি প্রভৃতি) ধরা পড়ে না।

তৃতীয়তঃ, একবার দাঁতের ক্ষয় আরম্ভ হ'লে, অন্যান্য দাঁত যে ক্ষতিগ্রস্ত হবে, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কাজেই, কোন ব্যাধির লক্ষণ দেখা দিলে, অবিলম্বে দাঁতের যত্ন নিতে হবে।

দাঁতের যে ক্ষয় আরম্ভ হয়েছে, সেটা নিম্নলিখিত ত্রিবিধ লক্ষণ থেকে জানা যেতে পারে। যথা—

(১) ব্যথা—দাঁত খারাপ হওয়ার প্রথম লক্ষণ দাঁতের ব্যথা। গোড়ার দিকে অবশ্য এধরনের কোন উপসর্গ থাকে না ; দাঁতের যখন কিছুটা ক্ষয় আরম্ভ হয়েছে, তখনই মাড়ি ফোলা এবং দাঁতের গোড়ায় ব্যথা হ'তে আরম্ভ করে। (২) কোন কারণে একটি দাঁত খারাপ হ'লে সমস্ত দাঁতের পাটিরই ক্ষতি হ'তে পারে। (৩) একটি দাঁত পড়ে গেলে মুখের সৌন্দর্য-হানি হ'তে পারে। দাঁতের অযত্ন হ'লে একটি খারাপ দাঁত থেকে সমস্ত দাঁত-ই একে একে যে নষ্ট হবে, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

দাঁত না থাকার অসুবিধা :—আহার্য ভালো ক'রে চিবানো যায় না ; ফলে, হজমের গোলমাল হয়। তা থেকে মাথা ধরা, পেট ব্যথা করা, রক্তশূন্যতা এবং আনুষঙ্গিক আরও অনেক উপসর্গ দেখা দেয়। ফলে, দেহ-মনের স্বাস্থ্য ও শান্তি নষ্ট হ'তে পারে।

(খ) দন্ত-রক্ষা :

দাঁতের জন্য যে যত্ন নেওয়ার প্রয়োজন,—যতদিন শিশুদের মধ্যে সে সম্পর্কে চেতনা না আসবে, ততদিন দাঁত সম্পর্কে শত বক্তৃতা দিলেও কোন ফল হবে না।

তাই দন্ত-রক্ষার প্রথম উপায় হচ্ছে যে, দাঁত সম্পর্কে ছেলেমেয়েদের আগ্রহ সৃষ্টি করা। দাঁত যা-তা নয়, গর্বের বস্তু, সৌন্দর্যের আধার—এই সত্যটা ছেলেমেয়েদের সামনে তুলে ধরতে হবে।

দাঁতের পরিচ্ছন্নতার (সেই সঙ্গে অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের) উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। যেমন দেহ বা চুল অপরিষ্কার থাকলে কেবল অস্বস্তি হয় না—বিশ্রী দেখায়, তেমনি অপরিষ্কার দাঁত থেকে মুখে দুর্গন্ধ হয়, পেটের গোলমাল দেখা দেয়, এবং মুখের সৌন্দর্য নষ্ট হয়। এইজন্য ছেলেদের নিয়ে **টুথ-ব্রাশ-ড্রিল** বা দাঁত-মাজার মহড়া দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। শিশুদের উপযোগী ছোট ছোট ব্রাশ ব্যবহার করাই ভালো। ব্রাশ চালনার নিয়ম হচ্ছে উপর থেকে নীচে এবং ডানদিক থেকে বাঁদিকে। তা ছাড়া, ব্রাশ দিয়ে দাঁতের ভিতর ও বাইরেটা সমানভাবে

পরিষ্কার করতে হয়। দিন দুবার দাঁত মাজা উচিত। রাত্রে শুতে যাওয়ার আগে দাঁত মাজার দরকার সবচেয়ে বেশী। রাত্রে দাঁত পরিষ্কার করার পর আর কোন খাবার খাওয়া উচিত নয়। নিত্য যে ব্রাশ ব্যবহৃত হয়, সেটাকে মাঝে মাঝে কিছুক্ষণ গরম জলে ডুবিয়ে রাখার পর ভালোভাবে ধুয়ে পরিষ্কার ক'রে নিতে হয়। অপরিষ্কার ব্রাশ ব্যবহারে উপকারের চেয়ে ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী।

মুখ ধোয়ার পর আপেল প্রভৃতি ফল চিবিয়ে খেলে, দাঁত আপনা থেকেই পরিষ্কার হয়ে যায়। খুব ভালো ক'রে একাধিক বার কুলকুচি ক'রে মুখ ধোয়া উচিত। শর্করা ও ছানা জাতীয় অনেক খাদ্য (যেমন সন্দেশ প্রভৃতি) এবং বিশেষ ক'রে বিস্কুটের এরারুট্-জাতীয় পদার্থ দাঁতের ফাঁকে আট্‌কে থাকে। তার ফলে দাঁত ও মাড়ির ক্ষতি হ'তে পারে। তাই মুখ ধোয়ার পর ঐ দুটি খাবার কখনই খাওয়া উচিত নয়। আপেল দাঁত, মাড়ি ও জিব পরিষ্কার ক'রে দেয়।

দাঁতের ক্ষয়-নিবারণ এবং দাঁতের জীবনী-শক্তি বাড়ানোর ক্ষমতা যে প্রত্যেকটি শিশুর আয়ত্তাধীনে আছে, সে কথাটাই বার বার ছেলেদের বুঝিয়ে দিতে হবে। দাঁতের জন্য সূর্যালোক ও বিশুদ্ধ বায়ুর যেমন প্রয়োজন, তেমনি দরকার চোয়ালের ব্যায়াম, এবং মাখন, ডিম, টাট্‌কা শাক-সব্‌জি প্রভৃতি আহার্য গ্রহণের।

পরিশেষে তাদের বুঝিয়ে দিতে হবে যে, দাঁতের পরীক্ষা ও পরিদর্শনের প্রয়োজন কত। দাঁত সামান্য একটু খারাপ হ'লেই তার সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করাটাই বিধেয়। কোন কারণে দন্ত-রোগের লক্ষণ দেখা দিলে, দন্ত-চিকিৎসকের নির্দেশমতো সাবধানে চলা উচিত। মাঝে মাঝে আঙুল দিয়ে প্রত্যেকটি দাঁতের গোড়ায় ও মাড়িতে ভালো ক'রে **ম্যাসেজ করা বিশেষ দরকার**। তাতে মাড়ি সবল হয় এবং শক্তভাবে দাঁতগুলিকে ধ'রে রাখতে পারে। এই পদ্ধতিতে চললে ছেলেমেয়েরা অতি সহজেই সর্বপ্রকার দাঁতের অসুখ থেকে অব্যাহতি পেতে পারে।

খাদ্য ও পানীয়

খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা :

আমাদের দেহ একটি ইঞ্জিন-বিশেষ। জল ও কয়লা দ্বারা যেমন ইঞ্জিন চলে, দেহের ইন্ধন তেমনি খাদ্য। প্রয়োজনের খাতিরে ইঞ্জিন চলে, অপ্রয়োজনে তার চলাচল বন্ধ থাকে। দেহ কিন্তু সর্বদা সচল থাকে। ক্ষণিকের জন্যও তার বিশ্রাম নেই। যতদিন মানুষ জীবিত থাকে, ততদিন তার দেহ-যন্ত্র চলে।

তার পেশী সঞ্চালন এবং অন্যান্য কাজওচলে সমান তালে। চুপ ক'রে বসে থাকলেও দেহ নিশ্চুপ থাকে না। সজ্ঞানে বা অজ্ঞানে, জাগরণে বা নিদ্রায় দেহ-যন্ত্র কাজ ক'রে যায়। মস্তিষ্কও নিশ্চেষ্ট থাকে না; সে-ও চিন্তা করে। চিন্তা করা মগজের কাজ। মানসিক কার্যে মস্তকাদি যন্ত্রের ক্ষয় হয়। জীবিত অবস্থায় কর্মের হাত থেকে কারও নিস্তার নেই। **এই কাজ করার বা পেশী সঞ্চালনের শক্তি আমরা খাদ্য থেকে পাই।**

মানুষের শরীর সর্বদাই উষ্ণ। সুস্থ শরীরের তাপ পরীক্ষা করলে থার্মোমিটারে তাপ উঠবে ৯৮·৪° ফাঃ হিট্। বাইরের তাপ বা শীত প্রচণ্ড হ'লেও, দেহের নির্দিষ্ট তাপ-ই রক্ষিত হয়। শারীরিক শ্রমের ফলে দেহের উত্তাপ বাড়লেই দেহের রক্তস্রোত চর্মের নিকটে সমধিক প্রবাহিত হয়; এবং লোমকূপ-পথে রক্ত থেকে স্বেদ নিঃসৃত হয়ে দেহের অতিরিক্ত তাপকে বের ক'রে দেয়। আবার শীতকালে বাইরের তাপ কমে গেলে, রক্তস্রোত চর্মের অনেক নীচে দেহের ভিতরে প্রবাহিত হয়ে দেহের তাপ বিকিরণ হ'তে দেয় না। এইভাবে সর্বদা দেহের তাপ বজায় থাকে।

দেহ থেকে সর্বদা তাপ বের হ'য়ে যাচ্ছে। শারীরিক ক্রিয়ার উৎসৃষ্ট-স্বরূপ নিশ্বাস ও মল-মূত্রের সঙ্গে কতক তাপ বের হ'য়ে যায়। স্বেদ নিঃসৃত হ'য়ে চর্মের উপর থেকে উবে যায়; তাতেও কতক তাপ বের হ'য়ে যায়। ত্বক্ থেকে সর্বদাই চারদিকে বাতাসে তাপ বিকিরণ হচ্ছে। এইভাবে দেহের যে তাপ-ক্ষয় হচ্ছে, নিত্যই সে ক্ষতি-পূরণের প্রয়োজন। দেহের এই **তাপ-সঞ্চয় ও তাপ-রক্ষা করার শক্তি** আমরা খাদ্য থেকে পাই।

কর্ম-শক্তি এবং তাপ-সঞ্চয় ও তাপ-রক্ষার জন্য এমন খাদ্যের প্রয়োজন, যা শরীরে **ইন্ধনরূপে** ব্যবহৃত হ'তে পারে। ইন্ধন দগ্ধ করলে যেমন তাপের সৃষ্টি হয়, দেহেও তেমনি খাদ্যের অন্তর্গত বস্তুসকল দগ্ধ হয়ে তাপোৎপত্তি হয়। এই তাপই আমরা থার্মোমিটারে ধরতে পারি।

খাদ্যের মূলীভূত কার্বন অক্সিজেনের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে তাপ উৎপন্ন করে; অবশ্য তার ফলে আগুন জ্বলে না। **তাপ-ই এই প্রক্রিয়ার প্রকৃত দহন-ক্রিয়া।** খাদ্যস্বরূপ ইন্ধন দেহ-যন্ত্রে যোগাতে হয়, অক্সিজেনের দ্বারা তাকে দগ্ধ করে তাপ উৎপাদন করার জন্য। সেই তাপ আমাদের দেহে কর্ম করবার শক্তি-উৎপাদন, তাপ-সঞ্চয় ও তাপ-রক্ষার কাজে ব্যবহৃত হয়।

অতএব, **খাদ্যগ্রহণের প্রথম উদ্দেশ্য পেশী সঞ্চালন করবার শক্তি অর্জন করা এবং তাপ সঞ্চয় ও তাপ রক্ষা করা।** এই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য **ইন্ধন-জাতীয় খাদ্যের প্রয়োজন।**

খাদ্যগ্রহণের আর এক উদ্দেশ্য শরীর গঠন করা এবং দৈনন্দিন জীবন-যাত্রায় যে ক্ষয় হচ্ছে, তা পূরণ করা। কিন্তু দেহের গঠন, দেহের ক্ষয়পূরণ এবং দেহের বৃদ্ধিসাধনের কাজ দহন-ক্রিয়া দ্বারা সাধিত হয় না। তার জন্য অন্য এক শ্রেণীর খাদ্যের প্রয়োজন। মানব-দেহের মূলীভূত উপাদান যে সকল খাদ্যে সুপাচ্যরূপে বর্তমান আছে, সেই শ্রেণীর খাদ্য গ্রহণ করিলে, তা রক্তস্রোত দেহসাৎ ক'রেই দেহস্থ করে। দেহের গঠন, দেহের ক্ষয়পূরণ ও বৃদ্ধিসাধন করবার শক্তি আমরা খাদ্য থেকে পাই।

অতএব, খাদ্যগ্রহণের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য **দেহের গঠন, দেহের ক্ষয়পূরণ ও দেহের বৃদ্ধিসাধন করা।** এই উদ্দেশ্য সাধন করার জন্য **মানব-দেহের মূলীভূত উপাদানসকল যেরূপ খাদ্যে আছে বা যা থেকে গঠন-ক্রিয়া চলে, সেই জাতীয় খাদ্যের প্রয়োজন।**

এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে, তা হ'লে প্রত্যহ কিঞ্চিৎ পাথুরে কয়লা (ইন্ধন) ও কাঁচা মাংস (দেহের উপাদান) ভক্ষণ করলে কি দু'প্রকার উদ্দেশ্যই সাধিত হ'তে পারে? না, তা হয় না। তার কারণ এই যে, জীবমাত্রেই যে-কোন বস্তু আহার করলেই তা কাজে লাগতে বা দেহসাৎ হ'তে পারে না। কারণ, যে-কোন বস্তুই খাদ্য নয়। শুধু প্রয়োজনীয় উপাদানসকল থাকলেই কোন বস্তু খাদ্য হয় না, এমনকি দেহপুষ্টির উপযোগীও হয় না; পরন্তু কয়েকটি নির্দিষ্ট প্রণালীতে গঠিত দেহের উপযোগী উপাদান বর্তমান থাকলেই, তা খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হ'তে পারে।

খাদ্যের উপাদান:

পৃথিবীতে যত পদার্থ আছে, তা বিশ্লেষণ করলে কতকগুলি নির্দিষ্ট-সংখ্যক মৌলিক পদার্থ পাওয়া যায়। পদার্থমাত্রে-ই দু'প্রকার—**মৌলিক** ও **যৌগিক**। দুই বা ততোধিক মৌলিক পদার্থের সংযোগে সৃষ্টি হয় যৌগিক পদার্থ। যে পদার্থ থেকে একাধিক পদার্থ পাওয়া যায় না, তাকে মৌলিক পদার্থ বলে।

মানুষের দেহ একটা পদার্থ। এই পদার্থ কতকগুলি অতিশয় যৌগিক পদার্থ দ্বারা তৈরী। এখন নরদেহের মৌলিক উপাদান কি, তা জানা দরকার। তা না জানলে, দেহের জন্য কোন্ কোন্ খাদ্যের প্রয়োজন (দেহের ক্ষয়নিবারণ ও পুরিপুষ্টির জন্য), তা নির্ণয় করা কি সম্ভব? দেহের গঠনের জন্যই খাদ্যগ্রহণের প্রয়োজন। দেহের উপাদানে যদি জল না থাকে, তবে জলের দরকার হয় না। কিন্তু মানুষের দেহ-উপাদানে জল আছে ব'লেই জলের অত্যাবশ্যক প্রয়োজন। বস্তুতঃ, নরদেহের প্রায় সাত ভাগ জল আর তিন ভাগ স্থল; অর্থাৎ, মাংস, মেদ,

হাড় প্রভৃতি। অতএব, দেহের জন্য জলীয় খাদ্য ও বিশুদ্ধ জল গ্রহণের যে কত প্রয়োজন, তা সহজেই অনুমেয়।

নরদেহে অস্থি, চর্ম, মেদ, মাংস, শিরা, নাড়ী, চুল, নখ—যা-কিছু আছে, সে সকলই নানাপ্রকার যৌগিক পদার্থে গঠিত। মানুষের দেহে প্রায় ২০ রকম বিভিন্ন মৌলিক পদার্থ আছে। আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে প্রায় ৯২টি মৌলিক পদার্থ আবিষ্কৃত হয়েছে। সেই ৯২টি পদার্থের মধ্যে প্রায় ২০টি মৌলিক পদার্থের নানারূপ সংযোগে মানুষের দেহ গঠিত।

এই ২০টি উপাদানের মধ্যে আছে নাইট্রোজেন, কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, ফস্‌ফরাস্‌, সাল্‌ফার, ক্লোরিন, আইওডিন, সোডিয়াম, পটাসিয়াম ও লোহ। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশী পরিমাণে আছে নিম্নলিখিত চারটি পদার্থ; যথা—নাইট্রোজেন, কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন।

মানুষের আহার্যসামগ্রীর মধ্যে যে সকল যৌগিক পদার্থ আছে, তাদের সাধারণতঃ ৫টি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়ঃ—

(১) **কার্বোহাইড্রেট্‌**—কার্বোহাইড্রেট্‌, শ্বেতসার এবং শর্করা-জাতীয় বস্তু। এতে কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন আছে, কিন্তু নাইট্রোজেন নেই। চাল, আটা, ময়দা ইত্যাদির শ্বেত অংশ শ্বেতসার-নির্মিত। আলু, শাঁক-আলু, ওল, কচু ইত্যাদির শ্বেত অংশেও শ্বেতসার আছে।

চিনি, গুড় ইত্যাদি শর্করাবহুল খাদ্য। শর্করার স্বাদ মিষ্ট।

কার্বোহাইড্রেট্‌ খাদ্য দেহের ভিতর ইন্ধনের কাজ করে; অর্থাৎ, এই ইন্ধন দেহের মধ্যে দগ্ধ হয়ে দেহের তাপ ও শক্তি উৎপন্ন করে। দেহের তাপ বাড়াতে হ'লে, অধিক পরিশ্রম করতে হ'লে, এই জাতীয় খাদ্যের বিশেষ প্রয়োজন। এই খাদ্যাংশের কিছুটা চর্বি বা মেদরূপে রূপান্তরিত হয়। এই খাদ্যগ্রহণে শরীর মোটা হয়ে যায়।

(২) স্নেহ-পদার্থ বা ফ্যাট্‌—কার্বোহাইড্রেটের মতো এতেও কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন আছে, কিন্তু তার পরিমাণ বিভিন্ন। এতে কিন্তু নাইট্রোজেন নেই। সকল প্রকার উদ্ভিজ্জ ও জান্তব তৈল, মাখন, ঘৃত, চর্বি এই শ্রেণীর অন্তর্গত। কার্বোহাইড্রেট্‌ শরীরে যে কাজ করে, ফ্যাট্‌ বা স্নেহ-পদার্থও সেই কাজ করে; অর্থাৎ, ইন্ধনরূপে দেহের তাপ ও শক্তি উৎপাদন করে। অতএব, এই দুই শ্রেণীর খাদ্য—কার্বোহাইড্রেট্‌ ও ফ্যাট্‌—আমাদের পেশী সঞ্চালন করার শক্তি অর্জনে, দেহের তাপ সঞ্চয় এবং দেহের তাপ রক্ষণে সহায়তা করে।

শীতকালে দেহের তাপ বাড়ানো এবং কায়িক পরিশ্রমের শক্তি-সঞ্চয়ের জন্য উক্ত দুই শ্রেণীর খাদ্য আবশ্যক।

(৩) **মাংস-জাতীয় খাদ্য** বা **প্রোটিন**—এই খাদ্যে আছে নাইট্রোজেন, কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন। এখানে লক্ষণীয় এই যে, এই শ্রেণীর খাদ্য ছাড়া **অন্য কোন খাদ্যে নাইট্রোজেন নেই।** নাইট্রোজেন তথা প্রোটিন জীব-দেহের ভিত্তিস্বরূপ; প্রোটোপ্লাজ্‌মের গঠনে অবশ্য-প্রয়োজনীয় উপাদান; দেহের প্রতি কোষে এই পদার্থ বর্তমান। খাদ্যগ্রহণের অন্যতম উদ্দেশ্য, দেহের গঠন, দেহের ক্ষয়পূরণ ও দেহের বৃদ্ধিসাধন; তার জন্য প্রোটিন-জাতীয় খাদ্যের বিশেষ প্রয়োজন। কার্বোহাইড্রেট্ ও ফ্যাটে উপরোক্ত কোন কাজ হয় না।

মৎস্য, মাংস বা ছানা জাতীয় খাদ্যে প্রচুর প্রোটিন আছে। এ ছাড়া, সকল প্রকার শস্য ও শাক-সব্‌জিতে অল্প পরিমাণ প্রোটিন আছে। জান্তব প্রোটিন যেমন যত সহজে হজম ও দেহসাৎ করা যায়, উদ্ভিজ্জ প্রোটিন সেরূপ করা যায় না। জান্তব প্রোটিন সমধিক বিশুদ্ধ ও সুপাচ্য। প্রচুর পরিমাণে দুগ্ধ পান করলে উপযুক্ত পরিমাণে প্রোটিন গ্রহণ করা হয়।

(৪) **লাবণিক পদার্থ**—দুই বা ততোধিক মূল বা ধাতব পদার্থের সংমিশ্রণে লবণ-শ্রেণীর যৌগিক পদার্থ নির্মিত হয়। দেহের গঠনে নানাপ্রকার ধাতব পদার্থ আছে; সেজন্য আহারের সঙ্গে লাবণিক পদার্থ গ্রহণ করা অবশ্য-প্রয়োজনীয়। রক্ত-কণিকার উপাদানে ধাতব পদার্থ আছে। দেহ থেকে ঘামের সঙ্গে লাবণিক পদার্থ বের হয়ে যায়, তার পূরণের জন্য লাবণিক পদার্থের প্রয়োজন হয়। লাবণিক পদার্থের কোন কোন ভাগ দেহসাৎ হয় না; কিন্তু তা পরিপাক-ক্রিয়ার সাহায্য করে। আমরা যে লবণ খাই, তা সোডিয়াম ও ক্লোরিন নামক দুটি মৌলিক পদার্থের সংযোগে তৈরী। আমাদের নিত্যনৈমিত্তিক আহারের মধ্যে শাক-সব্‌জি ও মৎস্য-মাংসে কিছু কিছু লাবণিক পদার্থ থাকে খাদ্য থেকে লাবণিক পদার্থ একেবারে বাদ দিলে জীবনধারণ করা যায় না।

(৫) **জল**—নরদেহের শতকরা ৭০ ভাগ জল। অতএব, জল-গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা অত্যধিক। জল ক্রমাগতই নানাভাবে দেহ থেকে নির্গত হয়; তাই প্রতিনিয়তই তার যোগান চাই। রক্তের উপাদানে শতকরা ৯০ ভাগ জল। পরিপাক হওয়ার পূর্বে সকল দ্রব্যই শরীরের মধ্যে দ্রবীভূত অবস্থায় আনীত হয়; সেইজন্য পরিপাক-প্রক্রিয়ায় জলের প্রয়োজন সর্বাধিক। আহার্য বস্তু দ্রবীভূত করার মতো যথেষ্ট পরিমাণ জলের প্রয়োজন।

খাদ্যের উল্লিখিত পাঁচ শ্রেণীর উপাদানের কথা বৈজ্ঞানিকরা অনেকদিন থেকে জানতেন। এ-বিষয়ে বহুদিন ধ'রে গবেষণাও চলেছিল। অনুসন্ধানে জানা গেছে যে, উক্ত পাঁচ শ্রেণীর উপাদান খাদ্যে না থাকলে জীবনধারণ করা যায় না। এই

পাঁচটি উপাদান ছাড়াও আরো কিছুর প্রয়োজন। বৈজ্ঞানিক গবেষণায় খাদ্যের আর এক শ্রেণীর অবশ্য-প্রয়োজনীয় উপাদান আবিষ্কৃত হয়েছে ; তার নাম **ভাইটামিন**।

ভাইটামিন ঃ

ভাইটামিন খাদ্য বস্তুতঃ খাদ্যের সহায়ক। ভাইটামিনের বাংলা করা হয়েছে **খাদ্যপ্রাণ**। খাদ্যপ্রাণ বা ভাইটামিন-যুক্ত খাদ্য অবশ্য-গ্রহণীয়। নানাপ্রকারের ভাইটামিন আছে ; যথা—**খাদ্যপ্রাণ 'ক', খাদ্যপ্রাণ 'খ', খাদ্যপ্রাণ 'গ'** ইত্যাদি। সকল প্রকার ভাইটামিন শরীরের বিশেষ বিশেষ কাজে লাগে। ভাইটামিন অতিশয় জটিল যৌগিক পদার্থ। যতগুলি ভাইটামিন আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়েছে, তার সবগুলি এখনও বিশ্লেষণ করা যায়নি। কাঁচা ও তাজা শাক-সব্‌জি, দুধ, ডিম, ফল-মূল, চাল ইত্যাদিতে ভাইটামিন আছে। পরীক্ষান্তে দেখা গেছে যে, এই সব বস্তু অধিকক্ষণ সিদ্ধ করলে বা শুকিয়ে রাখলে, তার ভাইটামিন-ভাগ নষ্ট হয়ে যায়। ছাঁটা চালে, অধিক সিদ্ধ-করা শাক-সব্‌জিতে, অধিক জ্বাল-দেওয়া দুধে ভাইটামিন (খাদ্যপ্রাণ) থাকে না।

পুষ্টিকর খাদ্য ঃ

যে খাদ্যে দেহ পরিপুষ্টি লাভ করে, তাকে পুষ্টিকর খাদ্য বলে। খাদ্যগ্রহণের সকল প্রকার উদ্দেশ্য সাধন করতে গেলে, কি প্রকার খাদ্য কি পরিমাণে গ্রহণ করতে হবে, সে-বিষয়ে আরও গবেষণা চলছে। মোটামুটি এই কয়টি বিষয়ে বৈজ্ঞানিকরা একমত হয়েছেন। যেমন—

(১) উল্লিখিত ছয় প্রকার উপাদানই খাদ্যে অবশ্য-প্রয়োজনীয়। ক্রমাগত কোন এক শ্রেণীর খাদ্যাভাব হ'লে শরীর সুস্থ থাকে না।

(২) শুধুমাত্র প্রোটিন উপাদানেই নাইট্রোজেন আছে। দেহ-গঠনের অবশ্য-প্রয়োজনীয় এই উপাদান জান্তব খাদ্যে সুপাচ্যরূপে পাওয়া যায়।

(৩) দেহে শক্তি ও তাপ সঞ্চয় এবং দেহ-গঠনের জন্য **প্রোটিন, কার্বো-হাইড্রেট্‌ ও ফ্যাট্‌ চাই।**

(৪) উপযুক্ত অনুপাতে উক্ত ছয় শ্রেণীর উপাদান শুধু বর্তমান থাকলেই চলবে না ; সে সকল উপাদান সুপাচ্যরূপে বর্তমান থাকা চাই। মৎস্য, মাংস ও ডিমের অন্তর্গত প্রোটিন প্রায় সমস্তটাই দেহসাৎ করা যায়। দুধেরও তাই। কিন্তু চালের প্রোটিন শতকরা শুধু ৮৪ ভাগ, আলুর ৭০ ভাগ দেহসাৎ করা যায়।

বাঙালীর খাদ্য ঃ

বাঙালীর খাদ্য কেমন হওয়া উচিত, সে সম্পর্কে নানা মতভেদ আছে। কেউ ভাত খাওয়া আদৌ পছন্দ করেন না, কেউ বা মাংসাহার বন্ধ করতে চান। বাংলা

দেশের মতো বৃহৎ ও প্রাচীন দেশের বহুকাল-প্রচলিত প্রথা সহসা বদলে ফেলা যায় না। সাধারণ বাঙালীর কি ধরনের খাদ্য খাওয়া উচিত, নিম্নে তার তালিকা দেওয়া গেল :—

(১) ভাত—ঢেঁকি-ছাঁটা চালের এবং ফেন না গেলে খাওয়া উচিত। (২) প্রচুর পরিমাণ ডাল। (৩) তাজা শাক-সব্‌জির তরকারি। (৪) তেঁতুল বা অপর কোন অম্ল।

উল্লিখিত চার প্রকার খাদ্য না হ'লে শরীরের পুষ্টিসাধন হ'তে পারে না। এছাড়া, সামর্থ্যমতো যে যতটুকু পারে অল্প জাল-দেওয়া খাঁটি দুধ, মাছ, মাংস, ডিম ও ফল আহার করলে, শরীরের সকল প্রয়োজন সাধিত হ'তে পারে।

খাওয়ার দোষ :

খাওয়ার দোষেই অধিকাংশ লোকে যৌবনে এবং শেষ বয়সে কষ্ট পেয়ে থাকে। স্যার হেন্‌রি টমসন-ও তাই বলেছেন যে, দারিদ্র্য ছাড়াও খাদ্য-নির্বাচনের অজ্ঞতার জন্য, খাদ্য-প্রস্তুতির দোষে, খাদ্যপ্রাণের অভাবে অধিকাংশ লোকে পেটের গোলমালে ভোগে। এছাড়া, আরও অনেকে খাওয়ার বদ অভ্যাসে, খাওয়ার দোষে, অপরিমিত এবং অসম খাদ্য-ভক্ষণে কষ্ট পায়। সেগুলি হচ্ছে—যথাক্রমে (ক) অনির্দিষ্ট সময়ে খাওয়া, (খ) একঘেয়ে আহার্য গ্রহণ, (গ) ভালো ক'রে চিবিয়ে না খাওয়ার দরুন, (ঘ) খারাপ দাঁতের জন্য গোগ্রাসে গিলে খাওয়ার জন্য, (ঙ) অতিরিক্ত চা ও মদ্য পানের জন্য। খারাপ দাঁতের জন্য ভালো ক'রে চিবিয়ে না খাওয়ার দরুন পাচক রস বিষাক্ত হওয়ার ফলে নানাপ্রকার স্থায়ী উদর-পীড়ার সৃষ্টি হয়। খাদ্য-নির্বাচনের দোষে কোষ্ঠকাঠিন্য ও অন্যান্য পেটের ব্যাধি হ'তে পারে।

এইজন্য অপেক্ষাকৃত বড় ছেলেমেয়েদের (বিশেষ ক'রে মেয়েদের) গৃহস্থালি শিক্ষা দেওয়ার সময় সুষম খাদ্য-প্রস্তুত-প্রণালী সর্বাগ্রে শিক্ষা দেওয়া উচিত। দেহের পরিপুষ্টির জন্য কি কি আহার্যের একান্ত প্রয়োজন, কেমন ভাবে, কি প্রণালীতে সেগুলি তৈরি করা উচিত (বিশেষ ক'রে খাদ্য-বস্তু নির্বাচন, প্রস্তুতি এবং খাদ্য-বিজ্ঞান সম্পর্কে জ্ঞানদান), সে-বিষয়ে ছেলেমেয়ে সকলকেই ব্যবহারিক জ্ঞান দান করতে হবে।

দেহের জন্য খাদ্যের প্রয়োজন কেন :

আমাদের দেহ অসংখ্য ছোট ছোট কোষের সমষ্টি। অণুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া এই কোষগুলি দেখা যায় না। এগুলিকে বলা হয় প্রোটোপ্লাজ্‌ম (Protoplasm)। এরাই দেহের শারীরিক ভিত্তি। শিশুরা যখন বেড়ে উঠে, তখন দেহের বিভিন্ন

অংশের কোষ ও 'টিস্যু'গুলির বৃদ্ধি যতই দ্বিগুণ হয়, তখন প্রোটোপ্লাজ্‌মগুলি-ও সংখ্যায় বৃদ্ধি পায়। দৈহিক বৃদ্ধি ছাড়াও এই প্রোটোপ্লাজ্‌মগুলি প্রতিনিয়তই চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছে, তাদের স্থানে আবার নূতন নূতন প্রোটোপ্লাজ্‌ম-এর সৃষ্টি হয় ব'লেই দেহের সংগঠন-কার্য অক্ষুণ্ণ থাকে। তাই দেহ-সংগঠনের জন্য খাদ্যের প্রথম প্রয়োজন। দ্বিতীয়তঃ, শক্তিদায়ক খাদ্যের দরকার। তৃতীয়তঃ, লাবণিক অথবা ধাতব পদার্থের প্রয়োজন। চতুর্থতঃ, 'ক', 'খ', 'গ', 'ঘ' প্রভৃতি ভাগে ভাইটামিনগুলি বিভক্ত। যে সমস্ত খাদ্যে ভাইটামিন বা খাদ্যপ্রাণ বর্তমান আছে, তাদের খাদ্যমূল্য কত, নিম্নে তার একটা তালিকা দেওয়া গেল :—

খাদ্যের প্রয়োজনীয় ভাইটামিন

খাদ্যপ্রাণ	কি কি খাদ্যে কোন্ কোন্ ভাইটামিন আছে?	কোন্ খাদ্যে কি প্রয়োজন মেটে?
ক	কডলিভার তেল, দুধ, মাখন, পনীর, ডিমের কুসুম, মাংস, সবুজ শাক-সব্‌জি, চর্বি প্রভৃতি	(১) বৃদ্ধি (২) রোগ-প্রতিষেধক শক্তিকে জিইয়ে রাখে
খ	শস্যাদির খোসা, ছোলা, মটর, শিম, মদের ফেনা, ময়দার খামি, দুধ, যকৃৎ, মগজ, লেটুস প্রভৃতি	(১) বৃদ্ধি (২) নার্ভ-তন্ত্রের শক্তি (৩) বেরি-বেরি প্রতিষেধক শক্তি
গ	সবুজ পাতা, কাঁচা ফল-মূল, লেটুস, বাঁধাকপি, কমলালেবু, টমেটো, লিমনেট, আলু, ওয়াটার, ক্রিম প্রভৃতি	কাউর ঘা প্রতিষেধক শক্তি
ঘ	কডলিভার তেল, তৈলাক্ত মৎস্য, ডিমের কুসুম, দুধ, মাখন, জৈব চর্বি প্রভৃতি	দাঁত ও হাড়ের বৃদ্ধির সহায়ক; এর অভাবে রিকেট রোগ হ'তে পারে

কি ধরনের খাদ্যের প্রয়োজন এবং কেন ঃ

কি ধরনের খাদ্য কেমন ক'রে তৈরি ক'রে খাওয়া উচিত, তা অনেকেরই জানা নেই। যে খাদ্য মুখরোচক, তা সব সময় শরীরের পক্ষে উপকারী নয়। খাদ্য-প্রস্তুতি যত সহজ সরল হবে, সেগুলি ততই দেহের পক্ষে উপকারী হবে। শিশুদের খাদ্য-নির্বাচনের সময় নিম্নলিখিত খাদ্যবস্তু আহরণের দিকে দৃষ্টি দিতে হবে :—

(১) দেহ-সংগঠনের উপযোগী প্রচুর প্রোটিন-জাতীয় খাদ্যের প্রয়োজন। পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রোটিন আছে সব রকম মাংস, দুধ, পনীর, ডিম এবং মাছে। প্রত্যহ প্রচুর পরিমাণ দুধের দরকার। এছাড়া, প্রোটিন আছে ময়দা, মটর এবং সব রকম ডালে।

(২) প্রত্যহ শাক-সব্‌জি-জাতীয় খাদ্যের প্রয়োজন। সবুজ শাক-সব্‌জির মধ্যে স্যালাড্, কাঁচা ফল ও কমলালেবু বিশেষ দরকার।

(৩) তৃতীয়তঃ, প্রয়োজন চর্বি-জাতীয় খাদ্যের। স্বাভাবিক দৈহিক বৃদ্ধির জন্য প্রোটিনেরও বিশেষ প্রয়োজন। এবং

(৪) কি ধরনের কি পরিমাণ খাদ্যের প্রয়োজন, তা নিম্নলিখিত বিষয়ের উপর নির্ভরশীল :—

শিশুর বয়স কত? বয়স্কদের ক্ষেত্রে দৈহিক প্রয়োজনে যে খাদ্যের শতকরা ১০০ ভাগ প্রয়োজন, সেই খাদ্য ৫—৭ বছরের শিশুদের জন্য প্রয়োজন শতকরা ৬০ ভাগ; ৭—৯ বছরের শিশুদের জন্য শতকরা ৭০ ভাগ দরকার; ৯—১১ বছরের শিশুদের জন্য প্রয়োজন ৮০ ভাগ; ১১ থেকে ১২ বছরের ছেলেমেয়েদের জন্য প্রয়োজন ৯০ ভাগ; এবং ১২ থেকে তদূর্ধ্ব বয়সের লোকদের জন্য দরকার ১০০ ভাগ*।

কিভাবে এবং কখন খাওয়া উচিত :

কতকগুলি ভাইটামিন-যুক্ত খাদ্য উদরস্থ করাটাই দৈহিক পরিপুষ্টি সাধন করা নয়। সেই খাদ্যপ্রাণ থেকে কতটা অংশ রক্ত এবং কলা (Tissues)-সাৎ হ'ল, সেটাই বিচার্য। কি অবস্থায় খাদ্য গলাধঃকরণ করা হয়েছে, তার উপরই দেহসাৎ হওয়ার ব্যাপারটা অনেকখানি নির্ভর করবে।

খাদ্যগ্রহণের সময়কার রসনা-তৃপ্তি ও যে প্রক্ষোভের (Emotions) সৃষ্টি হবে, তার উপরই নিঃসৃত পাচক রসের পরিমাণ ও পরিবেশন নির্ভর করবে। এই কারণে ডিনার টেবিল অর্থাৎ খাদ্য-পরিবেশনের পরিবেশটি সুসজ্জিত এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হওয়া উচিত। এমন আনন্দদায়ক পরিবেশে আহার্য গ্রহণ করলে, একাধারে মন ও রসনা পরিতৃপ্ত হবে এবং পরিপাকের কাজও হবে সুষ্ঠুভাবে। গোগ্রাসে বা অতি-তাড়াতাড়ি আহার্য গ্রহণ করা আদৌ উচিত নয়। কারণ, তাড়াতাড়িতে অনেক খাদ্যাংশ ভালো ক'রে চিবানো যায় না। ফলে, অচর্বিত অবস্থায় যে খাদ্যাংশ উদরস্থ হয়, তাতে শুধু যে হজমের ব্যাঘাত ঘটে তা নয়, নানাপ্রকার পেটের অসুখও হ'তে পারে। ঠিক খাওয়া-দাওয়ার পরেই কোন কঠোর দৈহিক বা মানসিক শ্রম করা উচিত নয়। প্রত্যহ নির্দিষ্ট সময়ে পরিমাণমতো আহার্য গ্রহণ করার সু-অভ্যাস-গঠনে যত্নবান হ'তে হবে। প্রত্যেকটি সাধারণ স্বাভাবিক শিশুকে দিনে তিনবার পেট পুরে ভালো খাওয়ানোর ব্যবস্থা হওয়াটাই বাঞ্ছনীয়। অনিয়মিত ও অসময়ে আহার্য গ্রহণ করলে, শরীর খারাপ হওয়ারই সমধিক সম্ভাবনা।

খাদ্য-প্রস্তুতির ব্যয় :

আমরা জানি যে, সুষম খাদ্য (Balanced diet) প্রস্তুত করাটা ব্যয়সাপেক্ষ ব্যাপার। এই কারণে দেহ-সংগঠক যে সব দামী খাদ্য আছে (যেমন মাছ, মাংস

* ঘৃতে শক্তি বৃদ্ধি, দুধে বৃদ্ধি বল ; মাংসে মাংস বৃদ্ধি, শাকে বৃদ্ধি মল।

প্রভৃতির মূল্য একটু বেশী), তার পরিবর্তে সম-খাদ্যপ্রাণ-সম্পন্ন অন্য অল্প-দামের আহার্য বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে প্রস্তুত ক'রে নেওয়া যেতে পারে। কম দামের মাছ, মাংসও (কোন অবস্থাতেই পচা নয়) কম পুষ্টিকর নয়। কম দামের পনীরে বেশী খাদ্যপ্রাণ থাকে। বাঁধাকপির তুল্য সস্তা অথচ এমন পুষ্টিকর সব্জি আর দ্বিতীয় নেই। পীচ ফলের চেয়ে একটি কমলালেবু অনেক ভালো। এই কারণে খাদ্যবস্তু-নির্বাচনের সময় দেখা উচিত যে, কম খরচে কোন্ কোন্ খাদ্যবস্তু দ্বারা সুষম খাদ্য তৈরি হ'তে পারে।

খাদ্যের সরবরাহ ও সংরক্ষণ

খাদ্যবস্তু যত তাজা ও টাট্কা হবে, ততই ভালো। সদ্য-ধরা মাছ, গাছ-থেকে-পাড়া ফল, দোয়া দুধ সব সময় পাওয়া সম্ভব নয়। খাদ্যবস্তু আমদানি-রপ্তানির ফলে অনেক জিনিসই আমাদের পেতে দেরি হয়। এমত অবস্থায় করণীয় কি? প্রথম কর্তব্য হচ্ছে, দেখে শুনে খাদ্যবস্তু ক্রয় করা। বরফ-দেওয়া মাছ, ঠাণ্ডা গুদাম-ঘরে-রাখা জিনিস অনেকটা টাট্কার মতোই ভালো থাকে ; সে জিনিস নিঃসন্দেহে গ্রহণ করা যেতে পারে। আজকাল বৈজ্ঞানিক উপায়ে সংরক্ষিত মাছ, দুধ ও ফল-মূল যা বাজারে আমদানি হয়, তা খেতেও কোন অসুবিধা নেই ; এবং তাতে যে পরিমাণ খাদ্যপ্রাণ বজায় থাকে, তা নিঃসন্দেহে পরিপুষ্টিকর। খাদ্যবস্তু কেনার সময় দেখা উচিত, তা লেন-দেনে নোংরা হচ্ছে কিনা, বা কোন আহার্য খোলা থাকায় ধূলিমলিন হচ্ছে কিনা। এই সব দিকে লক্ষ্য রেখে খাদ্যবস্তু বা পাকা ফল-মূল কেনা উচিত।

শিশু-বিদ্যালয়ে খাদ্য-সরবরাহ :

শিশু-বিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যাহ্ন ভোজনের বিশেষ ব্যবস্থা হওয়া উচিত, এ-কথাটা শিক্ষাবিদ্-মহলে স্বীকৃতি পেয়েছে। বিশেষ ক'রে প্রাক্-প্রাথমিক এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ে।

বিদ্যালয়ে ক্যানটিন :

পাশ্চাত্য দেশের অধিকাংশ শিশু-বিদ্যালয়েই ক্যানটিন আছে। যে সমস্ত ছাত্র দূরাঞ্চল থেকে আসে, যারা সময়মতো গরম ভাত খাওয়ার অবকাশ পায় না, তাদের জন্য আহার্য সরবরাহের বিশেষ প্রয়োজন। স্বল্প খরচে বা বিনা ব্যয়ে তাদের আহার্য দেওয়ার ব্যবস্থা হওয়া উচিত। তাতে যে শিশুদের স্বাস্থ্যোন্নতি হবে, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আমাদের দেশে এখনও এ ধরনের কোন ব্যবস্থা

অবলম্বিত হয়নি। এদেশের কোন কোন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রদের জলযোগের ব্যবস্থা করা হয়েছে, এই মাত্র। অর্থনৈতিক কারণে এদেশের অধিকাংশ অভিভাবক তাঁদের ছেলেমেয়েদের ঠিকমতো পুষ্টিকর খাদ্য খাওয়াতে পারেন না। সেই সমস্ত ছেলেমেয়ের জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ে খাদ্য-সরবরাহের একান্ত প্রয়োজন।

নিম্নলিখিত কারণে খাদ্য-সরবরাহের বিশেষ দরকার :—

(ক) শিশুদের উপযুক্ত শারীরিক শিক্ষার সুব্যবস্থা করতে হ'লে, প্রত্যেকটি শিশুকেই সুষম খাদ্য (Balanced diet) সরবরাহ করতে হবে। (খ) অপরিপুষ্ট শিশুদের দৈহিক প্রয়োজনোপযোগী খাদ্য সরবরাহের দরকার। (গ) কাদের কি ধরনের খাদ্য দিতে হবে, তা ডাক্তারী পরীক্ষায় নির্ণীত হওয়া উচিত। (ঘ) যে সমস্ত ছাত্রের বাড়তি পরিপূরক (Supplementary nourishment) পুষ্টিকর খাদ্যের প্রয়োজন, তাদের বিনা মূল্যে খাদ্য সরবরাহ করা ঠিক হবে না। তাদের স্বল্প মূল্যে সেই খাদ্য দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। (ঙ) সেই সমস্ত গরীব অভিভাবকদের (যাঁরা নিজ নিজ অবস্থার কথা জানিয়ে দরখাস্ত দেবেন) আবেদন-পত্র বিচার ক'রে ডাক্তারের নির্দেশমতো কেবল তাঁদের ছেলেমেয়েদের নিখরচায় খাদ্য সরবরাহ করতে হবে।

সুষম খাদ্যের দৈনন্দিন তালিকা :

সুষম খাদ্যের একটি মাসিক তালিকা প্রস্তুত করা উচিত। সেই তালিকা অনুসারে পাক্ষিক, সাপ্তাহিক এবং দৈনন্দিন আহার্য নির্বাচন ও গ্রহণের ব্যবস্থা করতে পারলে ভালো হয়। তাতে আহার্যের খাদ্যপ্রাণ এবং পরিবেশিত খাদ্যের বৈচিত্র্য বজায় থাকে। নিম্নে ১০ বছর বয়সের ছেলেমেয়েদের দৈনন্দিন সুষম আহার্যের (Balanced diet) একটি তালিকা দেওয়া গেল :—

প্রাতে—দুধ এক পোয়া, কিছু ফল	=২০০ ক্যালোরি
বেলা ১০টায়—ভাত ১ ছটাক, ডাল ½ ছটাক, তরকারি ১ ছটাক, দুখানা মাছ বা ডিম ১টা	=৭০০ ক্যালোরি
২টার সময়—রুটি ১ ছটাক, তরকারি ১ ছটাক, গুড় ½ ছটাক	=৩০০ ক্যালোরি
বৈকাল ৫টায়—মুড়ি বা চিড়া ½ ছটাক, ছোলা ½ ছটাক	=২০০ ক্যালোরি
রাত্রি ৮টায়—ভাত বা রুটি কিংবা লুচি ১ ছটাক, ডাল ½ ছটাক, তরকারি ১ ছটাক, দুধ ১ পোয়া	=৭০০ ক্যালোরি
	সর্বসমেত ২,১০০ ক্যালোরি

বয়স্কদের সুষম আহারের নমুনা :

সকালে—ছোলা-ভিজানো ১ ছটাক এবং গুড় ; সম্ভব হ'লে দুধ ১ পোয়া।

দ্বিপ্রহরে—এক পোয়া চালের ভাত, ডাল ২ ছটাক, তরকারি ২ ছটাক, মাছ অথবা মাংস ২ ছটাক।

বৈকালে—মুড়ি অথবা চিঁড়ে অথবা ছাতু ২ ছটাক কিংবা ফল ও গুড়।

রাত্রে—আটার রুটি ১ পোয়া, ডাল ২ চটাক, তরকারি ২ ছটাক।

খাদ্যের ক্যালোরির পরিমাণ ঃ

কার্বোহাইড্রেট্ ৮ ছটাক (আধ সের)	=১,৮৫৬ ক্যালোরি
প্রোটিন ২ ছটাক	= ৪৬৪ "
চর্বি জাতীয় খাদ্য ১½ ছটাক	= ৭৯২ "
	মোট ৩,১১২ ক্যালোরি

জল এবং অন্যান্য পানীয়

খাদ্যবস্তু ছাড়াও, দেহের জন্য কিছু তরল পদার্থের প্রয়োজন হয়। সেই তরল পদার্থের মধ্যে জলই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ পানীয়। জল ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে না ; এই কারণে জলের আর এক নাম জীবন। চারাগাছে জল সিঞ্চন না করলে যেমন গাছ শুকিয়ে যায়, দেহ-তরুও তেমনি জলাভাবে বাঁচতে পারে না। অধিকাংশ খাদ্যেই প্রচুর জলীয় উপাদান থাকে। জেলী-জাতীয় পদার্থ দেখতে ঘন মনে হ'লেও, তা সম্পূর্ণ জলের দ্বারা তৈরী। সকল রকম শাক-সবজীতেই জলীয় অংশ আছে। মাংসেও কিছু পরিমাণ জল থাকে। খাদ্যে যে পরিমাণ জল থাকে, তার দ্বারা দেহের জন্য যে জলের প্রয়োজন, সে উদ্দেশ্য সাধিত হয় না। খাদ্য যতই ভালো হোক না কেন, জল ছাড়া তা কখনই দেহসাৎ হ'তে পারে না। জলের সাহায্যে খাদ্যবস্তু তরল ও দ্রবীভূত হয়ে রক্তের সঙ্গে মিশ্রিত হয়। তারপর তা সর্বদেহে ছড়িয়ে পড়ে।

এ ছাড়া, জলের দ্বারা প্রস্তুত চা, কফি, কোকো, সরবৎ প্রভৃতি পানীয়ও আমরা গ্রহণ ক'রে থাকি। এগুলি কিন্তু প্রকৃত খাদ্যবস্তু নয়। দুধ থেকে আমরা যে শক্তি ও সামর্থ্য অর্জন করি, চা, কফি, কোকো প্রভৃতি সেই শক্তিকে জাগ্রত ক'রে দৈহিক অবসাদ দূর ক'রে দেয়। তাই মানুষ যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ে, শ্রম-জনিত অবসাদে দেহ যখন অবসন্ন হয়ে পড়ে, তখন চা-জাতীয় পদার্থ সেই ক্লান্তি অপসারিত ক'রে দেহকে সতেজ ও কার্যক্ষম ক'রে তোলে। চা বা কফিতে যে বস্তু আছে, তার দ্বারা পৈশিক ও মানসিক শক্তি নবোদ্যম লাভ করে। কিন্তু দেহ ক্লান্ত না হ'লেও যখন-তখন ঐ জাতীয় পদার্থ গ্রহণ করলে, তা দেহের পক্ষে ক্ষতিকর হ'তে পারে। দেহ যখন

প্রকৃতই অবসন্ন হয়, তখন প্রয়োজন বিশ্রাম এবং সেই ক্ষয়পূরণের উপযোগী খাদ্যবস্তু ; অন্য কোন উত্তেজক পানীয় নয়।

সদ্য-প্রস্তুত চা খাওয়া উচিত। অনেকক্ষণ কেৎলিতে ভিজানো থাকার ফলে যে চায়ের স্বাদ তেতো হয়ে উঠেছে, যে চা একাধিক বার গরম করা হয়েছে, সেই চায়ের পাতা থেকে যে ট্যানিনের সৃষ্টি হয়, তা দেহ-কলার (Tissues) পক্ষে ক্ষতিকর। এ ছাড়া, সেই চা রক্ত-সঞ্চয় ও পরিপাকেরও ব্যাঘাত ঘটায়। এই কারণে চা বা কফি ছোট ছেলেমেয়ের পক্ষে ভালো নয়।

জলের অন্যান্য ব্যবহারিক প্রয়োজন :

মানুষ ও জীবাদি পশুর জন্য জলের ত্রিবিধ প্রয়োজন :

১। (ক) প্রথম **দৈহিক প্রয়োজন**—দেহের কোষ পরিপুষ্টির জন্য যেমন প্রয়োজন খাদ্যের, তেমনি রক্তের তারল্য রক্ষা, রক্তস্থিত দূষিত পদার্থ নিষ্কাশন এবং পরিপাকের সহায়তার জন্য জলের প্রয়োজন। (খ) **গার্হস্থ্য প্রয়োজন**—খাওয়া-দাওয়া, রন্ধন ও ধৌত কার্যের জন্য জল অপরিহার্য। (গ) **ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা**—স্নান, হাত-পা ধোয়া, কাপড় কাচা প্রভৃতির জন্যও জলের একান্ত দরকার।

২। (ক) **ব্যবসায়-বাণিজ্য ও পৌরসভার** (মিউনিসিপ্যালিটির) উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রয়োজন। জলপথে আমাদের ব্যবসায়-বাণিজ্য চলে—এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাওয়া-আসা করা যায়। নদী, নালা, পুকুর প্রভৃতি মৎস্য-ব্যবসায়ের কেন্দ্র ; মৎস্যজীবীদের জীবিকা অর্জনের স্থল। (খ) **শহরাঞ্চলের পথ-ঘাট** পরিষ্কার রাখার জন্য জলের বিশেষ প্রয়োজন। রাস্তা ধৌত করা (কলিকাতা প্রভৃতি কর্পোরেশন অঞ্চলে), ধূলিবহুল রাস্তায় জল দেওয়া প্রভৃতি পৌরসভার কার্য। (গ) **ড্রেন, নর্দমা, পায়খানা** প্রভৃতি পরিষ্কার করার জন্য জলের প্রয়োজন অপরিহার্য।

৩। গবাদি পশু স্নান করানো, গাড়ি প্রভৃতি পরিষ্কার করার জন্যও জলের বিশেষ দরকার।

নিত্য কি পরিমাণ জলের প্রয়োজন :

দুটি জিনিসের উপর জলের পরিমাণ নির্ভর করে। যথা—(১) অভ্যাস ও গৃহবাসের মান যেমন, সেই পরিমাণে জলেরও প্রয়োজন। (২) স্বাস্থ্যকর ব্যবস্থা অবলম্বনের পদ্ধতি যেমন, তার উপরই জলের প্রয়োজন নির্ধারিত হয় ; বিশেষ ক'রে গৃহে এবং হাসপাতালে।

দৈনন্দিন জীবনে কি পরিমাণ জলের প্রয়োজন, পরপৃষ্ঠায় তার একটি তালিকা দেওয়া গেল :—

প্রয়োজনীয় জলের হিসাব ঃ

পানীয় হিসাবে	মাথা-পিছু	০·৩৫	গ্যালন জলের দরকার
রন্ধনাদির জন্য	"	০·৬৫	" " "
স্নান ও ধৌত কার্যের জন্য	"	৮·০০	" " "
বাসন-পত্র মাজা	"	৩·০০	" " "
ধোপাখানা	"	৩·০০	" " "
শৌচগৃহ, পায়খানা প্রভৃতি	"	৫·০০	" " "

এ ছাড়া, চিকিৎসালয়ে মাথা-পিছু ৪০—৫০ গ্যালন জলের দরকার হয়। কলিকাতা শহরে মাথা-পিছু বিশুদ্ধ জল লাগে ৪৫·৭ গ্যালন।

জলের উৎস কি ঃ

নদী, ঝরনা, খাল, বিল, পুকুর, কূয়া, টিউবওয়েল, কল প্রভৃতি হচ্ছে জলের উৎস। নদী, ঝরনা প্রভৃতি জলের স্বাভাবিক উৎস ; একে প্রকৃতি-কৃত বলা চলে। খাল, বিল, পুকুর প্রভৃতি কৃত্রিম জলাশয়। মানুষের প্রয়োজনে এগুলির সৃষ্টি। প্রকৃতি-কৃত জলাশয়ে যতদিন স্রোত প্রবাহিত থাকে, ততদিন সে জল সহজে দূষিত হয় না। বর্ষাকালে নদী প্রভৃতির জল বহু পদার্থের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে ঘোলা ও দূষিত হয়। কৃত্রিম জলাশয়ের জল সাধারণতঃ ব্যবহারের দোষে দূষিত হয়।

এখন জানা দরকার, **কিভাবে জল সরবরাহ হয়**। দুটি উপায়ে জল সরবরাহ করা চলে। প্রথমতঃ, **মানুষের দ্বারা**, দ্বিতীয়তঃ, **কলের সাহায্যে**। ব্যবহারের দোষে, পরিচ্ছন্নতা-বোধের অভাবে, অজ্ঞতার জন্য মানুষবাহী জল সহজেই দূষিত হয়। কলের জল কৃত্রিম উপায়ে সংশোধিত ; তা পাত্রাদির দোষে ছাড়া সহজে দূষিত হ'তে পারে না। এ ছাড়া, আর যে যে-কারণে জল দূষিত হয়, তা প্রায় সকলের জানা আছে। কাজেই, সে সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার কোন প্রয়োজন নেই।

স্বাস্থ্যকর ব্যবস্থা ও পরিবেশ

(১) নগর-পরিকল্পনা ও গৃহ-নির্মাণ

শহর বা গ্রামাঞ্চলের মানুষের অধিকাংশ সময় কাটে গৃহে। কার্যব্যপদেশে ৬।৭ ঘণ্টা সময় কাটে বাইরে, বাকী ১৭।১৮ ঘণ্টাই অতিবাহিত হয় গৃহাভ্যন্তরে। কাজেই, সেই গৃহ-পরিবেশ মনুষ্য-বাসোপযোগী এবং স্বাস্থ্যকর হওয়া উচিত। এইজন্য গৃহ-রচনার একটা নির্দিষ্ট পরিকল্পনা থাকা দরকার। রোদ, বৃষ্টি এবং ঠাণ্ডা থেকে যাতে মনুষ্য-জীবন রক্ষা পায়, যাতে গৃহ-পরিবেশে পর্যাপ্ত বিশুদ্ধ বায়ু চলাচল করে,

সূর্যালোকে পূর্ণ থাকে এবং সর্বোপরি মানুষ সুখে-স্বস্তিতে বসবাস করতে পারে, সেদিকে দৃষ্টি দেওয়াই গৃহ-রচনার প্রাথমিক লক্ষ্য হওয়া উচিত। কাজেই, গৃহ-রচনার সময় নিম্নলিখিত বিষয়ের দিকে দৃষ্টি দিতে হবে :—

(১) গৃহ-পরিবেশ কখনই স্যাঁতসেঁতে হওয়া উচিত নয়। (২) পর্যাপ্ত সূর্যালোক ও বায়ু-চলাচলের সন্তোষজনক ব্যবস্থা থাকা দরকার। (৩) জল-নিকাশের উপযুক্ত ব্যবস্থা, স্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টি এবং আবর্জনাদি ফেলার ব্যবস্থা থাকা দরকার। (৪) গৃহ-সংস্কারের সুব্যবস্থা থাকা উচিত। (৫) তাছাড়া, থাকা উচিত জল-সরবরাহের সুব্যবস্থা। (৬) বস্ত্রাদি ধৌত করার উপযুক্ত স্থান। (৭) খাদ্যাদি প্রস্তুত করার উপযোগী ভালো রন্ধনশালা। (৮) বায়ু-সঞ্চালনের সুব্যবস্থা আছে, এমন একটি শীতল ভাঁড়ার-ঘরে আহার্য রাখার ব্যবস্থা থাকা দরকার।

গৃহ-পরিবেশ শুষ্ক এবং ঋতুগত আবহাওয়া-প্রতিরোধক না হ'লে, গৃহ-পরিবেশ কখনই স্বাস্থ্যকর হ'তে পারে না। এজন্য ঘরের দেওয়াল দৃঢ়, ভিত মজবুত, ছিদ্রমুক্ত ঘরের ছাদ, ভালো ক'রে গোলা-ফেরানো দেওয়াল, বৃষ্টির জল নিকাশের নালি প্রভৃতির সুব্যবস্থাও থাকা দরকার। জল-সরবরাহ, জল-নিকাশের উপায়, নর্দমা প্রভৃতির ব্যবস্থা শহর ও গ্রামে পৃথক। শহরে কর্পোরেশন ও পৌর ব্যবস্থার কল্যাণে অনেক স্থানেই গৃহবাসের উপযোগী বিবিধ স্বাস্থ্যকর ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়েছে। এখনও গ্রামের জন-স্বাস্থ্যের দিকে তেমন নজর দেওয়া হয়নি।

ঘন বসতির অসুবিধা :

স্থানাভাববশতঃ শহরের শিল্পাঞ্চলেই অসম্ভব ঘন বসতি দেখা যায়। সে অবস্থাটা কেবল গৃহবাসের অনুপযোগী ও অস্বাস্থ্যকর নয়, পরিকল্পিত নগর-নির্মাণের বিশেষ অন্তরায়ও বটে। এই ঘন বসতি অঞ্চলের জন-স্বাস্থ্য কখনই ভালো হ'তে পারে না। সেখানে যে ব্যাধি ও অসুস্থতার প্রকোপ দেখা যায়, বিশেষ ক'রে ছোট ও কিশোর শিশুদের মধ্যে, তার ফলে ঘন বসতি অঞ্চলের মৃত্যুহারও অনেক বেশী। এ ছাড়া, ঘন বসতি অঞ্চলের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে,—মুক্ত আলো-বাতাসহীন অন্ধকারে যে শিশু জন্মলাভ ক'রে আমৃত্যু বসবাস করবে,—সেই শিশুদের ভবিষ্যৎ-ও কেবল অন্ধকারময় হবে না, নানাবিধ পাপ-পরিতাপে, দুঃখ-ব্যাধিতে ভ'রে উঠবে। এর প্রতিকারের উপায় কি? উপায়—সুপরিকল্পিত নগর ও গ্রাম নির্মাণের ব্যবস্থা করা। লণ্ডন শহরের পরিসংখ্যান থেকে জানা গেছে যে, ১২,০০০-এরও অধিক এক-কক্ষবিশিষ্ট গৃহে চার-পাঁচ জন লোক বসবাস করে। এটা ব্যক্তি-স্বাস্থ্যের পক্ষে অবাঞ্ছিত অবস্থা। বিনা পরিকল্পনায় যেমন-তেমন ভাবে গৃহ নির্মাণ করার দোষে এই অবস্থার উদ্ভব হয়েছে। এইজন্য নগর-পরিকল্পনার প্রয়োজন।

(২) বিশুদ্ধ জল সরবরাহ

জল-সরবরাহ হচ্ছে নগর বা পল্লী জীবনের দ্বিতীয় পর্যায়ের ব্যবস্থা। গ্রাম্য জনসাধারণ সচরাচর কূপ, ঝরনা, নদী বা হ্রদের জল ব্যবহার ক'রে থকে। অগভীর নদী বা কূপের জল পরিশুদ্ধ ক'রে ব্যবহার করা উচিত। কারণ, নদীর জল মল-মূত্র, গবাদি পশু, গৃহ-আবর্জনা দ্বারা এবং বাণিজ্য-ব্যপদেশে দূষিত হয়। কূপের জল যাতে আঁস্তাকুড়, পচা গোবর এবং গলিত জীব-দেহের দ্বারা দূষিত না হয়, সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে। শহরে যেভাবে কলের জল সরবরাহ হয়, তাতে সে জল দূষিত হওয়ার তেমন কোন আশঙ্কা থাকে না। তবে উৎস-মুখে, জল-সরবরাহকালে যাতে সেই জল কোনক্রমে দূষিত না হয়, সেদিকেও লক্ষ্য রাখা কর্তব্য। সাধারণতঃ দুটি উপায়ে নদীর জল দূষিত হয়; যথা—কলেরা, টাইফয়েড প্রভৃতি রোগের জীবাণুতে এবং সীসা-জাতীয় পদার্থের রাসায়নিক সংমিশ্রণে। সুতরাং, যখনই জলের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে কোন সন্দেহ জাগবে, তখনই সে জল ফুটিয়ে খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। জলের পাইপের মুখে যে সীসা থাকে, সেগুলি ভালভাবে আচ্ছাদিত না হ'লে, জল দূষিত হ'তে পারে। সীসা-মিশ্রিত জল সিদ্ধ করলেও নির্দোষ হয় না।

(৩) আবর্জনা নিষ্কাশনের ব্যবস্থা

শহর ও গ্রামের আবর্জনা-নিষ্কাশনের ব্যবস্থা পৃথক। গ্রাম্য ব্যবস্থা প্রায়শঃ ব্যক্তিগত, শহরের ব্যবস্থা সর্বসাধারণের উপযোগী। গ্রামে যেখানে স্থানাভাব নেই, সেখানে সুবিধামতো স্থানে মল-মূত্রাদি আবর্জনা পুঁতে ফেলার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। সেগুলি জমির সারের কাজে লাগবে। কিন্তু শহরের আবর্জনাদি পরিষ্কার করার ব্যাপারে, স্থানীয় স্বাস্থ্য-বিভাগীয় লোকদের চেষ্টা এবং জনসাধারণের সহযোগিতা ভিন্ন সে কাজ সুসম্পন্ন হ'তে পারে না। শহরে ত্রিবিধ আবর্জনাদি পরিষ্কারের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রয়োজন হয়। সেগুলি হচ্ছে—যথাক্রমে ঘরের আবর্জনা, ব্যবসায়-কেন্দ্রস্থলের আবর্জনা এবং রাস্তার নোংরা মল-মূত্রাদি ও ময়লা জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা।

শহরে সাধারণতঃ জল-প্রবাহ-পথে মল-মূত্রাদি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা চালু আছে। গ্রামে গর্ত বা নর্দমা-পথের সাহায্যে সে কার্য সাধিত হয়। জল-প্রবাহ-পদ্ধতি (Water carriage system)-র সুবিধা হচ্ছে যে, (১) মল-মূত্রাদি বাসগৃহ থেকে বহু দূরে অনতিবিলম্বে নিষ্কাশিত হয়, পায়খানা বা গর্তে একাধিক দিন থাকে না। (২) তা ভূগর্ভস্থ নালা বা নর্দমা পথে নির্গত হয়ে যায়।

(৪) সংক্রামক ব্যাধি নিবারণের উপায়

যে ব্যাধি সহজেই সংক্রামিত হয়, তাকে সংক্রামক ব্যাধি বলে। দেহ থেকে দেহান্তরে ছড়িয়ে পড়াই ছোঁয়াচে রোগের ধর্ম। জল, বাতাস, মাছি এবং সংস্পর্শের দ্বারা ছোঁয়াচে রোগ সহজেই সংক্রামিত হয়। শিশুদের মধ্যে সাধারণতঃ এই সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপ দেখা যায়; যথা—হাম, হুপিংকফ, মিনমিনে, ডিপ্‌থিরিয়া, খোস-পাঁচড়া, চুলকানি, বসন্ত প্রভৃতি। বিশেষ ধরনের সংক্রামক ব্যাধিগুলি হচ্ছে—যথাক্রমে পেডিকুলোসিস্, ইম্‌পেটিগো, দাদ প্রভৃতি। বংশগত সংক্রামক ব্যাধি হচ্ছে যক্ষ্মা, সিফিলিস্ প্রভৃতি। কলেরা, প্লেগ, বসন্ত, টাইফয়েড, ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা প্রভৃতি ব্যাধির প্রকোপ ঋতু-পরিবর্তনের সময় দেখা যায়।

সংক্রামক ব্যাধির প্রতিষেধক উপায় নির্ণয়ের আগে জানা দরকার রোগের জীবাণু ও তার ক্ষেত্র কি, এবং কেমনভাবে তা ছড়িয়ে পড়ে। তা না হ'লে ব্যাধি-নিবারণের নির্ভুল প্রতিষেধক ব্যবস্থা কেমন ক'রে অবলম্বিত হবে?

জীবাণুর প্রকৃতি :

অতি-শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্রে যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কীট বাতাসের ধূলিকণায় জমে থাকতে দেখা যায়, তাকে জীবাণু বলে। এই জীবাণু দ্বারা রোগ সংক্রামিত হয়। জীবাণু সম্পর্কে সাধারণের মনে ভ্রান্ত ধারণা আছে। অনেকেই মনে করেন যে, এগুলির সম্পর্ক প্রাণি-জগতের সঙ্গে; আসলে এগুলি কিন্তু প্রাণী নয়, সর্বনিম্ন পর্যায়ের উদ্ভিদ-মাত্র। এগুলির মধ্যে দুটি শ্রেণী আছে; এক হচ্ছে মানব-বন্ধু—যার দ্বারা কোন ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা নেই, বরং সেগুলি কৃষি ও শিল্পের সহায়ক। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে—যেগুলি রোগ-জীবাণু বহন করে, তার সংখ্যাও অল্প।

কেমন ক'রে জীবাণু দেহে প্রবেশ করে :

এখন জানা দরকার, কেমন ক'রে জীবাণু মানব-দেহে প্রবেশ করে। সাধারণতঃ নিশ্বাসের সঙ্গে, আহার্য ও পানীয় মাধ্যমে এবং ত্বকের সাহায্যে সংক্রামক ব্যাধির জীবাণু মানব-দেহে প্রবেশ করে। জীবাণুগুলি এত ক্ষুদ্র এবং হাল্কা যে, জলীয় বাষ্প, বায়ু বা অন্য কোন মাধ্যম ছাড়া এরা জীব-দেহে প্রবেশ করতে পারে না। প্রখর সূর্যালোকে যেমন ছোট চারাগাছ বাঁচতে পারে না, এরাও তেমনি সূর্যালোকে জীবিত থাকতে পারে না। এদের জীবন-ধারণের জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত খাদ্য এবং স্যাঁতসেঁতে পরিবেশ। জড় পদার্থের চেয়ে মানুষের দ্বারাই বেশীর ভাগ সংক্রামক ব্যাধি বিস্তারলাভ করে। মানব-দেহের অনুরূপ উত্তাপেই এই জীবাণুরা বেঁচে থাকতে পারে।

কেমন ক'রে জীবাণুগুলিকে পরিহার করা যায়ঃ

সর্বব্যাপী যে জীবাণুর বিস্তৃতি, তার বিলোপসাধন করা অসম্ভব। কেমন ক'রে তাদের পরিহার ক'রে চলা যায়, সে কথাটাই আমাদের ভাবতে হবে। দেহ নীরোগ ও শক্তিশালী হ'লে, তার রোগ-প্রতিষেধক শক্তি বৃদ্ধি পায়। প্রথমতঃ, আমাদের সেই প্রচেষ্টাই করতে হবে। জীবাণুর অনুকূল ক্ষেত্র ও পরিবেশের সংস্কার করতে পারলে, অনেক সংক্রামক ব্যাধির আক্রমণ থেকে রেহাই পাওয়া যায়। **কৃত্রিম প্রতিষেধক ব্যবস্থা অবলম্বনের দ্বারাও** (যেমন—টীকা দেওয়া, পরিবেশ পরিশুদ্ধ করার ঔষধ-পত্রাদির ব্যবস্থা) সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপ কমানো যায়। মশার অনুকূল ক্ষেত্রে পচা জলাশয়াদি এবং বন-জঙ্গল। সেগুলি সংস্কারের ফলে গ্রামে গ্রামে ম্যালেরিয়া ব্যাধির সেই ভয়াবহ প্রকোপ আর নেই। সতর্ক ব্যবস্থা অবলম্বনের ফলে টাইফয়েড রোগও কমে এসেছে। পাশ্চাত্য দেশে **স্বাস্থ্যকর পরিবেশে বসবাস** এবং **পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণের ফলে** বহুলাংশেই যক্ষ্মা ব্যাধির বিস্তার কমে এসেছে।

সংক্রামক ব্যাধির প্রসারঃ

এখন জানা দরকার, কেমন ক'রে সংক্রামক ব্যাধি ছড়িয়ে পড়ে। পূর্বেই বলেছি, মানুষের দ্বারাই সংক্রামক ব্যাধি বেশী বিস্তারলাভ করে। হাঁচি, কাশি দ্বারাই সরাসরিভাবে একজনথেকে অন্যজনে ক্ষয়রোগ সংক্রামিত হ'তে পারে। এই হাঁচি ও কাশির সময় নাকে মুখে রুমাল চাপা দেওয়া উচিত। উন্মুক্ত আলো-বাতাসের শুষ্ক পরিবেশে জীবাণু অধিকক্ষণ বাঁচতে পারে না। তার বিপরীত পরিবেশে জীবাণু বহুক্ষণ বেঁচে থাকে। এ ছাড়া, কীট-পতঙ্গ, জল, বাতাস প্রভৃতি দ্বারাও সংক্রামক ব্যাধি প্রসারলাভ করে। মানুষের অসাবধানতার দোষেই সংক্রামক ব্যাধি যে পরিমাণে বিস্তারলাভ করে, অন্য কোন উপায়ে সেভাবে সংক্রামক ব্যাধি প্রসারলাভ করতে পারে না।

হামজ্বর অথবা ডিপ্‌থিরিয়া—হামজ্বর, মিনমিনে প্রভৃতি অসুখ ছোটদের বেশী হয়। ছোঁয়া-ছুঁয়ি ও মেলামেশায় দ্বারাই এই রোগ সংক্রামিত হয়। ডিপ্‌থিরিয়া সর্বতোভাবে মানুষ-বাহী ব্যাধি। অনেকের ধারণা আছে—ড্রেন-নর্দমার দূষিত আবহাওয়া থেকে ডিপ্‌থিরিয়া রোগের উৎপত্তি হয়। কথাটা ঠিক নয়। মানুষের গলায় সাধারণতঃ এই রোগের জীবাণু সঞ্চিত থাকে। জ্বর হয়নি, এমনকি বাইরে ব্যাধির কোন লক্ষণ-ও নেই, এমন লোকের দ্বারাও ডিপ্‌থিরিয়া ব্যাধি সংক্রামিত হ'তে দেখা যায়। গলার ঘা বা ক্ষতস্থান থেকেই এই ব্যাধির জীবাণু সংক্রামিত হয়। অবশ্য ড্রেন-নর্দমার স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়া থেকেই গলায় ঘা হ'তে দেখা যায়।

হামজ্বর বা মিনমিনে এমনই ছোঁয়াচে রোগ যে, শত প্রতিষেধক ব্যবস্থা অবলম্বন ক'রেও কিছুতেই তার আক্রমণ থেকে শিশুদের রক্ষা করা না। তাই কোন বাড়ীতে একটি ছোট ছেলের ঐ অসুখ করলে, অপর ছোট ছেলেরা সে আক্রমণ থেকে কিছুতেই রেহাই পায় না। হামজ্বর কঠিন শিশু-ব্যাধি; একে কোনক্রমেই অবহেলা করা উচিত নয়।

সংক্রামক ব্যাধি নিবারণের দায়িত্ব দ্বিবিধ—**ব্যক্তিগত ও সামাজিক** সর্বক্ষেত্রে ব্যক্তি-প্রচেষ্টাই মুখ্য, সামাজিক প্রচেষ্টা অপেক্ষাকৃত গৌণ। ব্যাধির সংক্রমণ বন্ধ করার প্রথম উপায় হচ্ছে **পৃথকীকরণ করা**; অর্থাৎ, রোগীকে আলাদা ঘরে রাখা বা হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করা। দ্বিতীয়তঃ হচ্ছে **প্রতিষেধক ব্যবস্থা অবলম্বন**; যথা, টীকা নেওয়া প্রভৃতি*। তৃতীয়তঃ হচ্ছে **রোগীর ব্যবহৃত বস্ত্র-সরঞ্জামাদি গরম জলে ফুটিয়ে নেওয়া** অথবা **রাসায়নিক নির্বীজন করা** (disinfection)। এসব ক্ষেত্রে **রোগীর ব্যক্তিগত কর্তব্য ও সতর্কতার গুণেই রোগের সংক্রমণ বন্ধ হ'তে পারে**। অন্য ভাবে তা সম্ভবপর নয়।

দেহের প্রতিষেধক শক্তি :

সুস্থ সবল দেহ সহজে অসুস্থ হয় না। তার কারণ, সুস্থ দেহের রোগ-প্রতিষেধক শক্তি বেশী। প্রতিনিয়তই নানাভাবে কত জীবাণু আমাদের শরীরে প্রবেশ করে; তথাপি আমরা নিত্য ব্যাধিগ্রস্ত হই না। তার কারণ কি? তার কারণ, আমাদের রক্তের মধ্যে যে-সব শ্বেত-কণিকা আছে, তারা আমাদের অন্দরমহলের পাহারাদার। দেহের পক্ষে ক্ষতিকর এমন কোন বাইরের জিনিস বা জীবাণু শরীরের ভিতরে প্রবেশ করলেই, শ্বেত-কণিকাদের সঙ্গে তাদের লড়াই বাধে। জীবাণুদের কাছে যখন শ্বেত-কণিকারা পরাস্ত হয়, তখনই ব্যাধি আত্ম-প্রকাশ করে। এই যে ব্যাধিকে রোধ করবার ক্ষমতা, সেটাই হচ্ছে দেহের রোগ-প্রতিষেধক শক্তি। দেহের রোগ-প্রতিষেধক শক্তি দু'প্রকার; যথা—(১) **স্বাভাবিক** ও (২) **অর্জিত**। সুস্থ সবল দেহের যে নিজস্ব প্রতিষেধক ক্ষমতা আছে, সেটাই হচ্ছে দেহের স্বাভাবিক রোগ-

* ১৯৫৩ সালে ১৬টি ম্যালেরিয়া কণ্ট্রোল-ইউনিট্-এর সাহায্যে ঘরে ঘরে রাসায়নিক দ্রব্যাদি ছড়িয়ে ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধক ব্যবস্থা পশ্চিমবঙ্গে গৃহীত হয়। ন্যাশনাল ম্যালেরিয়া কণ্ট্রোল প্রোগ্রামের অধীনে এই রাজ্যের ম্যালেরিয়া-অধ্যুষিত অঞ্চলের ১ কোটি ৬০ লক্ষ লোকের স্বাস্থ্যরক্ষার্থে এই ব্যবস্থা। ১৯৫৬-৫৭ সালে মোট ২ কোটি ৩০ লক্ষ অধিবাসীকে ম্যালেরিয়ার আক্রমণ থেকে রক্ষা করা সম্ভব হয়। ম্যালেরিয়ার জীবাণু সম্পূর্ণ বিতাড়িত করাই এই পরিকল্পনার লক্ষ্য। [ম্যালেরিয়া উচ্ছেদ সপ্তাহ উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রচারিত।]

প্রতিষেধক শক্তি। অর্জিত রোগ-প্রতিষেধক শক্তিও স্বাভাবিক এবং কৃত্রিম উপায়ে আসতে পারে। একবার বসন্ত হ'লে, দেহে যে স্বাভাবিক উপায়ে বসন্ত রোগ-প্রতিষেধক শক্তি জন্মে, তাকে স্বাভাবিক উপায়ে অর্জিত কৃত্রিম রোগ-প্রতিষেধক শক্তি বলে। টীকা নেবার ফলে যে রোগ-প্রতিষেধক শক্তি বৃদ্ধি পায়, সেটাই হচ্ছে কৃত্রিম উপায়ে অর্জিত রোগ-প্রতিষেধক শক্তি। কিভাবে এই রোগ-প্রতিষেধক শক্তি বৃদ্ধি পায়, কোন্ কোন্ আহার্য গ্রহণ করলে সেই শক্তি প্রবল হয়, তা জানা থাকলে স্বাভাবিক উপায়ে রোগ-প্রতিষেধক শক্তি বাড়ানো যায়।

কতকগুলি সাধারণ সংক্রামক ব্যাধি ঃ

হামজ্বর সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। এর লক্ষণ ও রোগ-ভোগের সময় সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। হামজ্বর দেহ থেকে দেহান্তরে বিস্তারলাভ করে। এই অসুখের পূর্বে লক্ষণ হচ্ছে সর্বদেহে ব্যথা, চোখ-মুখ লাল হওয়া, সর্দির ভাব, খুব বেশী জ্বর ; তারপরই দেহে ও মুখে মশার কামড়ের মতো লাল লাল গুটি দেখা দেয়। এর রোগভোগের সময় হচ্ছে সংক্রমণের পর থেকে ১২ দিন। চারদিনের আগে অনেক সময় রোগের কোন লক্ষণই ধরা পড়ে না। সেই সময়টাই সংক্রমণ বেশী হয়। হামজ্বর কঠিন শিশু-ব্যাধি। এই জ্বরে বহু ছেলের মৃত্যু হ'তে দেখা যায় ; বিশেষ ক'রে শিশু-বিদ্যালয়ের বয়সের ছেলেমেয়েদের মধ্যে।

হুপিংকফ—হামজ্বরের মতোই হুপিংকফ আর একটি কঠিন শিশু-ব্যাধি। এই ব্যাধিতেও শিশু-মৃত্যুর হার কম নয়। শিশু থেকে শিশুদের মধ্যে এই রোগ বিস্তার লাভ করে। এই রোগভোগের সময় হচ্ছে এক পক্ষ। প্রথমদিকে এ রোগ নির্ণয় করা কঠিন ; কারণ, সাধারণ কাশির মতো ব'লেই মনে হয়। এ রোগের লক্ষণ কাশির ধমকে চোখ-মুখ লাল হওয়া, দম আট্‌কে আসা, কাশতে কাশতে বমি ক'রে ফেলা প্রভৃতি।

ডিপ্‌থিরিয়া—ডিপ্‌থিরিয়া কষ্টদায়ক এবং ভয়াবহ ব্যাধি। এতে মৃত্যুর আশঙ্কা সমধিক। এই রোগভোগের সময় স্বল্প। গলা ফোলা ও গলার ঘা এ রোগের প্রধান লক্ষণ। রোগীর গলায়, নাকে ও কানে এ ব্যাধির জীবাণু সঞ্চিত থাকে। অর্জিত প্রতিষেধক শক্তিই এ ব্যাধি প্রতিকারের একমাত্র উপায়।

টাইফয়েড—বর্তমানে কৃত্রিম প্রতিষেধক ব্যবস্থা অবলম্বনের ফলে টাইফয়েড ব্যাধির সংক্রমণ অনেকটা কমে এসেছে। টাইফয়েড অতি মারাত্মক ব্যাধি। এ ব্যাধির জীবাণু রোগীর মল-মূত্রের সঙ্গে নির্গত হয়। জলের দ্বারা এই রোগ সংক্রামিত হয়। এর রোগভোগের সময় ১৫ থেকে ৪১ দিন পর্যন্ত। ঔষধের চেয়ে সেবা-শুশ্রূষাই এই ব্যাধির প্রধান চিকিৎসা।

প্লেগ—প্লেগ আর একটি মারাত্মক ব্যাধি। গাল-গলার গ্ল্যাণ্ড ফোলা, অসম্ভব যন্ত্রণা, জ্বর, শ্বাসকষ্ট এই ব্যাধির প্রধান লক্ষণ। ইঁদুরের দ্বারাই এই ব্যাধি সংক্রামিত হয়। এর রোগভোগের সময় পক্ষকাল, কি তারও বেশী। টীকা নেওয়াই এ রোগের একমাত্র প্রতিষেধক ব্যবস্থা। ফ্লি নামক জীবাণু বা কীট থেকে এই ব্যাধি সংক্রামিত হয়। ফ্লি ১ থেকে ১½' লাফাতে পারে। কাজেই, প্লেগে-মরা ইঁদুরের অতি সন্নিকটে যাওয়া উচিত নয়।

যক্ষ্মা—রোগের রাজা যক্ষ্মা। এর চেয়ে মারাত্মক ব্যাধি আর নেই। পূর্বে এ রোগের কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয়নি। বর্তমানে সে অসুবিধা দূরীভূত হয়েছে। এখন জানা দরকার, কি কি কারণে ক্ষয়রোগ হয়। ক্ষয়রোগগ্রস্ত লোকের সংস্পর্শে এলে, আলো-বাতাসহীন অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বসবাস করলে, দীর্ঘদিন পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব ঘট্‌লে এবং অতিরিক্ত পরিশ্রম করলে এই রোগ হ'তে পারে। এ ছাড়া, ক্ষয়রোগগ্রস্ত গরুর দুগ্ধপানের ফলেও যক্ষ্মা হ'তে পারে। সুস্থ দেহে এই রোগ-প্রতিষেধক শক্তি আছে; তা ক্ষয়রোগের আক্রমণকে প্রতিরোধ করে। কিন্তু দেহ যখন দুর্বল হয়ে পড়ে, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের প্রভাবে যখন প্রতিষেধক শক্তি কমে আসে, তখন এই রোগ মানুষের শরীরে আত্ম-প্রকাশ করে। এই রোগের ব্যাসিলি অতিশয় ক্ষুদ্র, খালি চোখে তাদের দেখা যায় না। দেশলাইয়ের একটি কাঠিকে বহু খণ্ডে বিভক্ত করলে যেমন দেখতে হয়, ব্যাসিলি-র আকৃতিও তদ্রূপ। শিশু-দেহের বিভিন্ন অংশে, হাতের, পায়ের, পাঁজরার হাড়ে, মগজে, এমনকি ত্বকের নীচে, এই ব্যাধি আত্ম-প্রকাশ করে।

এই রোগের হাত থেকে রেহাই পেতে হ'লে প্রয়োজন—(১) স্বাস্থ্যকর জীবন-যাপন, পুষ্টিকর খাদ্য, মুক্ত প্রাঙ্গণের আলো-বাতাসে ব্যায়াম করা এবং উপযুক্ত নিদ্রা ও বিশ্রাম, অতিরিক্ত শ্রম না করা, ভাবনা ও উৎকণ্ঠা থেকে মনকে মুক্ত রাখা, প্রভৃতি। নিশ্বাসের সঙ্গে যদিও সামান্য পরিমাণ এই রোগের জীবাণু শরীরে প্রবেশ করে, তথাপি দেহের কোন ক্ষতি হয় না। কিন্তু এই রোগ-সংক্রমিত ঘরে রাত্রিবাস করলে, নিশ্বাসের সঙ্গে যখন পর্যাপ্ত পরিমাণে এই রোগের জীবাণু শরীরে প্রবেশ করে, তখনই এই ব্যাধি জীব-দেহে আত্ম-প্রকাশ করে। থুথু, মাছি, দুধ এবং উচ্ছিষ্ট খাদ্যের মারফতে এই রোগ বেশী সংক্রামিত হয়।

প্রতিকারের পন্থাগুলি কি?—এই রোগ থেকে অব্যাহতি পাওয়ার যতগুলি উপায় আছে, প্রথমেই সেইগুলিকে জানা দরকার। অর্থাৎ, এই রোগ সম্পর্কে সর্বাগ্রে সঠিক ধারণা থাকা প্রয়োজন। জানা দরকার যে, এই রোগের জীবাণু ধূলির মধ্যে, স্যাঁতসেঁতে অন্ধকার ঘরে, বিশেষ ক'রে অপরিচ্ছন্ন গৃহ-পরিবেশে, মাসাধিক

কাল জীবিত থাকে। কিন্তু সূর্যালোকে, আগুনে, ফুটন্ত জলে এই রোগের জীবাণুগুলি অল্পক্ষণেই মারা যায় এবং উপযুক্ত নির্বীজন (disinfection)-এও এরা বিনষ্ট হয়। কাজেই, যেখানে সংক্রমণ-মুক্ত বিশুদ্ধ দুধ পাওয়ার উপায় নেই, সেখানে ভালো ক'রে দুধ জাল দিয়ে খাওয়ার ব্যবস্থা করা উচিত।

পুষ্টিকর খাদ্য*, বিশুদ্ধ আলো-বাতাস ছাড়াও, দরকার স্বাস্থ্যকর অভ্যাসের এবং পরিচ্ছন্ন পরিবেশের। হাঁচি বা কাশির সময় মুখে রুমাল দিয়ে হাঁচা বা কাশার অভ্যাস করা উচিত। এ ছাড়া যেখানে-সেখানে থুথু ফেলা কখনও উচিত নয়। এই কারণে বিশুদ্ধ বাতাসের সঙ্গে হাত-পা-দেহ থেকে গৃহ-পরিবেশ পর্যন্ত পরিচ্ছন্ন রাখার বিশেষ প্রয়োজন। ছোট ছেলেদের ক্ষেত্রে এই ব্যাধির আক্রমণ ফুস্‌ফুস্‌ অপেক্ষা দেহের অন্যান্য অঙ্গে, যেমন—মগজের ঝিল্লি, উদর, হাড় প্রভৃতিতে বেশী হ'তে দেখা যায়। ১০ বছরের শিশুদের শতকরা ৫০ জন বিভিন্ন ধরনের ক্ষয়রোগে মারা যায়। শিশু-দেহে দুধের সংক্রমণ ও মনুষ্য-নিশ্বাসে দূষিত বাতাস থেকে এই ব্যাধি অনুপ্রবেশ করে।

কেমন ক'রে চর্মরোগের সংক্রমণ ব্যাহত করা যায় ?—অপরিচ্ছন্নতা থেকে শিশু-দেহে **পেডিকুলোসিস্‌**, কাউর ঘা, দাদ, খোস প্রভৃতি রোগ আত্ম-প্রকাশ করে। এ ছাড়া, সংস্পর্শ-দোষে, অন্যের জামা-কাপড়-গামছা ব্যবহারের ফলে শিশুদের মধ্যে নানাপ্রকার চর্মরোগ দেখা দেয়। কাজেই, শিশুদের ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতার দিকে প্রথমেই নজর দিতে হবে। এইজন্য শিশুরা যাতে একে অন্যের জামা, কাপড়, টুপি, গামছা, চিরুনি ব্যবহার না করে, সে শিক্ষা দিতে হবে।

পরিচ্ছন্ন অভ্যাস-গঠনের জন্য শিশুদের দুটি বিষয় শিক্ষা দিতে হয় ঃ—প্রথমতঃ, পরিচ্ছন্নতা এবং পৈশিক ব্যায়ামের দ্বারা দেহ-ত্বকের স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে। রোগগ্রস্তদের সংস্পর্শে থাকার অভ্যাস ত্যাগ করতে হবে। উদহারণস্বরূপ বলা চলে যে, বসন্ত, চোখ-ওঠা, হামজ্বর, মিনমিনে, দাদ প্রভৃতি চর্মরোগ স্পর্শ-দোষেই বিস্তার লাভ করে।

সংক্রামক ব্যাধি নিরোধের ব্যবস্থা-পত্র

ব্যাধির নাম	রোগভোগের সময়	সংক্রমণ-মুক্ত সময়	পৃথকীকরণের ব্যবস্থা
ডিপ্‌থিরিয়া	২—১০ দিন	জীবাণুতত্ত্ববিদের পরীক্ষান্তে	চার সপ্তাহ
মামস্‌	১৪—১৮ „	৩০ দিন পরে	দু'সপ্তাহ—ফুলা না কমা পর্যন্ত
হাম	৭—১৪ „	১৬ „ „	কমপক্ষে দশ দিন

* কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বিবরণী থেকে জানা গেছে যে, পুষ্টিকর খাদ্যাভাবে শতকরা ৩৮ জন, টন্‌সিলে ৩৪ জন, দৃষ্টির দোষে ৩১ জন, দাঁতের রোগে ১৯ জন এবং টি. বি.-তে ২৩ জন ভুগছে।

বিঃ দ্রঃ। সর্বক্ষেত্রে রোগীর ব্যক্তিগত সতর্কতা এবং অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা অবলম্বনের বিশেষ প্রয়োজন। ব্যক্তিগত অসতর্কতাই সমস্ত ব্যবস্থাকে ভেস্তে দিতে পারে, একথা মনে রাখতে হবে।

ব্যাধির নাম	রোগভোগের সময়	সংক্রমণ-মুক্ত সময়	পৃথকীকরণের ব্যবস্থা
মিনমিনে	৯—১০ দিন	২১ দিন পরে	কমপক্ষে সাত দিন
হুপিংকফ	৭—১৯ "	২১ " "	দু'সপ্তাহ, বেশী হলে, চার সপ্তাহ
হামজ্বর	১—৮ "	১০ " "	চার সপ্তাহের কম নয়
পানিবসন্ত	১১—১৯ "	২১ " "	মামড়ি উঠে না যাওয়া পর্যন্ত
বসন্ত	১০—১৪ "	১৬ " "	ঐ
খোস-পাঁচড়া	...	...	না সারা পর্যন্ত
দাদ	...	...	ঐ
ইনফ্লুয়েঞ্জা	৩—৪১ "	৭ " "	এক সপ্তাহ পর্যন্ত
কলেরা	১—৭ "	১০ " "	রোগ না সারা পর্যন্ত
টাইফয়েড	১৫—৩০ বা আরও বেশী	৯ সপ্তাহ	রোগ না সারা পর্যন্ত

গ্রাম্য স্বাস্থ্য

গ্রামীণ সভ্যতার দেশ ভারতবর্ষ। এখানকার বারো আনা লোকই গ্রামে বাস করে। এ হেন যে গ্রাম-সর্বস্ব ভারতবর্ষ, তার গ্রাম্য স্বাস্থ্যের উপরই জাতীয় স্বাস্থ্য অনেকখানি নির্ভরশীল। অথচ সেই গ্রামবাসীদের ব্যক্তি ও সমাজ স্বাস্থ্য সম্পর্কে কোন চেতনা নেই। তারা যেন জেগেই ঘুমিয়ে আছে। অশিক্ষায়, কুশিক্ষায়, অজ্ঞতায় এবং দারিদ্র্যে তাদের অভিশপ্ত জীবন যেমন দুর্বিষহ, তেমনি তাদের ভবিষ্যৎ-ও অন্ধকার। তারা যেন ইহকালকে খুইয়ে, পরকালকে ভাগ্যের হাতে সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্ত আছে। কে তাদের জীবন-সম্ভাবনার পথ দেখাবে? অনিশ্চয়তার অন্ধকার আর দুঃখ-দুর্ভোগের হাত থেকে কে তাদের বাঁচাবে?

স্বাধীন ভারতবর্ষের সামনে আজ এই প্রশ্ন প্রকট হয়ে উঠেছে। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় গ্রামোন্নয়নের কথা প্রথম পর্যায়ে স্থান পেয়েছে। আজ গ্রাম সংস্কার ও সংগঠনের আশু প্রয়োজন। নইলে জাতীয় প্রগতি বিঘ্নিত হবে, দেশের ভবিষ্যৎ জাতীয় জীবনের পথ অনেক পিছিয়ে যাবে। তাই সর্বাগ্রে জানা দরকার, গ্রাম্য স্বাস্থ্যের জন্য দায়ী কে? গ্রামবাসী। গ্রামের লোকই গ্রামের মঙ্গল করতে পারে, বাইরের লোকের দ্বারা তা সম্ভব নয়। কাজেই, পল্লীবাসীদের গ্রাম্য স্বাস্থ্য সম্পর্কে সর্বাগ্রে সচেতন ক'রে তুলতে হবে। গ্রামবাসীদের এতকালের নিশ্চেষ্টতার ঘুম ভাঙাতে না পারলে, গ্রাম্য জাগরণ আসবে না।

কিন্তু সেই পথের অন্তরায় অনেক। সমস্ত প্রচেষ্টার পদে পদেই নানাবিধ বাধা। বহুকালের অজ্ঞতা, অশিক্ষা, কুশিক্ষা এবং কুসংস্কার যেন শৈবালাচ্ছন্ন নদীর মতো গ্রাম্য জীবন-প্রবাহকে আটকে রেখেছে। তাই প্রথমেই সেই জীবন-মুক্তির পথ রচনা করতে হবে। নূতন দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে সমগ্র গ্রামকে দেখতে হবে। জানতে হবে, তার পরিবেশের সমস্ত খুঁটিনাটি—সুবিধা-অসুবিধা।

প্রথমে অসুবিধার কথা নিয়েই আলোচনা করা যাক। সার্বজনীন অজ্ঞতায় গ্রাম্য সুবিধার সমস্ত ক্ষেত্রই যেন সঙ্কুচিত, সঙ্কীর্ণ হয়ে আছে। স্বাস্থ্যকর জীবন-যাপনের ধারণা, ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যজ্ঞান, সাংসারিক অভিজ্ঞতা, উন্নত চাষবাসের ধারণা, অর্থনৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য, সার্বিক পরিচ্ছন্নতা-বোধ, স্নান-পান ও আহার-বিশ্রামের নিয়ম, যৌন-জ্ঞান ও পরিবার-নিয়ন্ত্রণের কোন শিক্ষাই তাদের নেই। এই দিগন্ত-প্রসারী অজ্ঞতার অন্ধকারে তারা জীবনের পথ খুঁজে পাবে কি ক'রে?

এখনও তাদের চারদিকেই নৈরাশ্যের প্রাচীর। সেই প্রাচীরে প্রাচীরে মাথা ঠুকে ঠুকে তারা যেন ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। আর কোন দিকে কোন উৎসাহে হাত বাড়াবার ইচ্ছা তাদের নেই। সমস্ত কর্মোদ্দীপনাই যেন তারা হারিয়ে ফেলেছে। মনে-প্রাণে আজ তারা দেউলে, সর্বহারা। গ্রামবাসীরা এখনও এমনি অসহায়। বিপদ্ যখন চারদিক দিয়ে আসে, বহু সৈন্য-পরিবেষ্টিত একক যোদ্ধা যেমনভাবে আত্ম-সমর্পণ করে, আজ গ্রামবাসীদের সেই অবস্থা। তাদের সামনেই যে বাঁচার হাতিয়ার আছে, সে জ্ঞান তাদের নেই। তাই তারা ভাগ্যের দোহাই দিয়ে কুসংস্কারের মধ্যে ডুবে আছে। সকল অজ্ঞতা, কুশিক্ষা যেন তাদের সংস্কারে বদ্ধমূল হয়ে আছে। সেই অন্ধ বিশ্বাসে তাদের নিশ্বাস পূর্ণ, অন্য আশ্বাসে তারা বিশ্বাসী হবে কেমন ক'রে? তাই গ্রামে ওলাউঠা হ'লে তারা নির্ভয়ে ওলাদেবীর শরণাপন্ন হয়। বসন্ত হ'লে তারা শীতলাদেবীর পূজো দেয়; তাঁর করুণার চরণামৃত পেলেই তারা নিশ্চিন্ত হয়। কারণ, তাদের দৃঢ় বিশ্বাস, **মায়ের দয়া যে বসন্ত রোগ, তা মায়ের অনুগ্রহ ছাড়া কিছুতেই সারতে পারে না।** আজও এই আত্মঘাতী কুসংস্কারে মহামারীতে গ্রামকে গ্রাম উজাড় হয়ে যাচ্ছে। তবুও তাদের কোন ভ্রূক্ষেপ নেই; তারা সেই অন্ধ বিশ্বাসেই অনড়, অটল।

এই তো গেল ব্যক্তিগত ও সমাজগত অব্যবস্থার কথা। এখন সুবিধার কথা আলোচনা করা যাক। গ্রাম্য জীবনের ত্রিবিধ সুবিধা আছে; যথা—(১) **প্রাকৃতিক অবদান**, (২) **টাট্‌কা ফল-মূল ও আহার্য** এবং (৩) **অর্থনৈতিক সুবিধা।**

(১) **প্রাকৃতিক অবদান**—স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য একান্ত প্রয়োজন—পর্যাপ্ত

পরিমাণ আলো-বাতাস এবং উন্মুক্ত প্রাকৃতিক পরিবেশ, গ্রামে তার কোন অভাব নেই। ঘন- বসতি পূর্ণ শহরাঞ্চলে যে সুখ-সুবিধার একান্ত অভাব, গ্রাম্য জীবনে তার প্রাচুর্য। অকৃপণ প্রাকৃতিক অবদানে জীবন-সমৃদ্ধির সুযোগ সেখানে পর্যাপ্ত। উন্মুক্ত প্রকৃতির কোলে গ্রাম্য পরিবেশ অবাধ এবং প্রশস্ত।

(২) **টাট্‌কা ফল-মূল**—শহরে টাট্‌কা শাক-সব্‌জি, ঘি, দুধের একান্ত অভাব। দ্রব্যাদির আমদানি-রপ্তানির উপরই শহরবাসীকে নির্ভর করতে হয়, গ্রামবাসীদের কিন্তু সেজন্য এতটুকু ভাবতে হয় না। গ্রামের উৎপন্ন টাট্‌কা শাক-সব্‌জি, ঘি, দুধ গ্রামবাসীরা স্বল্প মূল্যে পেয়ে থাকে। তা ছাড়া, পুকুরের মাছ, গাছের ফল, ঘরের ঘি, দুধ গ্রামবাসীদের প্রত্যেকের ঘরেই কিছু-না-কিছু মজুত থাকে। আহার ও আহার্যের মস্ত সুবিধা গ্রামে আছে।

(৩) **অর্থ নৈতিক সুবিধা**—গ্রাম্য জীবন সহজ, সরল। শহরের কোন আড়ম্বর সেখানে নেই ; কাজেই, গ্রাম্য জীবন তেমন ব্যয়বাহুল্যে পূর্ণ নয়। গরীব দেশের পক্ষে সেটাই সবচেয়ে লাভ। সহজ, সরল, স্বাভাবিক জীবন কাম্যও বটে।

এত সুখ-সুবিধা থাকা সত্ত্বেও গ্রামবাসীরা জীবনকে উপভোগ করতে পারে না। তার প্রধান কারণ শিক্ষার অভাব। যে শিক্ষার শুভবুদ্ধি দ্বারা মানুষ চালিত হয়, জীবন সম্পর্কে নূতন চেতনা আসে, দৃষ্টিভঙ্গী প্রসারিত হয়, গ্রামে গ্রামে সেই জীবনমুখী কার্যকরী শিক্ষার প্রয়োজন।

জন-শিক্ষা :

তাই গ্রামোন্নয়নের জন্য প্রথম দরকার জন-শিক্ষা, তারপর চাই সংস্কার। প্রথমটির কাজ শেষ হলে, দ্বিতীয়টির কাজ সুষ্ঠুভাবে আরম্ভ হবে। তার অন্যথায় গ্রাম্য স্বাস্থ্যোন্নতির কোন পরিকল্পনাই কার্যকরী হবে না। এ সম্পর্কে একজন শিক্ষাবিদ্ একটি চমৎকার কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন যে, **জন-শিক্ষাই হবে গ্রামের হৃৎপিণ্ড। তাকে সক্রিয় সচল ক'রে তুলতে পারলে, তার থেকে প্রতি-নিয়ত কর্মপ্রেরণার রক্ত-স্রোত প্রবাহিত হয়ে পরিকল্পনার শিরা-উপশিরায় গিয়ে যখন পৌঁছাবে, তখনই সমস্ত গ্রাম সুখ-সমৃদ্ধিতে ভরে উঠবে। সেটাই হবে গ্রাম্য স্বাস্থ্যের প্রকৃত উন্নতি।**

সেই সঙ্গে প্রয়োজন হবে পল্লী-সংগঠন-পরিকল্পনার। স্বাস্থ্য ও সুখ-সুবিধার দিক থেকে বিচার ক'রে গ্রামকে ঢেলে সাজতে হবে। তার জন্য দরকার হবে বিশুদ্ধ জল-সরবরাহের, স্বাস্থ্যকর জীবন-যাপনের, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি উদ্ভাবনের এবং সংক্রামক ব্যাধি-দমনের সর্বপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বনের। কি পদ্ধতিতে তা সম্ভবপর হবে, সে বিষয়ে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে।

গ্রাম সংগঠন :

এখন গ্রাম সংগঠনের সময় কোন্ কোন্ দিকে দৃষ্টি দিতে হবে, সে সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করা দরকার। নব পর্যায়ে গ্রাম্য কুটীর নির্মাণ, গ্রাম্য পথ-ঘাটের উন্নতি, বাজার-হাট, মেলা, ভোজোৎসব ও যাত্রীদের স্বাস্থ্যরক্ষার সুব্যবস্থা এবং গ্রামে গ্রামে দাতব্য চিকিৎসালয় ও প্রসূতি-সদন নির্মাণের বিশেষ প্রয়োজন।

গ্রাম্য কুটীর :

অধিকাংশ গ্রামে পাকাঘরের তুলনায় চালাঘরের সংখ্যাই বেশী। গ্রাম্য কুটীরগুলি প্রায়ই স্বাস্থ্য-সম্মত উপায়ে নির্মিত নয়। অধিকাংশ কুটীরের দেওয়াল
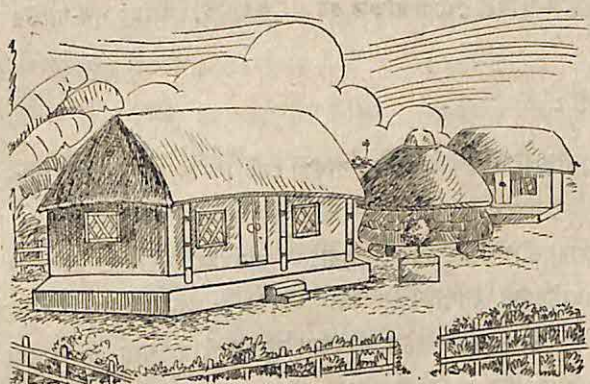
নব পর্যায়ে গ্রাম্য কুটীর

মাটির অথবা ছেঁচা বাঁশের দ্বারা নির্মিত। উপরকার আচ্ছাদন খড়ের। গ্রীষ্মের দিনে মাটির ঘর ঠাণ্ডা থাকে। বর্ষাকালে ও শীতকালে মাটির ঘরে বিশেষ অসুবিধা হয়। বিশেষ ক'রে বর্ষাকালে খড়ের চাল পচে উঠে ; তখন নানাপ্রকার কীট-পতঙ্গের উপদ্রব হয়। মাটির ঘরে বায়ু-সঞ্চালনের কোন ব্যবস্থাই থাকে না। প্রায়শঃ মাটির ঘরে থাকে একটি দরজা এবং ছোট দুটি জানালা। একে স্বাস্থ্য-সম্মত বাসগৃহ বলা চলে না। বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে গ্রাম্য কুটীর নির্মিত হওয়া উচিত। ঘরের আচ্ছাদন টালি বা য়্যাসবেস্টাসের হ'লে ভালো হয়। ঘরের সামনের দিকের চাল অপেক্ষাকৃত উঁচু হ'লে বায়ু-চলাচলের অসুবিধা দূর হবে। সেই সঙ্গে ঘরের দরজা-জানালা আকারে বড় ও সংখ্যায় বেশী হওয়া উচিত।

পথ-ঘাট :

পথ-ঘাটের অব্যবস্থাই গ্রাম্য জীবনের সবচেয়ে বড় অসুবিধা। কাঁচা মাটির পথ শীত-গ্রীষ্মে ধূলায় পূর্ণ থাকে এবং বর্ষার ক'মাস এমনই কর্দমাক্ত হয় যে, পথ-চলাচল অসম্ভব হয়ে উঠে। পথের এই শোচনীয় অবস্থার জন্যই গ্রামের বারো আনা সুখই নষ্ট হয়ে যায়। তা ছাড়া, গ্রামের চারদিকেই থাকে পচা পানায়-ভর্তি একাধিক পুকুর, খানা, ডোবা। সেখানে বারো মাসই মশার বংশবৃদ্ধি হয়; তার ফলে বর্ষার দিনে গ্রামাঞ্চল ম্যালেরিয়ায় ভ'রে উঠে। তাই গ্রাম সংগঠনের প্রথমেই প্রয়োজন খানা-ডোবার সংস্কার করা এবং গ্রাম্য পথের উন্নতিসাধন। ধূলা ও কাদার হাত থেকে রেহাই পেতে হ'লে, গ্রামে গ্রামে খোয়ার রাস্তা নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। ভালো রাস্তা না থাকার দরুন গ্রামবাসীরা আকস্মিক দুর্ঘটনার সময় বিপদে পড়ে এবং বহু সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়। কাজেই, গ্রাম্য পথ-ঘাটের আশু উন্নতি প্রয়োজন।

বাজার-হাট :

প্রায়শঃ গ্রামেই নিত্য বাজারের ব্যবস্থা নেই। গ্রামে সপ্তাহে দুদিন কি তিনদিন হাট বসে। সেখানে কেনা-বেচার জন্য বহু জন-সমাগম হয়। অথচ, সেই হাটের পরিবেশ কোথাও পরিচ্ছন্ন নয়। সেখানে পায়খানা ও প্রস্রাবাগারের কোন ব্যবস্থা না থাকায়, হাটুরেরা যেখানে-সেখানে প্রস্রাব ও মলত্যাগ ক'রে পরিবেশকে নোংরা ক'রে রাখে। তা ছাড়া, হাটের আবর্জনা মাছের আঁশ পচে ও আবহাওয়াকে দূষিত করে। গ্রাম্য হাটের খোলা পরিবেশে খাবার কেনা-বেচা হয়। খোলা জায়গায় ধূলা ও মাছিতে খাবার সহজেই দূষিত হয়। কাজেই, হাটের পরিবেশের এবং বিধি-ব্যবস্থার অচিরেই উন্নতি হওয়া উচিত।

মেলা ও ভোজোৎসব :

গ্রামের বৈচিত্র্যহীন জীবনের আনন্দোৎসব হচ্ছে মেলা। এই দিনটির জন্য যেন সমস্ত গ্রাম উন্মুখ হয়ে থাকে। কোন জাগ্রত দেব-দেবী অথবা সিদ্ধপুরুষের স্থানে মেলা বসে। মেলায় বিপুল জন-সমাগম হয়। গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে লোক আসে। পথের ধারে গাছের তলায় যাত্রীদের ভিড় জমে। খারাপ তেলে-ভাজা পাঁপর, সস্তা খাবার খোলা রাস্তার ধারে কেনা-বেচা হয়। ধর্মের নামে পাগল অসংখ্য নর-নারী, ছেলে-বুড়ো সেই খাবার খেয়ে ব্যাধির কবলে পতিত হয়। স্বভাবতঃ নোংরা ও অশিক্ষিত গ্রাম্য যাত্রীদের অসাবধানতায়, অবিবেচক ব্যবসায়ীদের অব্যবস্থায় গ্রাম্য পরিবেশ এমনভাবে দূষিত হয় যে, মেলার সঙ্গে কলেরা মহামারীরূপে দেখা দেয়।

কাজেই, মেলার সময় যাতে গ্রাম্য পরিবেশ দূষিত না হয়, সেজন্য সর্বপ্রকার প্রতি-ষেধক ব্যবস্থা অবলম্বনের বিশেষ প্রয়োজন।

যাত্রীদের স্বাস্থ্য-রক্ষার ব্যবস্থা :

মেলা উপলক্ষে গ্রামে বহু যাত্রীর সমাগম হয়। অধিকাংশ যাত্রীই আসে দূরাঞ্চল থেকে। মেলার সঙ্কীর্ণ পরিবেশে তাদের স্থান-সঙ্কুলান হয় না। তা ছাড়া, খাওয়া-থাকার অব্যবস্থা, পানীয় জলের অভাব, যেখানে-সেখানে মল-মূত্র ত্যাগ করা প্রভৃতি অস্বাস্থ্যকর অভ্যাসের দ্বারাই গ্রাম্য পরিবেশ দূষিত হয়। তাই দেখা যায় যে, এই বহিরাগত যাত্রীদের দ্বারাই কলেরা প্রভৃতি ব্যাধি গ্রামে বিস্তারলাভ করে। এইজন্য মেলার সময় বহিরাগত যাত্রীদের স্বাস্থ্য-রক্ষার দিকে সর্বাগ্রেই দৃষ্টি দেওয়া কর্তব্য। স্থানীয় হেল্‌থ অফিসারের সঙ্গে যোগাযোগ ক'রে যাত্রীদের প্রত্যেককেই কলেরার ইন্‌জেক্‌শন দেওয়ার ব্যবস্থা করা উচিত।

চিকিৎসালয় ও প্রসূতি-সদন :

গ্রাম্য জীবনের আর একটি বড় অসুবিধা ডাক্তারের অভাব। এখনো অনেক গ্রাম আছে, যেখানে কোন ডাক্তার নেই। অসুখ-বিসুখে, দৈব-দুর্ঘটনায় সেখানকার গ্রামবাসীরা হয় বিনা চিকিৎসায় মারা যায়, অথবা ভাগ্যক্রমে বেঁচে উঠে। সভ্য স্বাধীন দেশের কোন গ্রামের এতখানি অসহায়তা সত্যই অভাবনীয়। আজকাল অবশ্য দু'তিনটি গ্রামের মধ্যস্থলে অথবা প্রায় প্রত্যেক ইউনিয়নে একটি ক'রে স্বাস্থ্য-কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। কিন্তু সেখানে সাধারণ চিকিৎসার বিশেষ কোন ব্যবস্থা নেই। প্রাথমিক চিকিৎসার উপযোগী সামান্য যেটুকু করণীয় আছে, তা-ও সরঞ্জাম এবং ঔষধ-পত্রের অভাবে চিকিৎসকরা করতে পারেন না। এ ব্যবস্থার আশু প্রতিকার হওয়া দরকার। গ্রামে প্রসূতি-সদনের প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের দোষে, অব্যবস্থায় নির্বিঘ্নে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরেও বহু শিশু মারা যায় ; কাজেই, সেই শিশু-মৃত্যু এবং প্রসূতির জীবন-রক্ষার জন্যই গ্রামে গ্রামে প্রসূতি-সদন থাকা উচিত।

মানসিক স্বাস্থ্য

মানুষের সম্যক্ স্বাস্থ্য তার দেহ-মনের সুস্থতাকে নিয়ে। একজন সুস্থ মানুষের যখন মানসিক বিকৃতি ঘটে, তখন তাকে স্বাভাবিক মানুষের পর্যায়ে ফেলা যায় না। সে তখন সুস্থ হয়েও অসুস্থ, অস্বাভাবিক মানুষ। মানুষের

সে অবস্থাটা সত্যিই যেমন ভয়াবহ, তেমনি শোচনীয়। কিন্তু সেই অবাঞ্ছিত অবস্থার কারণ কি ?

মনস্তাত্ত্বিকরা মানসিক বিকৃতির ত্রিবিধ কারণের উল্লেখ করেছেন। সেগুলি হচ্ছে—যথাক্রমে (১) শারীরিক কারণ, (২) বংশগতির প্রভাব এবং (৩) আর্থিক বা মানসিক কারণ। এ ছাড়া, স্নায়বিক বিপর্যয়েরও কারণ থাকতে পারে। অতিরিক্ত চিন্তা-ভাবনা যখন মনের স্নায়ুতে অনবরত ধাক্কা দেয়, তখন অবচেতন মনে যে ঝড় উঠে, সেই বিপর্যয়ের ফলেই মনের সমতা নষ্ট হয়ে যায়। তখনই মানসিক ব্যাধির সৃষ্টি হয়। তাই মানসিক স্বাস্থ্য-রক্ষার জন্য সর্বদা মনকে প্রফুল্ল রাখতে হয়। কেমন ক'রে সহজ উপায়ে মনকে ভালো রাখা যায়, সে সম্পর্কে গ্যেটে অবশ্যপালনীয় তিনটি নির্দেশ দিয়েছেন। সে নির্দেশগুলি সকল মানুষের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। অসৎ চিন্তা, অসৎ কাজ ও অসৎ ধারণা থেকেই মানসিক বিপর্যয় আসে। তাই তিনি বলেছেন যে, ঐ ত্রিবিধ অবস্থা থেকে অব্যাহতি পেতে হ'লে প্রতিদিন তিনটি কাজ করতে হবে। যথা—রোজ ঘুম ভাঙার পর একটি ভালো ছবি (যে-কোন মহাপুরুষের) দেখতে হবে ; সৎ চিন্তায় ক্ষণিকের জন্য মনোনিবেশ করতে হবে ; এবং একটা-না-একটা ভালো কাজ করতে হবে। এই ত্রিবিধ কাজের যোগফল মনকে সুস্থ ও সবল রাখবে। তখনই জীবনাদর্শে নৈতিক বনিয়াদের উপর মন সুদৃঢ় হবে।

এখন জানা দরকার, মানসিক ব্যাধি কয় প্রকার। সাধারণতঃ চার প্রকারের মানসিক ব্যাধি আছে। যথা—(১) মানসিক ব্যাধি (Idiot, Imbecile, Feeble minded), (২) মানসিক অপূর্ণতা (Mental deficiency), (৩) অকিঞ্চিৎ মনঃপীড়া এবং (৪) অপরাধ-প্রবণতা (Delinquency)।

এই বিকৃতির জন্য যে মনস্তাত্ত্বিক কারণই সব সময় দায়ী, একথা কিন্তু এখনও প্রমাণিত হয়নি। তবে দৈহিক স্বাস্থ্যের উপরই যে মানসিক স্বাস্থ্য নির্ভর করে, সে-বিষয়ে দ্বিমত নেই। এখন জানা দরকার, এই মানসিক বিকৃতির কারণগুলি কি।

জ্যানেট্ বলেছেন যে, তিন স্তরের মনই এক সূত্রে গাঁথা। তারা একত্রে অথবা সংঘবদ্ধ হয়ে কাজ করে। কোন কারণে সেই যোগসূত্র ছিন্ন হ'লে, মানসিক বিকৃতি আসে। মৃগি-ব্যাধি বা উৎকণ্ঠাবস্থা থেকেও সে অসহযোগ ঘট্‌তে পারে।

শারীরিক বিকৃতি ছাড়াও, মানসিক অসঙ্গতির আরও অনেক কারণ আছে। ম্যান্‌ডেলিন সাহেব এই প্রসঙ্গে বংশগতি ও পরিবেশের প্রভাবের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন যে, পাগলামিটা প্রায়শঃ বংশানুক্রমিক। তার পিছনে

পরিবেশের প্রভাবও আছে। কোন্ প্রভাবের প্রতিক্রিয়া কতটুকু, তার আনুপাতিক গড় কত, তিনি তা নির্ধারণ করেছেন। তিনি বলেছেন যে, (ক) বংশগতির দোষ শতকরা ২৯ ভাগ, (খ) পরিবেশের প্রভাব শতকরা ৯ ভাগ এবং (গ) পরিবেশ ও বংশগতির জড়িত প্রভাব হচ্ছে শতকরা ৬২ ভাগ।

মানুষের মন বিশ্লেষণ ক'রে ফ্রয়েড মনের তিনটি অবস্থার কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে, মনের তিনটি স্তর আছে; যথা—(১) সজ্ঞান মন, (২) প্রাক্‌চেতন মন ও (৩) অনবহিত মন। এই তিনটি মনের অন্তর্দ্বন্দ্বই মানসিক বিকৃতির কারণ।

মানসিক বিকৃতির কারণ বিশ্লেষণ ক'রে জানা গেছে যে, পাঁচটি কারণে মানসিক বিকৃতি ঘট্‌তে পারে। যথা—(১) নিউরসিস্ বা স্নায়বিক দুর্বলতা থেকে, (২) উর্ধায়নের অভাবে, (৩) প্রতিক্রিয়ার সংগঠনে (Reaction formation), (৪) প্রতিহত প্রতিফলনে (Want of projection) ও (৫) বিগ্রহরূপী যৌন-প্রতিক্রিয়ার জন্য।

এছাড়া, জ্যান্ আরও দুটি কারণ উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন যে, দুটি স্বভাবের মানুষ আছে; যথা—(১) বহির্মুখী (Extrovert) ও (২) আত্ম-কেন্দ্রিক (Introvert)। এই দুটি স্বভাবের প্রক্রিয়া চলেছে মনে মনে। বহির্মুখী মন চায় আত্ম-জাহির করতে; কারণ, আত্ম-প্রতিষ্ঠায় তার সুখ। কিন্তু যখন সেই আত্ম-প্রকাশের ক্ষেত্রে পদে পদে বাধা আসে, ব্যর্থতার অপমানে মন জর্জরিত হয়, তখন ভিতরে ভিতরে বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। সেই অতৃপ্ত মনের অসন্তোষ থেকে যখন মনের ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়, তখনই মানসিক বিকৃতি ঘটে। আত্মকেন্দ্রিক মনেও অনুরূপ দ্বন্দ্ব চলে। যে মন নিজের মাঝে আড়াল সৃষ্টি ক'রে আত্ম-গোপন করতে চায়, তার প্রবল ইচ্ছায় বুক ফাট্‌লেও মুখ ফোটে না। সেই অবদানের দুঃসহ বেদনা ক্রমাগত যে মনে জড় হ'তে থাকে, তার চাপেই একদিন সহনশীলতার বাঁধ ভেঙে যায়। তখনই মানসিক বিকৃতি আত্ম-প্রকাশ করে।

এখন এই মানসিক ব্যাধি নিরাময়ের ব্যবস্থাগুলি কি, সে সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা দরকার। ফ্রয়েড অবশ্য বলেছেন যে, সব মানসিক ব্যাধির (উন্মত্ত পাগলামি ছাড়া) চিকিৎসা একই রূপ। রোগীর মন বিশ্লেষণ ক'রে প্রথমে ব্যাধির কারণ নির্ণয় করতে হবে। দেখতে হবে, কোন্ মনে কিসের ক্ষত আছে, অবচেতন বা প্রাক্‌চেতন মনের কোথায় ভয়, আশঙ্কা বা অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হয়ে আছে। সেই বেদনা-ব্যথা ও বিক্ষোভগুলিকে কৌশলে মন থেকে অপসারিত করতে পারলেই, মানসিক ব্যাধি দূর হবে। রোগীকে অজ্ঞান ক'রে তার অনবহিত মনের কথাগুলোকে কোন রকমে সজ্ঞান মনের দরজায় পৌছে দিতে পারলেই, ক্রমে ক্রমে তার অনবহিত মন থেকে

যখন বহুদিনের পুঞ্জীভূত ভয়, দুঃসহ বেদনা এবং দীর্ঘদিনের ক্ষত মুছে যাবে, তখনই সে আরোগ্য লাভ করবে। এটি অবশ্য সময়সাপেক্ষ চিকিৎসা।

এছাড়া, বংশগতি ও পরিবেশের জন্য যে বিকৃতি, তার ব্যবস্থাপনা আলাদা। অবদমন, প্রবৃত্তির দ্বন্দ্ব, শারীরিক অসঙ্গতি, বা অন্য কোণ কারণে যে মানসিক ব্যাধির সৃষ্টি হ'তে পারে, ম্যান্‌ডেলিন সাহেব ও অন্যান্য মনস্তাত্ত্বিকরা সে রোগ নিরাময়ের একটা লম্বা ফিরিস্তি দিয়েছেন। সেগুলি হচ্ছে—যথাক্রমে,

(১) বংশগত বিকৃতির জন্য পরিবেশ ও বংশগতির উন্নতি দরকার। (২) শারীরিক বিকৃতি-জনিত ব্যাধি হ'লে অথবা দুর্বলতা-জাত ব্যাধি হ'লে, শারীরিক উন্নতির প্রয়োজন। (৩) মানসিক দ্বন্দ্ব থেকে বিকৃতি ঘট্‌লে মনের উৎকণ্ঠা দূর করতে হবে। (৪) ব্যক্তিগত প্রবণতার অবদমন-জনিত ব্যাধি হ'লে, যার যেদিকে ঝোঁক (সঙ্গীত, শিল্প, সাহিত্য প্রভৃতি), সে-বিষয়ে উৎসাহ দিতে হবে। (৫) সহজাত প্রবৃত্তিগুলিকে কখনই অবদমন করা ঠিক নয়, সেগুলিকে অন্য পথে চালিত করাই বিধেয়। (৬) অক্ষমতার পরিপূরক হিসাবে অন্য শক্তিকে কাজে লাগাতে হবে। (৭) ব্যক্তিগত চাহিদামতো উর্ধ্বায়নের (Sublimation) প্রয়োজন। (৮) যৌন-বোধ সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা দেওয়া এবং সামাজিক অভ্যাসের পরিমার্জন দরকার। (৯) ভাবী পিতামাতাকে যৌন-ব্যাধিমুক্ত করতে হবে।

উপরোক্ত নির্দেশগুলির সুবিধা এই যে, এর মধ্যে প্রতিষেধক ব্যবস্থা এবং চিকিৎসার নির্দেশগুলি একই সঙ্গে দেওয়া আছে।

শারীরিক শিক্ষার মনস্তত্ত্ব

দেহকে বাদ দিয়ে মন নয়, মনকে বাদ দিয়েও দেহ সক্রিয় নয়। একটি অন্যটির পরিপূরক। মন থেকে দেহে, দেহ থেকে মনে প্রতিনিয়তই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার আবর্তন চলেছে। মনের ইচ্ছায় যে কাজের প্রেরণা, তার প্রকাশ-ক্ষেত্র দেহজ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। মনের সম্মতি না থাকলে হাতটুকু পর্যন্ত নাড়াচাড়া করা যায় না। মনে করুন, আপনার পিঠের এক স্থানে চুল্‌কাতে ইচ্ছা করছে, অস্বস্তিতে হাত দুটো নিস্‌পিস্‌ করছে, অথচ আপনি মনে মনে সঙ্কল্প করলেন যে, কিছুতেই চুল্‌কাবেন না। শেষ পর্যন্ত মনেরই জয়লাভ হ'ল, হাত দুটো বন্দী সৈনিকের মতো চুপ ক'রে রইল। এর আবার বিপরীত দিকও আছে। দেহ যখন ক্লান্ত, মনও তখন শ্রান্ত। দেহের অসুখে মনের সুখ নেই। এ হেন যে দেহ-মনের সম্পর্ক, সেই দেহের জন্য যা-কিছু—শ্রম, ব্যায়াম, অনুশীলন প্রভৃতি—তার সঙ্গে মনেরও অনেক কিছু জড়িয়ে আছে। এই

কারণে শারীরিক শিক্ষার তথ্যে আছে দেহ-মনের তত্ত্ব। শিক্ষাবিদ্‌রা তাকে শারীরিক শিক্ষার মনস্তত্ত্ব ব'লে অভিহিত করেছেন।

সাধারণ শিক্ষার যে নীতি, শারীরিক শিক্ষারও সেই রীতি। দেহ-মনের বিকাশ। প্রত্যেক বিকাশের একটা ধারা আছে। তাকে পথ বা পদ্ধতি বলে। এই পদ্ধতি অনুসারেই শিক্ষার ধারা নিয়ন্ত্রিত হয়। শারীরিক অনুশীলনের ক্ষেত্রেও সেই তত্ত্ব—সেই কথা। শিক্ষাটা 'শেখা' নয়, 'হওয়া'। তাই গ্যেটে বলেছেন যে, 'We learn nothing, but become something'। আমরা আসলে শিখি না কিছুই, হ'তে চাই মাত্র। অর্থাৎ, ব্যায়াম ক'রে আমরা হই ব্যায়ামবীর, খেলে হই খেলোয়াড়, শিখে হই শিক্ষিত, লিখে হই লেখক ইত্যাদি। এই যে শেখা বা মনে রাখা, তার মাত্র কতকগুলি 'ছক্' নেই, 'কানুন'-ও আছে। সেগুলি হচ্ছে—যথাক্রমে তৎপরতা-নীতি, অনুশীলন-নীতি এবং পরিণাম-পরিমিতি।

এবার তত্ত্ব-বিশ্লেষণে আসা যাক। **তৎপরতা-নীতি** (Laws of readiness) প্রথম আলোচ্য বিষয়। এর মধ্যে আছে প্রস্তুতি, প্রয়োগ এবং সর্বোপরি একটা প্রচেষ্টা। যখনই মানুষের কিছু করার ইচ্ছা হয়, সে একটা কিছু করবার চেষ্টা করে। তখনই একটা বিশেষ 'ধরনে' তার কাজ আরম্ভ হয়। অবশ্য, এই প্রচেষ্টার তাগিদ আসে বাইরে থেকে। কোন-না-কোন্ বহিঃপ্রেরণা দ্বারাই সে পরিচালিত হয়। কাজ আরম্ভের আগেই চলে প্রস্তুতি। যে কাজে স্বস্তির আনন্দ যত বেশী, সেই কাজেই তত তার আগ্রহ। কিন্তু যেই কোন কাজে একটা বিরূপ অনুভূতির সৃষ্টি হয়, তখনই কর্মীর মন অপ্রসন্ন হয়ে উঠে। ফলে, যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়, সেটাই কাজের ক্রমোন্নতিকে ব্যাহত করে। তখন পদে পদে অনিচ্ছার বাধা প্রবল হয়ে উঠে। আর সে কর্মস্পৃহা থাকে না। মনে করা যাক, একজন ক্ষুধার্ত হয়েছে, ক্ষুধার তাড়নায় সে কিছু আহার্য চায়। শত চেষ্টা ক'রেও কোন আহার্য জুট্‌ল না। তখনকার সেই ব্যর্থ হতাশার মধ্যে তার মনে যে অপ্রীতিকর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হবে, সেটাই ঘাত-প্রতিঘাতে তার মনকে বিষিয়ে তুলবে। তখন তার মনে জাগবে একটা বিরক্তিকর অনুভূতি। কারণ, বাসনা যেখানে প্রবল, প্রতিক্রিয়াও সেখানে সেই অনুপাতে তীব্র। অন্যদিকে, ফলপ্রাপ্তির মধ্যে যেখানে কোন বাধা নেই, মন সেখানে তৃপ্তির আনন্দে ভরে উঠে। সে আনন্দের মধ্যে যে আত্ম-প্রসাদ আছে, তা মানুষকে পরিতৃপ্তি থেকে পরিণতির দিকে যাওয়ার উৎসাহ যোগায়। এই প্রেরণা আসে 'অভাব-বোধ' থেকে। ফলে, মানুষের প্রত্যেক আকাঙ্ক্ষার পিছনে কাজ করে তার অন্তর্নিহিত প্রবণতা। তা আবার বহুবিধ ইচ্ছা দ্বারাও নিয়ন্ত্রিত হয়। তার মধ্যে আবার অর্জন, বর্জন, গ্রহণ এবং নির্বাচনেরও প্রশ্ন থেকে যায়। এই সব

কারণে আমরা যা করি, তার পিছনে থাকে সামাজিক অনুমোদন লাভের ইচ্ছা; কখনও বা থাকে প্রভুত্ব লাভের বাসনা, কখনও দুঃখকে জয় করার প্রচেষ্টা অথবা পাল্লা দেওয়ার ইচ্ছা মাথা চাড়া দিয়ে উঠে। এবংবিধ অনুভূতি-জনিত যে প্রতিক্রিয়া, তা শারীরিক শিক্ষারই বিচিত্র প্রকাশ। এই প্রকাশের প্রত্যেকটি ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্যে আছে প্রস্তুতি ও প্রয়োগের ব্যস্ততা।

এই তৎপরতার সঙ্গে যখনই প্রবল ইচ্ছা যুক্ত হয়, তখনই সে অভিপ্রায় রূপায়িত হ'তে চায়। ভাবনা তখন কাজ হয়ে দেখা দেয়। যে-কোন শিক্ষার ক্ষেত্রেই সেই একই কথা। শিশুরা যখন কিছু শেখার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠে, তখনই তার শিক্ষা হয় বিশেষভাবে কার্যকরী। শারীরিক শিক্ষার ক্ষেত্রেও এই তৎপরতা-নীতির ব্যাপক প্রয়োগ দেখা যায়। খেলাধূলার সর্বক্ষেত্রেই যাতে শিশুর সহজাত স্বাভাবিক অঙ্গ-ভঙ্গীগুলিকে কাজে লাগানো যায়, সেদিকে সজাগ দৃষ্টি দেওয়া দরকার। প্রত্যেকটি শিশুর মধ্যে একটা জন্মগত ক্রীড়া-প্রবণতা আছে, সেজন্যই শিশুরা খেলতে ভালবাসে। এটাই ক্রমবর্ধমান শিশুর স্বাভাবিক প্রবণতা। কিন্তু প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শারীরিক শিক্ষার শ্রেণীতে যে ধরনের নিয়ন্ত্রিত খেলাধূলার ব্যবস্থা আছে, সেই গতানুগতিক খেলা শিশুরা পছন্দ করে না। অনেক ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রিত 'কুচ্‌কাওয়াজ' শেখানো হয়। তা বয়সের অনুপাতে গুরু ব্যায়াম এবং শিশু-প্রণবতার পরিপন্থী। এই কারণে সেই ব্যায়াম শেখার জন্য যে অনুশীলন, প্রস্তুতি ও ভারসাম্যের প্রয়োজন, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অধিকাংশ শিশুর তা থাকে না। তাই খেলাগুলি বুঝতে, অনুধাবন করতে শিশুর অপটু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি যেন কিছুতেই পেরে উঠে না। ফলে, তার মনে একটা অপ্রীতিকর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। তাই স্বৈচ্ছিক খেলা ছাড়া অন্য খেলায় ছোটরা আশানুরূপ আনন্দ পায় না। এই কারণে স্বৈচ্ছিক খেলাকেই বলা হয় শিশুর নিজস্ব খেলা।

অনুশীলন-নীতি (Laws of exercise):

শেখা মানেই অনুশীলন করা। সমস্ত শিক্ষার প্রথম পর্যায়ে আছে অনুধাবন আর অনুশীলন। তারপর পুনরাবৃত্তি। পুনরাবৃত্তি থেকে অভ্যাস এবং তা থেকেই শিক্ষা। অর্থাৎ, "If a person repeats a reaction for a number of times, it becomes easier for him to react in that way"। বার দুই একটা কাজ ক'রে যখন একটা ধরন পাওয়া যায়, তখন সহজেই সে কাজটি সুচারুভাবে করা যায়। যেমন—মেঠো পথে চলতে চলতে পায়ের দাগে দাগে পথ-রেখার সৃষ্টি হয়, তেমনি অনুশীলনের পুনরাবৃত্তি থেকে অভ্যাস পুঞ্জীভূত হয়। ধরা যাক, একজন ফুটবল খেলা শিখতে চায়। তার জন্য রোজ মাঠে গিয়ে তাকে নিয়মিত অনুশীলন করতে

হবে, যতদিন না সে ফুটবল খেলা শিখতে পারে। হাজার বক্তৃতা দ্বারা যা সম্ভব হ'ত না, অনুশীলনের দ্বারা তা কার্যকরী হ'ল। নিত্য অভ্যাসের দ্বারাই প্রতি-ক্রিয়াগুলি যতই আয়ত্তে আসে, ততই শেখাটা সহজ-স্বাভাবিক হয়ে উঠে। এই শেখার প্রেরণা যোগায় প্রীতিকর অনুভূতি। যতক্ষণ কোন অপ্রীতিকর ঘটনা, ক্লান্তি অথবা অক্ষমতা প্রস্তুতির পথে বাধার সৃষ্টি না করে, ততক্ষণ শিখতে কোন বেগ পেতে হয় না। অনেক সময় দেখা যায় যে, খুব ভালো খেলোয়াড়ও মরশুমের আগে কিছুদিন অনুশীলন না করলে হঠাৎ মাঠে নেমেই ভালো খেলতে পারে না। কিছুদিনের অনভ্যাসের ফলে বহিঃপ্রেরণা এবং প্রতিক্রিয়ার সঠিক যোগাযোগ ঘটল না। ফলে, অনুশীলনকারী নির্ভুলভাবে, স্বাভাবিক উপায়ে দ্রুতোন্নতি করতে পারল না। পক্ষান্তরে, অভ্যাসের দ্বারাই অনুশীলনে নৈপুণ্য আসে।

পরিণাম-পরিমিতি (Laws of effect):

প্রত্যেক কাজের আরম্ভ এবং শেষ আছে। শেষ ফলাফলটাই কাজের পরিণাম। কাজের পরিণামেই যখন কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি না হয়, তখন অনুশীলনকারীর মনে একটা আনন্দময় প্রীতিকর অনুভূতি জাগে; এবং প্রত্যেক অভ্যাসের উপর পরিণামের ছাপ স্পষ্ট হয়ে উঠে। মনে করা যাক, একজন সাঁতার শিখছে। জলে মুখ ডুবিয়ে সাঁতার কাটার সময় কোন কারণে তার নাকে জল ঢুকে গেল; তার ফলে সাঁতারুর সাময়িক যে কষ্ট হবে, সেই অপ্রীতিকর অনুভূতি তার মনে সদা জাগ্রত থাকবে। সে আর কিছুতেই জলের নীচে থেকে নিশ্বাস নিতে চেষ্টা করবে না। অতঃপর সে যখনই সাঁতার কাটবে, তখনই সে এ-বিষয়ে এতই সজাগ থাকবে যে, সে আর কিছুতেই সেই অপ্রীতিকর অনুভূতির পুনরাবৃত্তি ঘটতে দেবে না। যেভাবে নিশ্বাস নিতে এতটুকু কষ্ট না হয়, সাঁতার কাটার সময় সেইভাবেই নিশ্বাস নেওয়ার অভ্যাস করবে। যে অভ্যাসের অনুভূতি যত প্রীতিকর হবে, ততই সেই অনুশীলনের প্রতি তার অনুরাগ জন্মাবে। ফলে, সে অভ্যাস সুদৃঢ় হবে। এটাই হচ্ছে শিক্ষার পরিণাম-নীতি। গেট্স্-ও তাই বলেছেন যে, সমগ্রভাবে দেখলে বলা চলে যে, ব্যক্তিবিশেষ সেই খেলারই পুনরাবৃত্তি করতে চায় যা মোটামুটিভাবে প্রীতিকর; আর যা অপ্রীতিকর, তার জন্য কেউ কস্মিন্‌কালেও অনুশীলন করতে চায় না।

শারীরিক শিক্ষার শিক্ষকদের বিশেষভাবে এই কথাটাই স্মরণ রাখতে হবে। শ্রেণী-পরিচালনার সময় সর্বদা লক্ষ্য রাখতে হবে যে, কোন্ পদ্ধতি প্রয়োগের দ্বারা ছাত্ররা বেশী উপকৃত হচ্ছে, কোন্ কৌশল সহজে শেখানো যাচ্ছে। অপ্রীতিকর অনুভূতিগুলিকে যতই শেখানোর সময় পরিহার করা যাবে, ততই শ্রেণী-পরিচালনার

কাজ সার্থক হবে। এই ভালো-মন্দ লাগার উপরই অনুশীলনকারীর পরিণাম অনেকটাই নির্ভরশীল। অর্থাৎ, তার উপরই শিক্ষার্থীদের সাফল্য বা অকৃতকার্যতার গড় নির্ভর করে। কাজেই, কোন একটা শিক্ষণ-পদ্ধতি প্রয়োগ করতে হ'লেই এমন একটা পরিকল্পনা প্রস্তুত করতে হবে যে, সে অনুশীলনে শিক্ষার্থীমাত্রেই অল্প-বিস্তর উপকৃত হবে। সহজ স্বাভাবিক উপায়ে শিক্ষার্থী একটা কিছু করতে শিখবে। পক্ষান্তরে, কেউ যদি বার বার চেষ্টা ক'রেও বিফলমনোরথ হয়, তবে সে নিশ্চয় নৈরাশ্যে ভেঙে পড়বে। এমনকি শেষ পর্যন্ত সে অনুশীলন থেকে বিরত হবে।

শিক্ষণ-তত্ত্বের প্রয়োগ ঃ

প্রয়োগ-তত্ত্বের প্রধান কথা হচ্ছে যে, নীতিগুলোকে ঠিক ঠিকভাবে কাজে লাগানো। তার জন্য অভিজ্ঞতা এবং বিশেষ পর্যবেক্ষণের প্রয়োজন। শিক্ষণ-তত্ত্ব-প্রয়োগের নীতির পিছনে থাকবে উল্লিখিত উদ্দেশ্যগুলি। এই প্রয়োগ-নীতির প্রধান উদ্দেশ্য হবে, যে অবস্থায় যেখানে যে নীতিটা প্রয়োগ করলে শেখার অনুশীলন সার্থক হবে, সেই উপায়গুলিকে অধিকতরভাবে কাজে লাগানোর চেষ্টা করা। যে কাজে বা খেলায় ছেলেদের অনিচ্ছা প্রকাশ পাবে, পারতপক্ষে—কর্তব্যের খাতিরে—সেই খেলা বা কাজের জন্য ছেলেদের পীড়াপীড়ি করা উচিত নয়। মনে করা যাক যে, একজন স্প্রিংবোর্ড থেকে উল্টো দিকে ডিগ্‌বাজি খাওয়া শিখতে চায় ; অথচ, সে কিছুতেই উল্টো ডিগ্‌বাজি খাওয়ার সহজ পদ্ধতিটি আয়ত্ত করতে পারছে না। যিনি শিক্ষা দিচ্ছেন, দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁরও সে কৌশল জানা নেই ; সেক্ষেত্রে ডিগ্‌বাজি খাওয়া শেখার জন্য কখনই শিক্ষার্থীর উপর জুলুম করা উচিত নয়। তাতে হিতে বিপরীত ফল হ'তে পারে। বিবেচক শিক্ষক নিশ্চয় সে সময় বিরত হবেন। পথ না জানা থাকলে কি পথ দেখানো যায় ? যে কৌশল ছেলেরা সহজেই ধরতে পেরেছে, পালাক্রমে বার বার সেটার পুনরাবৃত্তি করার সুযোগ দিতে হবে। যখন কোন বিষয়ে অনুশীলনকারীর আগ্রহ ও অনুরাগ সঞ্চার হয়, তখনই সে অনুশীলন ফলপ্রদ হ'তে পারে। সেই প্রীতিকর অবস্থার মধ্যে অনুশীলনকারী সক্রিয় অভ্যাসের দ্বারা নির্ভুলভাবে যে-কোন কৌশল আয়ত্ত করতে পারবে। অখণ্ড মনোযোগে এবং সাগ্রহে যে কাজ দশ মিনিটে করা যায়, অনিচ্ছায় সে কাজ এক ঘণ্টায়ও করা সম্ভবপর হয় না। যখন অগ্রগতির প্রতি পদক্ষেপে আনন্দ এবং উদ্দীপনা বৃদ্ধি পায়, তখন কাজের মধ্যে প্রেরণা আসে ; তখন সিদ্ধি-লাভের আনন্দে কোথা দিয়ে যে সময় কেটে যায়, তা টেরই পাওয়া যায় না। অর্থাৎ, প্রয়োগ যেখানে সুষ্ঠু, সেখানে আনন্দ এবং সাফল্য—দুই-ই আছে।

অভিজ্ঞতা-জাত ভাবনা ও প্রাসঙ্গিক শিক্ষা (Concomitant and Associated Learning):

জানা থেকে অজানায় যাওয়াই হচ্ছে জ্ঞান-সমৃদ্ধির নীতি। এক প্রসঙ্গ থেকে অন্য প্রসঙ্গের যে উদ্ভব এবং তার জন্য যে ভাবনা—সেটাই যথাক্রমে শেখার দুটি দিক। তার একটি হচ্ছে অভিজ্ঞতা-প্রসূত ভাবনা, অন্যটি হচ্ছে প্রাসঙ্গিক শিক্ষা। এর মধ্যে একাধারে পরিচয় এবং পরিবর্তনের ধারা আছে। নূতন কাজের প্রত্যেক অভিজ্ঞতাই অনুশীলনকারীর মধ্যেই আনে একটা পরিবর্তন। এটাই শেখার প্রত্যক্ষ ফল। পরোক্ষভাবে চলে সংগঠনের কাজ। শেখার এ দুটি দিক ছাড়াও, অনেক ক্রিয়া-প্রক্রিয়া আছে। কারণ, প্রত্যেকটি শেখাই হচ্ছে কতকগুলি প্রতিক্রিয়ার সমষ্টি। এই প্রতিক্রিয়াগুলি এমনই জটিল এবং ব্যাপক যে, যে-কোন অঙ্গ-সঞ্চালনের সামান্যতম ভঙ্গীর সঙ্গেই কত-না প্রতিক্রিয়া বিজড়িত। অন্যদিকে আমরা যেভাবে বানান শিখি বা বন্ধুকে চিঠি লিখি, সেই প্রচেষ্টার পিছনে আছে ইচ্ছা এবং ভাবনার উৎস। কাজেই বুঝা যাচ্ছে যে, প্রত্যেক অভিজ্ঞতার মধ্যে আছে নানারকম শিক্ষার বীজ, যদিও আমরা এক সময়ে আপাতদৃষ্টিতে কেবলমাত্র একটি বিষয়ই শিক্ষা করছি। অথচ এই প্রস্তুতির আগে ও পিছনে আছে কত-না উদ্যম, পূর্ব অভিজ্ঞতা এবং কত সংখ্যাতীত প্রতিক্রিয়ার সমষ্টি। কিল্‌প্যাট্রিক্ এই পদ্ধতির নামকরণ করেছেন প্রাসঙ্গিক শিক্ষা বা প্রাথমিক পরিচিতি। উদাহরণস্বরূপ, "বেস"বল খেলার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এই খেলা চালু করার আগে দেখতে হবে, এই খেলা ছেলেদের কাছে হৃদয়গ্রাহী হবে কিনা; অথবা, কেমন করে, কি পদ্ধতিতে শেখালে ছেলেরা তাড়াতাড়ি শিখতে পারবে। অনুশীলনের সময় আরও সতর্ক হ'তে হবে। ব্যাট্ করার সময় ছাত্ররা যাতে উৎসাহ পায়, সেজন্য ক্রমান্বয়ে কৌশলগুলি দেখিয়ে দিতে হবে। তার ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে আগ্রহের সঞ্চার হবে। ফলে, অনুশীলন করতে করতে শিক্ষার্থীরা যখন তাড়াতাড়ি সেই খেলার কৌশল আয়ত্ত ক'রে নৈপুণ্য লাভ করবে, তখনই শিক্ষকদের যোগ্যতা প্রমাণিত হবে। তখনই সে শেখাটা হবে একাধারে আনন্দ ও গৌরবের বিষয়। এই যে শিক্ষার্থীরা ব্যাট্ করার নৈপুণ্য অর্জন করল, তারা যা শিখল, সেটাই হবে তাদের প্রাথমিক শিক্ষা (Primary learning)। এটা অনুশীলনের প্রত্যক্ষ ফল। আর পরোক্ষভাবে আসবে প্রাসঙ্গিক শিক্ষা। কোন একটি কাজের সূত্র ধ'রে প্রসঙ্গতঃ যে ভাবনার উদয় হয়, মনে যে প্রশ্ন জাগে, তার সমাধান খুঁজে পাওয়া যায় কর্মব্যস্ত প্রাসঙ্গিক অভিজ্ঞতা থেকে।

মনে করা যাক যে, ব্যাট্‌বল খেলার পর ছেলেদের মনে কতকগুলি প্রশ্ন জাগল। প্রথম মনে হ'ল, কি কাঠ দিয়ে এবং কেমন ক'রে ব্যাট্‌ তৈরি হয়? বার্নিশের রঙ কেমন, অথবা কোথাকার ব্যাট্‌ ভালো?—এইভাবে প্রসঙ্গক্রমে ব্যাট্‌বলের ব্যবহারিক প্রয়োগের অতিরিক্ত যে বাড়তি জ্ঞান, তাকে প্রাসঙ্গিক শিক্ষা বলা চলে। আর ব্যাট্‌ করার অভিজ্ঞতা থেকে পরোক্ষভাবে শিক্ষার্থীদের যে মনোভাব গড়ে উঠে, যে গুণাবলী জাগ্রত হয়, তাকে বলা হয় অভিজ্ঞতা-প্রসূত শিক্ষা। এই খেলাধূলা প্রসঙ্গে খেলোয়াড়দের মনে যে সব গুণাবলী—যেমন ন্যায়নিষ্ঠা, সহযোগিতা, দলপ্রীতি, সাহস প্রভৃতি—জাগ্রত হয়ে উঠে, সেগুলি দ্বারা তাদের মনোভাব সংশোধিত হ'তে পারে। এই কারণে অনেক শিক্ষাবিদ্‌ই বলেছেন যে, প্রাসঙ্গিক অথবা প্রাথমিক শিক্ষার চেয়ে অভিজ্ঞতা-জাত পরোক্ষ শিক্ষা কোন অংশে কম নয়। তাঁরা আরও বলেছেন যে, খেলোয়াড়দের এই সমস্ত মনোভাব (attitude)—যেমন অন্যের প্রতি সদ্ব্যবহার, সম্প্রীতির সঙ্গে খেলা—অনেক সময় মহৎ উদ্দেশ্য ও আদর্শের দ্বারা প্রভাবিত হয়। সেটা চরিত্র-গঠনের দিক থেকে কম লাভ নয়। কাজেই, এটা ব্যবহারিক শিক্ষার একটা ব্যাপক-তর দিক। এইজন্য শারীরিক শিক্ষার সুবিধা অনেক, পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্র বড়; এবং সেগুলিকে যথাযথ কাজে লাগানোর দায়িত্বও অনেক বেশী।

শিক্ষণ-বক্ররেখার বৈশিষ্ট্য (Characteristics of the learning Associated Curve):

কাপড় মাপার জন্য যেমন ফিতে, তেমনি শেখার গতি-রেখা পরিমাপের জন্য এই প্রগতি-চিত্র। এরই পরিপ্রেক্ষিতে সমস্ত শেখার প্রগতিকে জানা যায়। কোন কাজ বা অনুশীলনের রৈখিক চিত্র হচ্ছে শেখার এই বক্ররেখাগুলি। কোথা থেকে কতদূর যে শিক্ষার্থীরা এগুলো, অথবা তারা কখন কোন্‌ পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে, তার ক্রমোন্নতি ধরা পড়ে এই শেখার বক্ররেখায়। ব্যক্তিবিশেষের শেখার ক্ষমতা কি, যোগ্যতার সামর্থ্য কত, অথবা প্রতিটি কাজের প্রতিক্রিয়া থেকে কি হারে এবং কি পরিমাণে সাফল্য আসছে,—এককথায়, শেখার বক্ররেখাই হচ্ছে তার রৈখিক চিত্র। তাকে কেউ কেউ শেখার প্রগতি-পত্রও বলেছেন। এই গতি-চিত্রের প্রকৃতি কি হবে, তা নির্ভর করবে যে ধরনের কাজ শেখাতে হবে, তার উপর। কাজেই, যে-কোন দুটি ভিন্নমুখী শিক্ষা-পর্বের গতি-চিত্র বা প্রগতির ধরন এক নয়; এই কারণে শিক্ষণ-গতি-রেখার এমন কোন সাধারণ বৈশিষ্ট্য নেই, যা শেখার সর্ব পর্যায়ে প্রযোজ্য হ'তে পারে। তার একাধিক কারণও আছে।

প্রথমতঃ, ব্যক্তিবিশেষের যোগ্যতা, কার্য-ক্ষমতা এবং প্রতিক্রিয়া স্বতন্ত্র। তা ছাড়া, পরিবেশ এবং পরিস্থিতির প্রভাবও থাকে সকল ধরনের শিক্ষার পিছনে। মনে করা যাক, একজন শিল্পীর কাছে তিনজন ছাত্র কাজ শিখছে। শিল্পী নিরপেক্ষভাবে, সমান আগ্রহে এবং বিশেষ যত্নসহকারে শিক্ষার্থীদের একই বিষয় শিক্ষা দিলেন। কিন্তু শিক্ষান্তে যে পরীক্ষা গৃহীত হ'ল, তাতে দেখা গেল যে, তিনটি ছাত্রেরই প্রগতি-চিত্র বিভিন্ন হয়েছে। এখানে পরিবেশ, পরিস্থিতি এবং সুযোগ-সুবিধা এক হ'লেও, প্রত্যেকের ব্যক্তিগত গ্রহণ-ক্ষমতা ও সামর্থ্য অনুসারে শেখার মধ্যে পার্থক্য ঘট্‌ল। আরও একটি ব্যবহারিক উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। একজন ভালো ক্রিকেট খেলোয়াড় যে যোগ্যতার সঙ্গে নিপুণভাবে ব্যাট্‌ চালনা করতে পারে, যেভাবে তাড়াতাড়ি রান্‌ তুলতে পারে, অন্য একজন নিপুণ খেলোয়াড় কি তা পারে? কোন কোন ক্ষেত্রে হয়তো কতকগুলি বৈশিষ্ট্য প্রায় সমস্ত শিক্ষা-প্রকৃতির বক্ররেখায় দেখা যায়; কিন্তু সর্বাবস্থায় তার হার বা পরিমাণ এক নয়। এমনকি যে-কোন দুটি বক্ররেখার মূল্য তুলনামূলকভাবে এক নয়। ক্ষেত্রবিশেষে তো সেগুলি এক নয়-ই, কাজেকাজেই তার নির্দিষ্ট কোন গড় নেই। কখনও হয়তো কোন কোন বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একটা সমতা পরিলক্ষিত হয়; কিন্তু সেই অভ্যাসের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত উন্নতির প্রগতি কখনও এক পর্যায়ে হওয়া সম্ভবপর নয়। শেখার প্রথমদিকে হঠাৎ যে দ্রুত উন্নতি সাধিত হয়, মনস্তাত্ত্বিকরা তার নামকরণ করেছেন প্রথম নির্ঝর (initial spurt)। গোড়ার দিকে এত দ্রুত উন্নতি হওয়ার প্রধান কারণ হচ্ছে যে, প্রথম অবস্থার প্রতিক্রিয়াগুলি সহজ সরল ব'লেই তা আয়ত্ত করতে শিক্ষার্থীদের কোন বেগ পেতে হয় না। কিন্তু অনুশীলনের সঙ্গে সঙ্গে যতই জটিল প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন হ'তে হয়, ততই সেগুলি অনুধাবন করতে সময়, শ্রম ও অধ্যবসায়ের প্রয়োজন হয়। ফলে, উন্নতির চড়াইয়ে উঠতে দেরী হয়। তাই সেই অবস্থায় বক্ররেখার প্রগতি মন্থর হয়ে আসে। শেখার গোড়ার দিকে উৎসাহ থাকে অদম্য; ফলে, শিখতে বিশেষ অসুবিধা হয় না। সঞ্চালক-ভঙ্গীর বা মটর স্কিলের ক্ষেত্রে, যেখানে প্রায়শঃ কোন জটিল প্রতিক্রিয়া নেই, সেখানে অনায়াসেই একটা কিছু শিক্ষা করা যায়।

প্রতিক্রিয়াগুলি সাময়িক বা বিক্ষিপ্ত হ'লেও, তার প্রভাব স্থায়ী এবং ব্যাপক। তার মধ্যে একটা অন্তর্নিহিত অখণ্ডতা আছে। তাই প্রতিক্রিয়াগুলিকে সমগ্রভাবে গ্রহণ করা উচিত। তা হ'লেই শেখার মধ্যে সেই অখণ্ডতাকে পাওয়া যায়; সেটাকে জীবন-অভিজ্ঞতার প্রবাহ বলা চলে। শেখার চড়াই পার হয়ে যে সমতল গতি-রেখা আছে, তাকে 'প্লেটো' বা মালভূমি বলে। সে অবস্থায় শেখার কাজটা প্রায় স্তিমিত অবস্থায় থাকে, পরিণাম ও পরিমিতির মাঝের এই সময়টা যেমন

অনুর্বর, তেমনি অফলপ্রসূ। এই যে সাময়িক বিরতি, এটাকে পরবর্তী শিক্ষার প্রস্তুতি-ক্ষেত্র বলা চলে। তখন অবশ্য পুনরাবৃত্তি চলে, শেখা জিনিসের ঝালাই হয় ভিতরে ভিতরে। এককথায়, এটাই হচ্ছে পূর্ব সূচীর পুনরালোচনা আর পরবর্তী আরম্ভের প্রারম্ভিক ভূমিকা।

প্রত্যেক শারীরিক অনুশীলনের একটি সীমা-রেখা আছে—যার সন্নিকটে যাওয়া যায়, কিন্তু সেখানে পৌছানো যায় না। যদিও যে-কোন পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার অনন্ত শক্তি মানুষের আছে, তথাপি কার্যক্ষেত্রে মানুষের দৈহিক ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। দৈহিক গঠনের অসুবিধার জন্য পারতপক্ষে যা হওয়া উচিত, তা মানুষের দ্বারা সম্ভবপর হয় না। বিশেষ ক'রে ক্ষিপ্রতার ক্রমবৃদ্ধির ক্ষেত্রে। নিরলস প্রচেষ্টায় যতটা করা সম্ভব, তাকে মনস্তাত্ত্বিকরা বলেছেন, আনুমানিক উর্ধ্বসীমা। সোজা দৌড়ের ক্ষেত্রে যে 'বিশ্ব-রেকর্ড' সৃষ্টি হয়েছে, এতদিনের অনুশীলনের পরেও জগতের ক'জন দৌড়ের সেই পর্যায়ে যেতে পেরেছেন? যদিও বিশ্ব অলিম্পিকের ফলাফল থেকে বার বার প্রমাণিত হয়েছে এবং হচ্ছে যে, শৈত্য-ক্রীড়া-প্রতিযোগিতার সর্বক্ষেত্রেই প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছে। তথাপি যে কোন কোন ক্ষেত্রে একটা অভূতপূর্ব, অভাবনীয় উন্নতি দেখা গেছে, এমন নয়। যখন কেউ শেখার বক্ররেখার সীমান্তে এসে পৌছায়,—যার পর আর কোন উন্নতি সম্ভব নয়,—সেই অবস্থাকে বলে শিক্ষার্থীর মনস্তাত্ত্বিক সীমা। শারীরবৃত্তের সামর্থ্যের মধ্যে যা সম্ভব, সেই অনুশীলনী-স্তরকে মনস্তাত্ত্বিক সীমা ব'লে অভিহিত করা চলে।

হয়তো গুটি কয়েক শ্রেষ্ঠ 'য়্যাথেলেট্' কোন কোন প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে এই মনস্তাত্ত্বিক সীমায় এসে পৌছেছেন, সেটা অবশ্য বিশেষ উন্নতির একটা স্বতন্ত্র নজির। কাজেই, তা নিয়ে শারীরিক শিক্ষকদের মাথা ঘামানোর কিছু নেই। অন্যপক্ষে, অনেকে যখন তার দৈহিক সামর্থ্য অনুযায়ী দেহ ও মনের দিক থেকে ঐ পর্যায়ের কাছাকাছি এসে পৌছেছে, সেখানে তাদের পরবর্তী অনুশীলনের নির্দেশ কি হবে, সেটা নিঃসন্দেহে একটা সমস্যার কথা। এই প্রসঙ্গে আরও কয়েকটি প্রশ্ন আছে। কারণ, সে অবস্থাটা এমনই এক পর্যায়ের কথা,—যেখানে শিক্ষার্থী প্রাণপণ চেষ্টা করলেও যে আরও কিছু উন্নতি করতে পারবে,—তার কোন স্থিরতা নেই; কাজেই, যেখানে আর কোন পথ খোলা নেই, সেখানে তার পরবর্তী নির্দেশ কি হবে? উদাহরণস্বরূপ, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রদের বই পড়ার কথা বলা চলে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পড়া শেষ হ'লেও অনেক ছাত্রদেরই দ্রুতপঠন-ক্ষমতার কোন উন্নতি হয়নি।

অথচ তার জন্য তাদের কোন ভাবনা নেই, এমনকি পঠনোন্নতির জন্য তাদের কোন উদ্যমই দেখা যায় না। হাতের লেখার ক্ষেত্রেও ঐ একই ধরনের সমস্যা দেখা যায়। এমনতর আরও কত ঘটনার পুনরাবৃত্তি প্রতিনিয়তই আমাদের দৈনন্দিন জীবনে সংখ্যাতীত বার ঘট্‌ছে।

এবার শারীরিক অনুশীলনের কথাই ধরা যাক। দৌড়, বর্শা-নিক্ষেপ, সাঁতার কাটা প্রভৃতি বহু ক্ষেত্র থেকেই অনুরূপ অজস্র উদাহরণ পাওয়া যেতে পারে। যাঁরা এ-বিষয়ে বিশেষজ্ঞ, যাঁরা শারীরিক শিক্ষার শিক্ষক, তাঁরা কিন্তু সাধারণ শিক্ষার্থীদের কথা নিয়ে মাথা ঘামান না। তাঁরা দু'চারজন শীর্ষস্থানীয় প্রতি-যোগীদের নিয়েই হয়তো নানাভাবে ব্যস্ত আছেন, অথচ তাঁদের চোখের সামনেই বারো আনা শিক্ষার্থী অনেক সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন, সে-কথা ক'জন ভাবছেন? মনস্তাত্ত্বিক সীমার কথা নিয়ে শারীরিক শিক্ষকদের ভাববার কিছু নেই। সেটা—তাঁদের এক্তিয়ারের বাইরে—বিশেষজ্ঞদের কাজ। তাঁদের এটাই দেখা কর্তব্য, যাতে সমস্ত শিক্ষার্থী এমন একাধিক অনুশীলনে পারদর্শী হ'তে পারে, যেগুলি তাদের পরবর্তী কালের দৈনন্দিন জীবনে সত্যিকার কাজে লাগতে পারে।

কেমন ক'রে শেখার সুব্যবস্থা সম্ভব ঃ

শেখার যোগ্যতা অর্জনের কতকগুলি নির্দিষ্ট এবং সুপ্রতিষ্ঠিত নীতি আছে। সেগুলির সুষ্ঠু প্রয়োগ ও পুনরালোচনার বিশেষ প্রয়োজন আছে। প্রতিদিনের অভিজ্ঞতা থেকে ব্যক্তিবিশেষের কাছে শেখার বিচিত্র প্রেরণা আসে। শারীরিক শিক্ষার ক্ষেত্রে নির্দেশিত শিক্ষার সরাসরি একটা সংযোগ আছে। সেইজন্য সতর্কতার সঙ্গে দেখতে হবে যে, শিক্ষার্থীদের প্রত্যেকটি প্রতিক্রিয়া তাদের নিজ নিজ কাজে কতখানি সাহায্য করছে। এই শেখার নীতি সম্পর্কে কতকগুলি তথ্য নির্ধারিত হয়েছে।

১। তার প্রথমটি হচ্ছে "All learning is reacting" ঃ

প্রত্যেক শেখার মধ্যে আছে একটা পুনরভিনয়। অনুশীলন থেকে অনুকরণ, তার পর আসে অভ্যাস। ফুটবল খেলার কথা ধরা যাক। ফুটবল খেলার মহড়ার সময় বার বার অনুশীলনের দ্বারা সেই খেলার ব্যবহারিক নীতিগুলি অনুধাবন ক'রে আমরা যখন একাধিক বার তার পুনরভিনয় করি, তখনই খেলার বিচিত্র নৈপুণ্য আমাদের আয়ত্তে আসে। আমরা তখন খেলোয়াড়রূপে দক্ষতা অর্জন করি। নাচের ক্ষেত্রেও অনুরূপ প্রক্রিয়ার প্রয়োজন হয়। প্রথমে আমরা অনুশীলনের দ্বারা মুদ্রা, ছন্দ, তাল এবং পরে সমগ্রভাবে সেগুলির পুনরভ্যাস

দ্বারাই নাচ শিখি। এ নীতি সমস্ত শেখার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। গতি-সঞ্চালক ভঙ্গী (motor activities), মানসিক উত্তম এবং নৈতিক অভ্যাস গঠনের ক্ষেত্রেও এমনতর কত না প্রক্রিয়ার প্রয়োজন হয়।

২। প্রত্যেক শিক্ষার্থীর শেখার তাগিদ থাকা চাই ঃ

মনে করলেই যে শেখা যায়, তা নয়। শেখার জন্য বিশেষ তাগিদ বা অদম্য আগ্রহ থাকা চাই। যদি কোন শিক্ষার্থী মনে করে যে, সে যা শিখেছে সেটাই যথেষ্ট, তার আর কোন অনুশীলনের প্রয়োজন নেই, অথবা সে সেই অবস্থাতেই খুশী থাকতে চায়, সেটা নিষ্ক্রিয় মনের নিশ্চেষ্ট অবস্থা। সেখানে উৎকর্ষলাভের কোন সাধনাই নেই। ফলে, পরবর্তী উন্নতিলাভের পথও সেখানে অবরুদ্ধ। কিন্তু শিক্ষার্থী যখন নিজ চেষ্টায় শেখার মাঝামাঝি পর্যায়ে এসে পৌছেছে,—অথচ চেষ্টা ক'রেও সে আর এগুতে পারছে না,—তখন নূতন প্রেরণা এবং মহান আদর্শ তার সামনে তুলে ধরতে হবে। সম্ভব হ'লে এই সময় সুদক্ষ শিক্ষকের প্রদর্শিত এমন অপূর্ব ক্রীড়া-কৌশল দেখানো উচিত, যা শিক্ষার্থীকে নূতন উত্তমে উদবুদ্ধ করবে, তার মধ্যে সঞ্চার করবে অদম্য মানসিক শক্তি। এতে শিক্ষার্থী নিজ মান সম্পর্কে অবহিত হ'তে পারবে ; এবং তুলনা-মূলকভাবে বিচার ক'রে সে জানতে পারবে যে এখনও তার কতটা শিখতে হবে ?

৩। অপ্রয়োজনীয় প্রতিক্রিয়াগুলি বর্জন করতে হবে ঃ

প্রত্যেক অনুশীলনের একটা ব্যবহারিক প্রয়োজনের দিক আছে। কাজেই, সেই প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি রেখেই শিক্ষার্থীকে মিতাচারী হ'তে হবে। তা না হ'লে বাড়ীতে অভ্যাসগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করবার সময় মুশ্‌কিল বাধবে। সেই কারণে এমন অভ্যাস গঠন করা উচিত নয়, যা পরে পাল্‌টাতে হবে। উদাহরণ-স্বরূপ, কতকগুলি খেলার মূল ভঙ্গীর কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন—ব্যাট্‌ করা, বল স্যুট্‌ করা প্রভৃতি। এগুলি করানোর সময় কখনই সংখ্যার দ্বারা শেখানো উচিত নয়। সব সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যে, কেমন ক'রে সহজ, স্বাভাবিক ভঙ্গীগুলি আয়ত্তে আসে। অনুশীলনের দ্বারা কোন একটা অভ্যাস সংগঠনের আগে, যা-কিছু অবান্তর, অপ্রয়োজনীয়, যতদূর সম্ভব তা পরিহার করতে হবে।

৪। শারীরিক কৌশলগুলিকে সামগ্রিকভাবে শিখতে হবে ঃ

শেখার প্রতিক্রিয়াগুলির মধ্যে একটা অখণ্ডতা আছে। সেই সমগ্রতার পরিপ্রেক্ষিতে যে অনুশীলন, সেটাই হচ্ছে সত্যিকার শেখা। তাই কোন একটা

জিনিস শেখার সময় অংশবিশেষ শিক্ষা না ক'রে, সামগ্রিকভাবে সমস্তটাই অভ্যাস করতে হয়। তাতে অপচয়ের চেয়ে সঞ্চয়ের সম্ভাবনা অনেক বেশী। কোন কিছু শেখানোর সময় এ-বিষয়ে শিক্ষার্থীকে উৎসাহ দিতে হবে। 'গোলা ছোঁড়া'-র কথাই ধরা যাক। বিশেষজ্ঞদের অভিমত থেকে জানা গেছে যে, চক্রাকারে ঘুরে সমস্ত দেহের শক্তি প্রয়োগ ক'রেই গোলা ছুঁড়তে হয়। কিন্তু তা না ক'রে কেউ যদি প্রথমে ঘুরতে এবং পরে গোলা ছোঁড়ার অভ্যাস করে, তা হ'লে কার্যকালে সে অসুবিধায় পড়বে। কারণ, প্রথম থেকে অনুশীলন দুটি-একটি অভ্যাস-সূত্রে যুক্ত না থাকার দরুন শিক্ষার্থীকে বিশেষ মুশ্‌কিলে পড়তে হবে। ফলে, দুটি অভ্যাসকে একত্রে যুক্ত করতে যেমন সময় লাগবে, তেমনি অনুশীলনের ক্ষেত্রেও কিছুটা অপব্যয় হবে। কাজেই, এমনতর অনুশীলনের ফলও আশাপ্রদ হয় না। প্রথম পদ্ধতিটি শ্রমের দিক থেকেই কেবল মিতব্যয়িতাই নয়, বিশেষভাবে কার্যকরীও বটে। তা ছাড়া, স্মরণ ও অনুসরণের দিক থেকেও সুবিধাজনক। সর্বোপরি সমগ্রভাবে বিষয়টাকে বোঝা ও জানা যায়।

৫। যে শ্রম খেলোয়াড়দের প্রক্ষোভকে অতি উচ্চগ্রামে নিয়ে যায় তা বর্জনীয়ঃ

প্রক্ষোভ মানুষের দৈহিক ও আন্ত্রিক যন্ত্রে একটা উত্তেজনার সৃষ্টি করে। উত্তেজনার মাধ্যমে যে অতিরিক্ত শক্তি ব্যয়িত হয়, তার জন্য দৈহিক ক্লান্তি আসে। সেজন্য শিক্ষার্থীকে প্রস্তুত থাকতে হয়। সূক্ষ্ম আনুভূতিক কাজের প্রেরণা—যার জন্য বিচার-বিবেচনা বা প্রেরণার দরকার—এই ধরনের উত্তেজক কাজের মধ্য দিয়ে তা আসে না। শুধু তাই নয়, এতে শিক্ষার্থীর উদ্যম ব্যাহত হয়। গ্রিফিথ-ও এ-কথা সমর্থন করেছেন। তিনি বলেছেন যে, এই প্রক্ষোভাত্মক উত্তেজনার জন্যই বিশ্ববিদ্যালয়ের শৈত্য-ক্রীড়া-প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রেও কোন উচ্চাঙ্গের বিচার-বিবেচনা দেখা যায় না। এমনকি অনুশীলনের সময়ও কোন বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায় না। কাজেই, এই প্রকট ধরনের যে শারীরিক শিক্ষা, যাতে কেবল উত্তেজনার আতিশয্য আছে, তা বর্জন করা উচিত।

৬। যোগ্যতর শিক্ষণ-প্রগতির জন্য বক্ররেখার গতিকাল ও বিস্তৃতিকে জানা দরকারঃ

অনুশীলনের সময় প্রলম্বিত হওয়া উচিত নয়। অনুশীলন সঠিক এবং শিক্ষণ-সময় সংক্ষিপ্ত হ'লেই সুফল পাওয়া যায়। স্বল্প সময়ের মধ্যে যেখানে সামগ্রিকভাবে অনুশীলন করানো সম্ভব হয়েছে, সেখানেই অপেক্ষাকৃত বেশী সুফল পাওয়া গেছে। শিক্ষণ-সময় স্বল্প এবং শেখার মেয়াদ দীর্ঘ হ'লেই অতি সহজেই অভ্যাস কায়েম

হ'তে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা চলে যে, এক সঙ্গে ৬ ঘণ্টাকাল অনুশীলন করা অপেক্ষা, প্রতিদিন কুড়ি মিনিট ক'রে একাধিক দিন ধ'রে অভ্যাস করাটাই বেশী সমীচীন। প্রতিদিন কুড়ি মিনিট ক'রে অনুশীলন ক'রে ১৮ দিনে যা সম্ভব, প্রত্যহ এক ঘণ্টা ক'রে একাদিক্রমে ছ'দিনেও তা সম্ভবপর নয়। গ্রিফিথ-ও এ মতবাদ সমর্থন করেছেন। তিনি বলেছেন যে, কোন একটি বিশেষ বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করতে হ'লে, গড়ে প্রতিদিনের কুড়ি মিনিটের অভ্যাসই যথেষ্ট। বাসকেট বল ছোঁড়া, ড্রিব্‌লিং ইত্যাদি যে-কোন অনুশীলনের ক্ষেত্রেই একথা সত্য। তিনি আরও বলেছেন যে, কোন একটা অভ্যাস আয়ত্ত হ'লে, পূর্বের অনুশীলনগুলিকে একদিন অথবা দুদিন অন্তর ঝালিয়ে নিলেই চলে। শেখার ক্ষেত্রে কিছুটা অগ্রসর হ'লে, দিনে একবার পুনরভ্যাসের প্রয়োজন। পরে শিক্ষণ-কালকে আরও সংক্ষিপ্ত ক'রে দুদিন বা তিনদিন অন্তর তার ঝালাই করলেই চলে।

৭। প্রত্যেক শিক্ষার্থীকেই জানতে হবে অভিপ্রেত পরিণতি এবং কাজের ফলাফলকে ঃ

অনুশীলনের আগেই জানা দরকার তার পরিণাম ও ফলাফল। তা না হ'লে লক্ষ্যে পৌছানোর পথ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর হবে। পরীক্ষার ফলে দেখা গেছে যে, শিক্ষার্থী যেখানে অনুশীলনের পরিণাম সম্বন্ধে অবহিত, তার দ্বারা সে যে কিভাবে উপকৃত হবে, তা-ও সে জেনেছে—সেখানেই আশু ফললাভের সম্ভাবনা আছে। শারীরিক শিক্ষার ছাত্রদের বিশেষভাবে জানতে হবে যে, কিভাবে অগ্রসর হ'লে কি ফল লাভ করা যাবে। শৈত্য-ক্রীড়া অনুশীলনের সময় শিক্ষকদের সর্বদা এই কথাটাই স্মরণ রাখতে হবে। ক্ষেত্রবিশেষে ফলাফলের যে সব মান নির্দিষ্ট হয়েছে—যেমন দূরত্বের পরিমাপ, বাসকেট্ বল খেলা, ক্রিকেট বল করা, ভলি খেলা প্রভৃতির নির্ভুল অনুশীলন পন্থা—সেগুলি জানা থাকলে অনুশীলন সহজসাধ্য হয়। অনেক সঞ্চালক-ভঙ্গীর চূড়ান্ত কার্য-ক্ষমতার যে তালিকা আছে, সেগুলিকে এই প্রসঙ্গে কাজে লাগানোর চেষ্টা করতে হবে। 'য়্যাথেলেটিক্ বাড্‌গে টেস্ট', 'য়্যাথেলেটিক্ স্টার টেস্ট'-জাতীয় শারীরিক শিক্ষার মানগুলিকে কাজে লাগাতে হবে।

৮। ভুল-ত্রুটিগুলিকে পরিহার ক'রে যা শেখা গেছে, তার সংশোধন করতে হবে ঃ

অনেক সময় এমন কতকগুলি ত্রুটি উন্নতির অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় যে, তার আশু প্রতিকারের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। অথচ, কিছুতেই যেন সেগুলি ধরা পড়ে না। ফলে, চেষ্টা ক'রেও শিক্ষার্থীরা আশানুরূপ উন্নতি করতে পারে না। বিশেষজ্ঞ

শিক্ষকের সেদিকে দৃষ্টি থাকা কর্তব্য। অথচ সকল শিক্ষকের সেদিকে তেমন দৃষ্টি থাকে না। ফলে, সমস্যাগুলি প্রায়শঃ অমীমাংসিতই থেকে যায়। নিজ অভিজ্ঞতা থেকে একটা দৃষ্টান্ত দিই। একবার এক শারীরিক মহাবিদ্যালয়ে দেখেছিলাম যে, কতকগুলি ছাত্র একটি ভল্ট বক্সে লাফানোর অভ্যাস করছিল। সেই ছাত্রদের মধ্যে একজন বার বার আপ্রাণ চেষ্টা ক'রেও যেন কিছুতেই স্প্রিং বোর্ডে লাফিয়ে ভল্ট বক্স পার হ'তে পারছিল না। তার এই অসাফল্যের কারণ যে কি, শিক্ষক মহাশয় যেন কিছুতেই আবিষ্কার করতে পারছিলেন না। অথচ সেই ছাত্রটিকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য তিনি কেবলই বলছিলেন—'চেষ্টা করো, মনে জোর দাও'। কিন্তু তিনি ভুলে যাচ্ছিলেন যে, সেটা মনোবলের ব্যাপার নয়, বৈজ্ঞানিক কৌশলের কথা। দূর থেকে অন্য একজন অধ্যাপক ছাত্রটিকে লক্ষ্য করছিলেন। এত চেষ্টা ক'রেও ছাত্রটির উদ্যম বার বার ব্যর্থ হচ্ছে দেখে, তিনি সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। স্প্রিং বোর্ডের যেখানে লাফালে স্প্রিং পাওয়া যাবে, সেই স্থানটি তিনি দেখিয়ে দিলেন। অমনি পরের বারে ঈপ্সিত ফল লাভ হ'ল। ছাত্রটি শিক্ষণ-প্রহসনের হাত থেকে রেহাই পেয়ে বাঁচল। এ ছাড়া যা শেখা গেছে, তার মধ্যে যদি কোন অসঙ্গতি থাকে, তবে অবিলম্বেই তা দূর করতে হবে।

৯। শিক্ষার্থীর নিজের উন্নতি সম্বন্ধে তার ধারণা থাকা উচিত:

শিক্ষা যে কোন্ পথে কতদূর অগ্রসর হয়েছে এবং কি ধারায় এগুচ্ছে, প্রত্যেক শিক্ষার্থীর তা জানা দরকার। সেইজন্য বিচক্ষণ শিক্ষকরা শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীণ উন্নতির দৈনন্দিন হিসাব-নিকাশ করেন। শুধু তা করলেই চলবে না, প্রত্যেকের জন্য ব্যক্তিগত নজির-পত্র রাখতে হবে। শিক্ষণ-গ্রহণের পূর্বে প্রত্যেকটি শিক্ষার্থীকেই পরীক্ষা ক'রে নিতে হবে। তা না হ'লে, কি পর্যায় থেকে শিক্ষার্থী কোন্ স্তরে যে গিয়ে পৌঁছাল, তা জানা যাবে না। অনুশীলন আরম্ভ হওয়ার পক্ষকাল পরে পরীক্ষা ক'রে দেখা উচিত শিক্ষার্থী কতদূর অগ্রসর হ'ল। দৌড়-প্রতিযোগিতার মহড়া দেওয়ার সময় প্রতি শনি কি শুক্র বারে 'টাইম রেকর্ড' করার ব্যবস্থা রাখতে হবে; সেই সময়ের কমা-বাড়া থেকেই শিক্ষার্থীরা নিজেদের মান সম্বন্ধে সচেতন হবে। ক্রমে ক্রমে শিক্ষার্থীরা কতো উন্নতি করেছে, সেটাই তাদের সামনে তুলে ধরতে পারলে, অনুশীলনের সুফল পাওয়া যাবে।

১০। অনুপ্রেরণাগুলিকে শেখার কাজে লাগাতে হবে:

সামান্য একটু প্রেরণা এবং উৎসাহ শিক্ষার্থীর প্রাণে উদ্দীপনা আনে। কাজেই, শিক্ষকদের সর্বদা মনে রাখতে হবে, যে-কোন ক্ষেত্রেই শিক্ষার্থীকে নিরুৎসাহ করা ঠিক হবে না; তাকে এমনভাবে প্রেরণা যোগাতে হবে, যাতে যেন সে ক্রমশঃ উন্নতি

করতে পারে। সুপরিকল্পিত উপায়ে এমনভাবে উৎসাহ যোগাতে হবে সকল শিক্ষার্থীই যেন উপকৃত হয়। এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে রাখতে হবে সকলের যোগ্যতা ও কার্য-ক্ষমতা এক নয়। সেক্ষেত্রে অনুশীলনের জন্য তুলনামূলকভাবে কম বা বেশী সময় লাগবে। কেউ কেউ হয়তো বহু চেষ্টা ক'রেও একটা কাজ শিখতে পারছে না, অথচ আর একজন অতি অল্প সময়ে সেটা আয়ত্ত করছে। যে ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা কিছু শিখতে পারছে না, সেখানে যে নিরলস সাধনার দরকার, সেই উৎসাহ যোগান দিতে হবে শিক্ষার্থীদের মনে। এই উৎসাহ দেওয়ার জন্য প্রয়োজন-বোধে পুরস্কার দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। পুরস্কারের চেয়ে শারীরিক শিক্ষার ক্ষেত্রে নম্বর দেওয়ার পদ্ধতি "পয়েন্ট সিস্টেম"-এ অনেক ভালো ফল পাওয়া গেছে। এই পরিকল্পনাটি যদি নিরপেক্ষ বিবেচনার উপর প্রতিষ্ঠিত এবং পরিকল্পিতভাবে হয়, তা হ'লে আশানুরূপ ফল পাওয়া যেতে পারে।

১১। শিক্ষণীয় বিষয়গুলিকে শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক যোগ্যতার স্তরে নিয়ে যেতে হবে ঃ

সাধারণ ক্ষমতার বহির্ভূত কোন বিষয় হ'লে, সেখানে মুষ্টিমেয় কয়েকজন-মাত্র উপকৃত হ'তে পারে। সব সময় পূর্ব অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে নূতন বিষয় শেখানো উচিত। যে কাজের সঙ্গে শিক্ষার্থীর পূর্ব পরিচয় নেই, হঠাৎ সে কাজ শেখাতে গেলে, সে কাজের কোন প্রতিক্রিয়াই শিক্ষার্থীর শেখার কাজে লাগবে না। যে জীবনে কোন দিন মুষ্টিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি,—তাকে দিয়ে আর যাই হোক—তাকে হঠাৎ মুষ্টিযুদ্ধে পারদর্শী ক'রে তোলা যাবে না। এক্ষেত্রে প্রবণতা ও অভিজ্ঞতার কথাই সর্বাগ্রে জানা দরকার। দুধে লবণ ও মিষ্টতা আছে ব'লেই, তা জাল দিলে, তাতে ঐ দুটো স্বাদই পাওয়া সম্ভব ; কিন্তু জলের মধ্যে ঐ জাতীয় কোন উপাদান নেই ব'লেই, অনাদি কাল ধ'রে জল ফুটালেও ঐ ধরনের কোন স্বাদ পাওয়া যাবে না। ব্যক্তিবিশেষের যোগ্যতা ও সামর্থ্যের ক্ষেত্রেও ঐ কথা প্রযোজ্য।

১২। আত্ম-বিচার উন্নতির সহায়ক ঃ

ব্যক্তিগত উন্নতির আর একটি পন্থা আত্ম-বিশ্লেষণ। দর্শন যাকে আত্মানুসন্ধান বলেছে, প্রত্যেকের অনুশীলনের ক্ষেত্রেও সেই আত্ম-বিচার এবং নিজ-যোগ্যতা পরিমাপের কথা আছে। যতক্ষণ না আত্ম-শক্তি সম্পর্কে আত্ম-জ্ঞান জন্মাবে, ততক্ষণ কোন কাজেই সত্যিকার উন্নতি নেই। এই প্রসঙ্গে প্রসিদ্ধ ফুটবল 'কোচার' দুঃখীরামবাবুর কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি আত্ম-বিচার ও আত্ম-বিশ্লেষণকে বিশেষভাবে অনুশীলনের কাজে লাগানোর চেষ্টা করতেন। প্রথম অবস্থা থেকেই খেলোয়াড়দের ব্যক্তিগত দুর্বলতা ও অক্ষমতা কোথায়, তা তিনি আবিষ্কার করতেন।

কোন্ টিমের সঙ্গে কিভাবে খেলতে হবে, সেই পরিপ্রেক্ষিতে তিনি শিক্ষা দিতেন। তিনি বার বার বলতেন, আগে নিজেদের ভুল-ত্রুটি যতদূর সম্ভব নিজেরা ধরার চেষ্টা করো, নইলে সে অবস্থার সত্যিকার কোন সংস্কারই হবে না। এই প্রসঙ্গে তাঁর দেওয়া একটি ব্যবহারিক শিক্ষার দৃষ্টান্ত দিই। বহরমপুরে হুইলার শিল্ডের খেলা হচ্ছে। কৃষ্ণনগরদল কিছুতেই বিপক্ষ দলের সঙ্গে পেরে উঠছে না। কেন যে তারা পেরে উঠছে না, তিনি তা লক্ষ্য করছিলেন। তাঁর মনের ইচ্ছা—কৃষ্ণনগরের তরুণদলই জয়লাভ করুক। তাই হাফ্‌ টাইমের সময় তিনি সেই তরুণ খেলোয়াড়দের সঙ্গে দেখা করলেন। তাদের সামনে বিপক্ষ দলের কয়েকজন সেণ্টার ফরোয়ার্ডদের দুর্বলতার কথা উল্লেখ করলেন। কিজন্য যে তারা ওদের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারছে না, সে-কথা উল্লেখ-প্রসঙ্গে তিনি খেলোয়াড়দের নিয়ে কয়েকটি বিষয়ে তালিম দিলেন। তিনি বললেন—"মনে কর 'আমি' সতু চৌধুরী, আমার বাঁ পা ছাড়া ডান পা চলে না। কাজেই, আমাকে আট্‌কাবার প্রকৃষ্ট উপায় হচ্ছে, তোমার ডান পা দিয়ে আমার বাঁ পায়ের বলগুলিকে কোন রকমে সরিয়ে দেওয়া। ফলে, ডানদিকের বল যতক্ষণ না বাঁদিকে আসবে, ততক্ষণ আমি অর্থাৎ সতু চৌধুরী অচল।" এই কৌশলের মহড়া দেওয়ার পর দ্বিতীয়ার্ধে খেলার চেহারা গেল বদলে। শ্রদ্ধেয় দুঃখীরামবাবুর প্রদর্শিত পথ অনুসরণ ক'রে কৃষ্ণনগরদল সে খেলায় জয়লাভ করে। তাঁর প্রত্যেকটি শিক্ষণ-পদ্ধতির মধ্যে এই আত্ম-বিশ্লেষণ ছিল। এইজন্যই বাংলার ফুটবল খেলার ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ শিক্ষক (বা কোচার)-রূপে তাঁর যথেষ্ট সুখ্যাতি আছে।

কেমন ক'রে সঞ্চালক ভঙ্গী বা কৌশল (মটর স্কিল) শেখা যায় ঃ

বৌদ্ধিক শিক্ষার ক্ষেত্রে যেমন কতকগুলি রীতিনীতি আছে, দৈহিক সঞ্চালক ভঙ্গী আয়ত্ত করার বেলায়ও তেমনি কতকগুলি পদ্ধতি আছে। অর্থপূর্ণ অনুরাগ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত যে-কোন কাজ—যা শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতা ও সামর্থ্যের আওতায় পড়ে—আয়ত্ত করা সহজসাধ্য। অভ্যাসকালে এমন সুপরিকল্পিতভাবে অনুশীলন-প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে যে, তার প্রত্যেকটি প্রতিক্রিয়াই শিক্ষার্থীকে কেবল যে সাফল্যের দিকে নিয়ে যাবে তা নয়, এমন অনুকূল প্রীতিকর অবস্থার সৃষ্টি করবে, যা থেকে শিক্ষার্থী ভুল প্রতিক্রিয়াগুলিকে সজ্ঞানে পরিহার করতে শিখবে। এর জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত প্রেরণার সৃষ্টি করা। সম্ভব হ'লে শিক্ষার্থীদের সামনে উচ্চাঙ্গের আদর্শ ক্রীড়া-প্রদর্শনীর বিশেষ ব্যবস্থা করতে হবে। এই সব উচ্চাঙ্গের অনুশীলন-কৌশলগুলিকে শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরলে, সে নিশ্চয় অনুপ্রাণিত হবে। সেই আদর্শ পর্যায়ে পৌছানোর জন্য সে বিশেষভাবে সচেষ্ট হবে। এজন্য

মাঝে মাঝে সংশোধনী পর্যালোচনারও বিশেষ দরকার। তা ছাড়া, শিক্ষণ-সময়গুলিকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করতে হবে যে, প্রত্যেকটি শিক্ষার্থীই যেন আপনা থেকেই বহিঃপ্রেরণায় সঠিকভাবে সাড়া দিতে পারে। পরীক্ষার দ্বারা দেখা গেছে যে, অধিকাংশ বৃহৎ পৈশিক ভঙ্গী (যেমন—হাত-পা সঞ্চালনের ব্যাপারে) শিক্ষাদান-ব্যাপারে, শিক্ষকদের দেখানো ভঙ্গীগুলিই শিক্ষার্থীদের বেশী কাজে লাগে। বিশেষ ক'রে নাচের ক্ষেত্রে,—যেখানে এমন কতকগুলি জটিল মুদ্রা বা ভঙ্গী আছে—যা হাজার বুঝিয়ে দিলেও তা আয়ত্ত করা সম্ভবপর নয়, সেই নিখুঁত ভঙ্গীগুলি একাধিক বার দেখিয়ে দিলেই, শিক্ষার্থীর পক্ষে তা আয়ত্ত করা সহজসাধ্য হয়। এই কারণে মনস্তাত্ত্বিকরা বলেছেন, প্রত্যেক মটর স্কিলের ক্ষেত্রে 'মডেল' বা আদর্শ ভঙ্গী প্রদর্শনের বিশেষ প্রয়োজন। এর সঙ্গে পরিপূরক জ্ঞান হিসাবে লিখিত ও মৌখিক নির্দেশ বা উপদেশ দিতে পারলে খুবই ভালো হয়। ডাঙায় সাঁতার শেখার কসরৎ যতই শেখানো যাক না কেন, শিক্ষক যতক্ষণ না জলে নেমে দেখিয়ে দিচ্ছেন, ততক্ষণ শিক্ষার্থীর পক্ষে তা কার্যকরী হ'তে পারে না।

এই প্রসঙ্গে সাঁতার শেখার একটি ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত দিই। এই গল্পটি শ্রদ্ধেয় ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়ের জীবনের একটি ঘটনা। ছাত্রাবস্থায় তাঁরা চারজন সাঁতার শেখার অনুশীলন করছিলেন। অনেক অভ্যাস করার পর শিক্ষক মহাশয় বললেন, 'তোমরা ল্যাণ্ড্রিলে পারদর্শী হয়েছ। এবার জলে নেমে একটু অভ্যাস করলেই সাঁতার শেখা সমাপ্ত হবে।' যেদিন কাশীর গঙ্গায় সাঁতার দেওয়ার জন্য তাঁরা নামলেন, সেদিন শরীর খারাপ থাকায় সেন মহাশয় যেতে পারেননি। বিকালের দিকে বন্ধুদের বাসায় গেলেন তাঁদের সাফল্যের খবর নিতে। তিনি সেখানে গিয়ে যখন বন্ধুদের একজনকে সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ভাই, গঙ্গাবক্ষে কতদূর যেতে পেরেছিল ?' বন্ধুটি গম্ভীর হয়ে উত্তর দিলেন—হাত দশেক। সেন মহাশয় তখন জিজ্ঞাসা করলেন—কোন্ দিকে ? বন্ধুটি এবার বললেন—নীচের দিকে। অর্থাৎ, তাঁরা প্রায় সলিল-সমাধি লাভ করছিলেন, নৌকার মাঝিরা তাঁদের উদ্ধার না করলে যে কি হ'ত, তা বলা নিষ্প্রয়োজন। মোট কথা হচ্ছে হাতে-কলমে শিক্ষা না করলে, সাঁতার শেখা যায় না। শারীরিক শিক্ষার প্রতিটি ক্ষেত্রে এ-কথা সত্য। এর জন্য ছবি, চার্ট প্রভৃতিরও বিশেষ প্রয়োজন। মন্থর গতির পর্দাচিত্রও এ কাজে যথেষ্ট সাহায্য ক'রে আসছে। শৈত্য-ক্রীড়া অনুশীলনের নজির হিসাবে বিশ্ববিখ্যাত দৌড়বীরদের দৌড়ানোর ছবি, বর্শা-নিক্ষেপের চিত্রও যথেষ্ট কার্যকরী হয়েছে।

গতি-সঞ্চালক ক্রীড়া-কৌশলের উপর গুরুত্ব দিতে হবে ঃ

প্রত্যেক শারীরিক শিক্ষার একটা ধরন (form) এবং একটা শৈলী (technique)

আছে। সে-বিষয়ে শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে দিতে হবে এবং কৌশলগুলি দেখিয়ে দিতে হবে। যাতে প্রত্যেকটি শিক্ষার্থী সেই নির্দিষ্ট ধরনে এবং পদ্ধতিতে অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারে, তার সুযোগ দিতে হবে। ব্যক্তিগত স্বতন্ত্রতার জন্য প্রত্যেকটি 'ধরন' রকম-ফের হ'তে বাধ্য। কাজেই, প্রত্যেককে কোন নির্দিষ্ট ছকে ঢালাই করার চেষ্টা অবৈজ্ঞানিক হবে। অবশ্য, কতকগুলি ক্ষেত্রে প্রত্যেক কাজের মধ্যে একটা সমতা আছে, এমনকি সাধারণ গ্রহণযোগ্য 'দান'-ও আছে ; কাজেই, কিছু শেখানোর সময় শিক্ষকদের সে সম্পর্কে সচেতন হ'তে হবে। অনুশীলনের সময় এমনভাবে সমস্ত শিক্ষাধারাকে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে যে, প্রত্যেকের ব্যক্তিগত অনুরাগ যাতে প্রত্যেকটি সম্ভাবনাকে সমাপ্তির দিকে নিয়ে যায়। সর্বদা অবাঞ্ছিত প্রতিক্রিয়া কৌশলে পরিহার করতে হবে।

ড্রিলের প্রয়োজন ঃ

নিয়ন্ত্রিত অনুশীলনের দ্বারা কোন একটি প্রচেষ্টাকে অনায়াসলব্ধ অভ্যাসে রূপান্তরিত করার নামই হচ্ছে 'ড্রিল'। অনায়াসলব্ধ অভ্যাসের সমষ্টিকেই বলে দক্ষতা। অনেক অভ্যাসের সঙ্গে, যা শেখা হয়নি, এমন অনেক কিছু অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়। সেটাই শেখার সপক্ষে মস্তবড় একটা সুবিধা। সঠিক ও সুনির্দিষ্ট ড্রিলের মাধ্যমে অনেক বাড়তি অভ্যাস আপনা থেকেই অনুশীলনের মধ্যে এসে পড়ে। এই কারণে প্রত্যেকটি শিক্ষণ-ধারার মধ্যে পুনরাবৃত্তির একটা বিশেষ ভূমিকা আছে। ১৫ থেকে ২০ বছর বয়সের মধ্যে দেহ যখন সক্রিয় এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ভঙ্গী যখন সাবলীল থাকে, তখনই যে-কোন অনুশীলনের দ্বারাই বেশী উপকৃত হওয়া যায়। যত তাড়াতাড়ি পুনরাবৃত্তি চলে, ততই শিক্ষার্থীদের দক্ষতা অর্জনের সুবিধা হয়। শারীরিক শিক্ষার মূল অভ্যাসগুলি যতই অনায়াসলব্ধ হয়ে আসবে, ততই শিক্ষার্থীদের প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হবে। তখন আর কোন সমস্যা বাধার সৃষ্টি করতে পারবে না।

অনুশীলনের রূপান্তর (Transfer of training) ঃ

একটি অভ্যাস-লব্ধ প্রতিক্রিয়াকে অন্য একটি কাজে লাগানোর নাম হচ্ছে অনুশীলনের রূপান্তর। যেমন, একজন ভালো টেনিস খেলতে পারে। তার জন্য তাকে অনেকগুলি ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার সম্মুখীন হ'তে হয়েছে। ব্যাড্‌মিনটন্ বা রিং-টেনিস খেলা শেখার সময় সে অন্যের চেয়ে তাড়াতাড়ি ভালভাবে সে খেলা শিখতে পারে। অনুশীলনের রূপান্তরের জন্যই তা সম্ভবপর হয়। যে খেলার সঙ্গে অন্য খেলার সাদৃশ্য আছে, সেক্ষেত্রেই রূপান্তর কার্যকরী হ'তে পারে। কিন্তু টেনিস খেলার কোন অভ্যাসকে সাঁতার শেখার কাজে লাগানো কি সম্ভব ? এ ছাড়া, চারিত্রিক গুণাবলী

—যেমন, চরিত্র-গঠন, সংগঠন-শক্তি, সাহস ও নৈতিক বল—এ সমস্তই আসে শারীরিক শিক্ষার বিভিন্ন অনুশীলনের রূপান্তর থেকে। সমস্ত শিক্ষারই লক্ষ্য এমনতর নানা রূপান্তরের দিকে।

মনোভাবের পরিবর্তন ঃ

মানুষের সাধারণ ধারণা এবং মনোভাব জন্মায় বিভিন্ন ধরনের অভিজ্ঞতা থেকে। বিভিন্ন অবস্থার বিচিত্র প্রতিক্রিয়ার ফলাফল থেকেই হাবভাব ও সাধারণ জ্ঞান জন্মায়। একজনের মনোভাবের মধ্যে পরিলক্ষিত হয় সাধুতার ভাব। শ্রেণীর সমস্ত কাজে, ব্যক্তিগত ব্যবহারে তার ছাপ পরিস্ফুট হ'তে দেখা যায়। এই মনোভাবের পিছনে যে সাধারণীকরণের ক্ষমতা আছে, সবাই যাতে সেই শক্তি অর্জন করতে পারে, সেদিকে লক্ষ্য দেওয়া কর্তব্য। যেখানে বিরূপ মনোভাবের সৃষ্টি হয়েছে, যা ব্যক্তিগতভাবে ক্ষতিকর, তা উন্নতির অন্তরায়; তার আশু পরিবর্তন বাঞ্ছনীয়।

নির্দেশিত শৃঙ্খলার তত্ত্ব ঃ

অনুশীলনের রূপান্তরের পরিপন্থী কয়েকটি প্রাচীন তত্ত্ব আছে। পূর্বতন মনস্তাত্ত্বিকরা তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। সে তত্ত্বটি এককালে শিক্ষণ-রীতির উপর দীর্ঘকালস্থায়ী প্রভাব বিস্তার করেছিল। সেটা হচ্ছে নির্দেশিত শৃঙ্খলা-তত্ত্ব। সেই তত্ত্ব অনুসারে ধ'রে নেওয়া হ'ত মানুষের মন কল্পনা, বিবেচনা, ইচ্ছা, মনোযোগ এবং স্মৃতি প্রভৃতি উপাদানে গঠিত। এই সব গুণাবলী পরস্পর নির্ভরশীল নয় এবং পরিবেষ্টনীর প্রভাবের দ্বারা তা নিয়ন্ত্রিত হয়। মানুষের প্রত্যেক গুণাবলীই হচ্ছে এক-একটা 'ইউনিট্'; কাজেই, প্রত্যেকটির বিকাশ সামগ্রিকভাবে হওয়াই সম্ভব। উদাহরণস্বরূপ বলা চলে একজন যদি স্মৃতি-শক্তির অনুশীলন করে, তবে মনে রাখার সব ক্ষেত্রেই তা কার্যকরী হবে। অথবা, কেউ যদি কাল্পনিক ভূতের গল্প বলায় দক্ষতা অর্জন করতে পারে, তা হ'লে সেই কল্পনার প্রসারে সে আবিষ্কারের ক্ষেত্রে, অর্থনৈতিক পরিকল্পনায়, বল-বিদ্যার ক্ষেত্রে, এমনকি সাহিত্য-রচনায়ও তা কার্যকরী হবে। অর্থাৎ, শেখার সর্বক্ষেত্রেই এ তত্ত্ব সম-প্রযোজ্য।

যে-কোন গুণাবলী বিকাশের ক্ষেত্রে তার ধরন বা গঠনটাই প্রথম বিবেচ্য বিষয়। মনস্তাত্ত্বিকরা মনে করতেন, কোন জিনিসের সম্বন্ধে একটা ধারণা জন্মালে, তাকে গড়েপিটে অন্য আর একটা গড়নে আনা এমন কিছু নয়। তাঁরা আরও মনে করেন, একটা ধরন পাওয়া গেলে, তা থেকে অনেক কিছুই গড়ে নেওয়া সহজসাধ্য হবে। আজকের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে এই তত্ত্বটি একেবারে বাতিল হয়ে গেছে। কাজেই, এই নির্দেশিত তত্ত্ব সম্পর্কে একটা ধারণা থাকলে, ভুল তত্ত্বের দ্বারা প্রভাবিত বা পরিচালিত হওয়ার সম্ভাবনা কম।

খেলার তত্ত্ব :

এখন খেলার তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করা যাক। প্রাচীনত্বের দিক থেকে খেলাধূলা জীব-জগতের সমসাময়িক। জীবনের প্রথম সূত্রপাত থেকে শুরু হয়েছে খেলার মহড়া। তখন প্রকাশ-ভঙ্গী ছিল আদিম ও অকৃত্রিম। খেলা শুধু মনুষ্য-জীবন-কেন্দ্রিক নয়, প্রাণি-জগতের মধ্যেও খেলার রেওয়াজ দেখা যায়। এজন্য ক্রীড়ামোদীরা বলেন—প্রাণ-ধর্মই হচ্ছে খেলার মর্ম।

খেলা যেন শিশু-প্রবৃত্তির দর্পণ। সিনেমার পর্দায় আমরা যেমন সমাজ-জীবনের প্রতিচ্ছবি দেখতে পাই, খেলার আয়নায় তেমনই শিশু-মনের মুখ দেখা যায়। শিশু কি চায়, কি ভালবাসে, ভবিষ্যতে সে কি হবে, খেলার বিচিত্র ভঙ্গী থেকেই তার আভাস পাওয়া যায়। তাই অনেকে বলেন খেলাধূলার ছাঁচে লীলাময়ের অদৃশ্য হাতে ঢালাই হচ্ছে শিশুদের ভবিষ্যৎ জীবন। কাজেই, খেলাধূলাকে শিশু-জীবনের বহিরঙ্গের অনুষ্ঠান ব'লে মনে করলে চলবে না; কারণ, খেলার কাজ ভিতরে-বাইরে, শিশুর দেহে-মনে। শিশুর আত্মিক ও দৈহিক বিকাশের সঙ্গে স্বেচ্ছা-প্রণোদিত খেলার নিবিড় যোগ আছে। এ-কথা প্রাণি-তত্ত্ববিদ্‌রাও স্বীকার করেছেন। খেলার মধ্য দিয়ে শিশু-মনের পুঞ্জীভূত অনুভূতি, আবেগ, আনন্দ-হাসি, কল্পনা-অনুরাগ প্রকাশের পথ খুঁজে পায়, কর্মকুশল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছন্দময় নৈপুণ্য লাভ করে।

খেলাকে অনেকে আবার জীবনের পটভূমিকায় এনে ফেলেছেন। জীবন থেকে তাকে অভিন্ন ক'রে দেখেই বলেছেন—**খেলাই জীবন**। শিশু যে বেড়ে উঠছে, তার জীবনে একটার পর একটা পরিবর্তন আসছে—তা শিশুর খেলার সামগ্রী নির্বাচনের মধ্য দিয়েই প্রকাশ পায়। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে শিশুদের খেলার সামগ্রী বদলায়। জল, বাতাস, খাদ্য, আলো যেমন জীবনধারণের অপরিহার্য অঙ্গ, শিশুর দৈহিক বৃদ্ধির জন্যও তেমনি খেলাধূলার বিশেষ প্রয়োজন। খেলাকে বাদ দিলে শিশুর স্বাভাবিক জীবনের গতি ব্যাহত হয়। পরীক্ষা ক'রে দেখা গিয়েছে, খেলার জগতে যে শিশু কোনদিন প্রবেশ করেনি, তার জীবনে অনেক অপূর্ণতা দেখা দিয়েছে। সে শিশু ভবিষ্যৎ জীবনে অসামাজিক ও আত্মকেন্দ্রিক অমানুষ হয়ে উঠেছে।

এই জীবন ও খেলার সম্পর্ক নিয়ে অনেক মনীষী মাথা ঘামিয়েছেন। সেই খেলার তত্ত্ব এবং তার মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন। সব বয়সের খেলা এক নয়। তার উদ্দেশ্য আলাদা, প্রয়োজন ও আয়োজন পৃথক। তাই অনেকে বলেছেন যে, কোন একটি উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হয়েই শিশুরা খেলা করে; অর্থাৎ, একটা play motive হচ্ছে সমস্ত খেলার প্রেরণা।

জার্মান কবি শীলার খেলার সঙ্গে জীবনের যোগ কোথায়, তা নির্ণয় করতে গিয়ে

বলেছেন একটা অপ্রয়োজনের আনন্দের উৎস থেকেই সৃষ্টি হয়েছে খেলাধূলা। প্রাণ-শক্তি যখন কানায় কানায় ভরে উঠে, কাজের জন্য যখন সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ উন্মুখ —সেই অস্থিরতার বহিঃপ্রকাশ আমরা দেখতে পাই খেলাধূলার মধ্যে। একে তিনি **উদ্‌বৃত্ত-শক্তি** বা **সার্‌প্লাস্‌ এনার্জির তত্ত্ব** বলেছেন। তিনি আরও বলেছেন এর মধ্যে জীবন-সম্পর্কিত কোন আদর্শ বা উদ্দেশ্য নেই। দৈনন্দিন জীবনে একটানা কাজের মধ্যে প্রাণ যখন হাঁপিয়ে উঠে, তখন ভিতর থেকে চিত্ত-বিনোদনের তাগিদ আসে। এই প্রেরণার মধ্যেই প্রচ্ছন্ন আছে খেলার অভিপ্রায়। তাই খেলাকে তিনি উদ্‌বৃত্ত-শক্তি-ব্যয়ের পন্থা (the aimless expenditure of an exuberant energy) ব'লে অভিহিত করেছেন। জার্মান শারীরিক শিক্ষার জনক গুড্‌স্‌ম্যুথ-ও এই মতবাদকে বিশেষভাবে সমর্থন করেছিলেন।

বিনোদন-নীতিবাদীরা কিন্তু অন্য কথা বলেছেন। অপ্রয়োজনের আনন্দের জন্যই যে খেলাধূলা, এ-কথাটা তাঁরা মেনে নিতে পারেননি। তাঁরা বলেছেন দেহ-মনে যখন একটা অবসাদ বোঝার মতো চেপে বসে, সেই জড়তার আলস্য থেকে দেহ, মন, এমনকি সমস্ত ইন্দ্রিয় মুক্তি চায়, তখন সে আনন্দের পথ বেছে নেয়। খেলার মধ্যে এক নির্দোষ আনন্দ আছে। ইহা সমস্ত ক্লান্তির গ্লানি মুছে দিয়ে মনকে নূতন উৎসাহে সঞ্জীবিত ক'রে তুলতে পারে। দুঃখের সংসারে আনন্দের সঞ্জীবনী যদি কিছু থাকে, তা হচ্ছে খেলার স্ফূর্তি। শহরের রুদ্ধ আত্মার শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য যেমন কৃত্রিম পার্কের প্রয়োজন, তেমনি দরকার কর্মব্যস্ত মানুষের চিত্ত-বিনোদনের জন্য খেলাধূলা। ইংরেজ দার্শনিক লর্ড ক্যামুস্ট তাই বলেছেন—Play is necessary for man in order to refresh himself after labour. শ্রমের ক্লান্তি থেকে খেলাধূলা দেহ-মনকে মুক্তি দেয়। অনেক শিক্ষাবিদ্‌ কিন্তু এ-কথা মানতে চান না। তাঁরা বলেন শ্রমক্লান্ত দেহে খেলাধূলার পরিশ্রম বিষবৎ কাজ করে। ধারণাটা কিন্তু ঠিক নয়।

কর্মনীতিবাদীরা কিন্তু খেলাধূলার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছেন। তাঁরা বলেছেন হাতে-কলমে কাজ করার সার্থকতা যথেষ্ট। প্রতিদিনের অভ্যাস, প্রতি মুহূর্তের শ্রম—মানুষকে ভবিষ্যৎ জীবনের উপযুক্ত ক'রে তোলে। অভিজ্ঞতার ধূলায় কোন কিছুই হারিয়ে যায় না। রবীন্দ্রনাথও ঠিক সেই কথার প্রতিধ্বনি করেছেন। তিনি বলেছেন "জীবনের ধন কিছুই যাবে না ফেলা, ধূলায় তাদের যত হোক অবহেলা; পূর্ণের পদ-পরশ তার পরে।" প্রাণি-তত্ত্ববিদ্‌ ক্যারল গ্রোস্‌ **অনুশীলন-নীতি** (Practice theory)-র পক্ষপাতী। তিনি বলেছেন প্রত্যেক অনুশীলনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে বয়সের তারুণ্য এবং তরুণ মনের প্রেরণা।

তাই তিনি বলেছেন, আমরা তরুণ ব'লেই খেলা করি না আমরা তারুণ্যের তাগিদে, তারই উন্মাদনায় খেলা করি।

এই খেলাধূলার মধ্যে স্টার্নলি হল একটা ধারাবাহিকতা অর্থাৎ জীবন-বিবর্তনের রূপ দেখতে পেয়েছেন। খেলাধূলার মধ্যে বংশগত যে অভিপ্রায় আছে, তিনি তাকে বলেছেন **খেলার ক্রম-বিবর্তন**। অপ্রয়োজনের তাগিদে মানুষ কখনও খেলার জন্য অনুপ্রেরণা পায় না। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষ খেলাধূলার বিভিন্ন স্তর অতিক্রম ক'রে এগিয়ে চলে। এমনি ক'রে খেলার মাধ্যমে মানুষের সমগ্র জীবনের পুনরাবৃত্তি চলে। একে তিনি **জীবন-সংস্কৃতির সময়** (Culture epoch of life) ব'লে অভিহিত করেছেন। মানুষ জীবনের বহু স্তর অতিক্রম ক'রে প্রাপ্তবয়সে কর্ম-জীবনে প্রবেশ করে। তেমনি খেলার মাধ্যমে—অনুকরণে, আচরণে, অঙ্গ-ভঙ্গীতে—শিশুরা সমগ্র মানব-জীবনের সেই বিচিত্র ধারার পুনরাবৃত্তি করে।

য়্যাথিলটন্-ও বলেছেন খেলা হচ্ছে জীবনমুখী। জীবনের সঙ্গে খেলার সম্পর্কও অবিচ্ছেদ্য। শুধু তাই নয়, খেলাধূলাই জীব-দেহের প্রয়োজন মেটায়। তাই তিনি বলেছিলেন খেলাধূলার প্রকৃতি এমনই স্বাভাবিক যে, তা ক্রম-বর্ধমান দেহ-মনের প্রয়োজন মেটায়। অন্য কথায়, একে বলা চলে বৃদ্ধির ক্ষুধা, বিকাশের তাগিদ।*

জোলাপী-তত্ত্ববাদীরা বলেছেন খেলাধূলাটা যেন শিশুর দেহ-মনের জোলাপ। জোলাপ যেমন অন্ত্রের গ্লানি দূর করে, খেলাও তেমনি অবসাদ ও বিক্ষুব্ধ প্রক্ষোভ থেকে দেহ-মনকে মুক্তি দেয়। খেলাটা যেন নিরুদ্ধ-আবেগ মুক্তির **সেফ্‌টি ভাল্‌ভ** (Play is a safety valve for pent-up-emotions)। এই ভাল্‌ভের মাধ্যমে শিশু-মনের বিচিত্র অভিপ্রায় খেলার মধ্য দিয়ে রূপ পায়। শিশু-প্রক্ষোভ সর্বদা প্রকাশের পথ খোঁজে। কখনই তার অবদমন সম্ভব নয়, তাকে অন্য পথে চালিত করতে হয়। সেই পথান্তরে যাওয়ার পথই হচ্ছে খেলা।

এখন তত্ত্ব-মীমাংসায় আসা যাক। খেলা ও জীবন সম্পর্কে যে সমস্ত মতবাদ গড়ে উঠেছে, তার কোনটাই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। **সারপ্লাস্** বা **উদ্বৃত্ত-নীতি** খেলার সম্পর্কে আর যা ব্যাখ্যা দিক না কেন, ক্রীড়ামোদীদের ব্যক্তিগত জীবনের ভালো-মন্দ লাগার কোন কথাই সেখানে নেই। কেন যে একটি বিশেষ খেলার প্রতি কোন একজনের বিশেষ অনুরাগ দেখা যায়, সে প্রশ্নের কোন উত্তর নেই

*"Play activity is of such a natural type that it would satisfy the need of growing body or in other word, it is the hunger for growth."

সেখানে। বিনোদন-নীতিবাদীরা অবশ্য বয়স্কদের খেলা-প্রীতির বিষয়ে সন্তোষজনক কথা বলেছেন। কিন্তু শিশুদের ক্রীড়া-মাদকতার কোন কারণ নির্ণয় করতে পারেননি। কারণ, লাভালাভের উদ্দেশ্যেই যে শিশু খেলাধূলা করে, এমন নয়। তা ছাড়া, কেন সকলে একই খেলা ভালবাসে না, কেন অতিশয় ক্লান্ত হয়েও শিশুরা খেলা থেকে নিবৃত্ত হ'তে চায় না, তার কোন কথাই সেখানে আলোচনা করা হয়নি।

ব্যবহারিক তত্ত্ব-নীতি (Practice theory) সে কথার একটা সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিয়েছে। সেখানে আবার **খেলার বাসনার** (Play desire) কথা বাদ পড়েছে; কারণ, বয়স্করা কিছু না জেনে কখনও খেলায় যোগদান করে না। অথবা, আমরা কেন খেলাধূলায় আত্ম-নিয়োগ করি, সে প্রশ্নেরও কোন আলোচনা নেই।

পুনরাবৃত্তি-তত্ত্ববাদীরা যদিও বলেছেন আদি ক্রিয়া-কলাপের প্রতি শিশুদের একটা সহজাত আগ্রহ আছে; কিন্তু সেই খেলার বিবর্তন-ধারায় কেন সব মানুষই একই পথে অগ্রসর হয় না, তার কোন ব্যাখ্যা নেই। কাজেই, ঐ ব্যাখ্যাকেও সঠিক বলা চলে না।

এ ছাড়া, খেলাধূলা সম্পর্কে আরও যে দুটি মতবাদ আছে, কোন তত্ত্বেই সে কথার কোন আলোচনা নেই। সেটা খেলার দুটি ব্যবহারিক দিক। এক হচ্ছে—**জীবন-প্রস্তুতির কথা,** দ্বিতীয় হচ্ছে—**জীবনকে জানা** বা **জীবনের উপলব্ধি**। খেলার মধ্যে আছে জীবন-যাপনের উপায় অথবা জীবন-প্রস্তুতির পন্থা, আর আছে জীবনকে জানার সুযোগ। এ দুটি অনুপ্রেরণার সুযোগ মেলে খেলার মধ্যে। প্রাচীন কালে যখন মননশীলতার উপর জোর দেওয়া হ'ত, তখন অবশ্য খেলার সার্থকতা সম্বন্ধে কোন মানুষ কিছুই উপলব্ধি করেনি। বর্তমান যুগে স্বীকৃত হয়েছে জীবনের সঙ্গে যখন খেলার অচ্ছেদ্য সম্পর্ক, তখন খেলা যে **জীবনের পরিপূরক**, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সেদিক থেকে বিচার করলে ডিউয়ি'র মতবাদকে খেলার সর্বাত্মক ব্যাখ্যা ব'লে গ্রহণ করা যায়। তাঁর সেই দুটি তত্ত্ব—means of living or preparation for life অথবা understanding life-এর কথা সমস্ত খেলার মধ্যেই সমভাবে বর্তমান। সেদিক থেকে খেলার এই তত্ত্ব-ব্যাখ্যাকে সন্তোষজনক বলা চলে।

খেলার মাধ্যমে কি কি সদভ্যাস গঠিত হয়, এখন তা আলোচনা করা যাক। ক্রীড়ানুশীলনের মাধ্যমে মোটামুটি চার প্রকার সদভ্যাস বা সু-আচরণ গঠিত হয়। যথা—(১) **শারীরিক**, (২) **মানসিক**, (৩) **অর্থনৈতিক** ও (৪) **সামাজিক**।

খেলাধূলার মাধ্যমে যে সদভ্যাস গড়ে, নিম্নে তার তালিকা দেওয়া গেল :

(১) শারীরিক সু-অভ্যাসের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে **নিয়মানুবর্তিতা, শৃঙ্খলা, দৈহিক যোগ্যতা** (physical fitness), **ভারসাম্য রক্ষা** (body balance), **চট্‌পটে ভাব** (smartnes), **সহনশীলতা** প্রভৃতি।

(২) মানসিক গুণাবলীর অন্তর্গত হচ্ছে **আত্ম-প্রত্যয়, চারিত্রিক দৃঢ়তা, অধ্যবসায়, সংঘবদ্ধ হয়ে কাজ করার শক্তি, একতা, দল-প্রীতি, বিচার-শক্তি, সহযোগিতা, সাধুতা, সাহস ও কার্য-কুশলতা।**

(৩) অর্থনৈতিক সুবিধা হচ্ছে—ঔষধের ব্যয়ভার থেকে মুক্তি। খেলাধূলায় পরিপুষ্ট সুস্থ দেহ যতই সাধারণ ব্যাধি থেকে অব্যাহতি পায়, ততই নিত্য ঔষধের খরচ কমতে থাকে। তাই একজন স্বাস্থ্যবিদ্ বলেছেন ছেলেমেয়েদের সুস্থ নীরোগ দেহ করার পরোক্ষ উদ্দেশ্য হচ্ছে, অর্থনৈতিক সুব্যবস্থা করা। শুধু তাই নয়, এই স্বাস্থ্য ও শক্তির গুণে তারা ভালো শিশু হবে, দক্ষ কর্মী হবে এবং ভবিষ্যতে তারাই হবে উপযুক্ত পিতামাতা ও সু-নাগরিক। এ ছাড়া, ডাক্তার, ঔষধ বাবদ খরচ যতই কমবে, ততই নীরোগ সুস্থ কর্মীদের অর্থ উপার্জনের পথ সুগম হবে।*

(৪) সামাজিক গুণাবলীর অন্তর্গত হচ্ছে **সংঘ-চেতন** (team-spirit)। পরস্পরের সঙ্গে সংঘবদ্ধ হয়ে যে খেলা, তার মাধ্যমে আসে সহানুভূতি ও সহযোগিতার ভাব, মিলিতভাবে কাজ করার অভ্যাস, দলের প্রতি আনুগত্য, পারস্পরিক বন্ধুত্ব, পরিমার্জিত খেলোয়াড়ী মনোভাব (good sportsmanship) প্রভৃতি। এক কথায়, খেলার লক্ষ্য হবে নিছক খেলা। তার মধ্যে থাকবে সদুপায়ে বিজয়ের ইচ্ছা, জয়-পরাজয়ে সংযত শিষ্ট আচরণ করা, আর সঙ্কীর্ণতা বা নীচতা থেকে মুক্ত থাকার মতো উদার দৃষ্টিভঙ্গী।

শারীরিক শিক্ষার পাঠ-পরিকল্পনা

শারীরিক শিক্ষার পাঠ-পরিকল্পনা রচনার সময় নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে। যথা—

(১) পাঠগুলিকে (বুনিয়াদী বিদ্যালয় ধ'রে) পাঁচ ভাগে ভাগ করতে হবে

* It is certainly good economy to make a boy and girl healthy and strong. It makes them good children, good workers, good parents and citizens. This means less expense on medicine, doctor's fee, more earning because of their sound health and skilful handing of working materials etc.

—যেমন, প্রথম শ্রেণী (৬ থেকে ৭ বছর পর্যন্ত); দ্বিতীয় শ্রেণী (৭ থেকে ৮ বছর পর্যন্ত); তৃতীয় শ্রেণী (৮ থেকে ৯ বছর পর্যন্ত); চতুর্থ শ্রেণী (৯ থেকে ১০ বছর পর্যন্ত); পঞ্চম শ্রেণী (১০ থেকে ১১ বছর পর্যন্ত)। (২) পাঠের দৈর্ঘ্য শ্রেণী হিসাবে ২০—৩০ মিনিট হ'তে পারে। কমপক্ষে সপ্তাহে চারবার ব্যায়ামের শ্রেণী হওয়া উচিত। (৩) ব্যায়াম-পাঠের মধ্যে খেলার ভাবটা যতদূর সম্ভব বজায় রাখার চেষ্টা করতে হবে। সমস্ত ব্যায়াম আনন্দপ্রদ এবং শিক্ষাদান-পদ্ধতিও আনন্দদায়ক হওয়া উচিত।

পাঠদান-পদ্ধতি ঃ

(ক) স্বাভাবিক কথোপকথনের ভাষায় শিক্ষাদান করতে হবে। (খ) দ্বিতীয় পর্যায়ে থাকবে ব্যায়াম-প্রদর্শন—শুধু বর্ণনা দিলে চলবে না, ব্যায়ামটি কেমন হবে তা দেখিয়ে দিতে হবে। (গ) শিক্ষক মহাশয় ছাত্রদের সঙ্গে ব্যায়াম ও খেলায় যোগদান ক'রে ছাত্রদের উৎসাহ ও আনন্দ বর্ধন করবেন। (ঘ) পুনরাবৃত্তি দ্বারা শিক্ষক মহাশয় ব্যায়াম ও খেলা ছেলেদের রপ্ত করিয়ে দেবেন। (ঙ) ব্যায়াম অনুসারে, শিক্ষক মহাশয় ছাত্রদের থেকে ২০—২৫ হাত দূরে এমন জায়গায় দাঁড়াবেন, যেখান থেকে সহজেই প্রত্যেকটি ছাত্রকে ভালভাবে দেখা যায়। ছাত্রদের কখনই সূর্যের দিকে মুখ করিয়ে দাঁড় করানো উচিত নয়। (চ) খেলাগুলি সরল, সহজ এবং সরস হওয়া উচিত। (ছ) শ্রেণীকে আয়ত্তের মধ্যে আনার জন্য মাঝে মাঝে শাসনের প্রয়োজন। বাঁশী ও কণ্ঠ নির্দেশের দ্বারা এই শাসনকার্য চলতে পারে। (জ) শ্রেণীর ছুটি—যে অবস্থায় পাঠ আরম্ভ হয়েছিল, সেই অবস্থায় ছাত্রদের আনার পর শ্রেণী-বিদায়ের নির্দেশ দিতে হবে। শ্রেণীর শেষে শিক্ষক মহাশয়কে নমস্কার ক'রে বিদায় নিতে হবে।

পাঠের নমুনা ঃ

পাঁচটি শ্রেণীর উপযোগী পাঁচটি পাঠের নমুনা দেওয়া গেল :—

১নং পাঠ ঃ

(১) পরস্পর হাত ধ'রে এক লাইনে দাঁড়াও। (২) সাইকেলে ঘুরে বেড়াও। (৩) বাঘের মতো হাঁট। (৪) গাছের ডালের মতো হাত দোলাও। (৫) কে সকলের আগে মাটি ছেড়ে উপরে উঠতে পারে। (৬) কাক, হাঁস, হাতী ও ঘোড়ার মতো চল।

২নং পাঠ ঃ

(১) একটি বৃত্ত গঠন কর। (২) ছোট ঝোপ ও লম্বা গাছ হও। (৩) লাফ দিয়ে জেগে ওঠ। (৪) বাবার মতো বড় হও। (৫) শিক্ষককে ধর। (৬) পাখীর বাসা বদল কর।

৩নং পাঠ ঃ

(১) কাঁধে কাঁধে হাত দিয়ে ফাইল কর। (২) পুরানো বল ও নূতন বলের মতো লাফাও। (৩) বিড়ালের মতো হাঁট। (৪) ফুলের মতো ফুটে ওঠ। (৫) আগুন নেভাও। (৬) লাফানো পুতুলের মতো লাফিয়ে চল।

৪নং পাঠ ঃ

(১) হাত ধরাধরি ক'রে লাইন কর। (২) মইয়ের উপর ওঠ। (৩) বুড়ো মানুষের মতো চল। (৪) পাখীর মতো ডানা ঝট্পট্ কর। (৫) এরোপ্লেনের মতো উড়। (৬) সাপের মতো এঁকে-বেঁকে চল।

৫নং পাঠ ঃ

(১) পাশে হাত উঠিয়ে দু'ফাইলে দাঁড়াও। (২) সাইকেল চালাও। (৩) গাছ হও। (৪) রেলগাড়ি চালাও। (৫) দৈত্য ও বামন হও। (৬) বসে বসে দাঁড় টান।

২নং পাঠের বিবরণ ঃ

পাঠের নির্দেশগুলি কিভাবে পালন করবে, এখানে তার বর্ণনা দেওয়া যাচ্ছে। এ থেকে যে ধারণা জন্মাবে, সেই অভিজ্ঞতা দ্বারা অন্যান্য ব্যায়াম-প্রণালীর কিছুটা আভাস পাওয়া যাবে।

১। ছেলেরা পাশাপাশি হাত ধরাধরি ক'রে বৃত্ত রচনা করবে। এই অংশের উদ্দেশ্য দ্রুত অথচ শান্তভাবে বৃত্ত গঠন করতে শেখানো।

২। (ক) "ছোট ঝোপ"—এই নির্দেশ পেলেই ছাত্ররা বসে প'ড়ে যতদূর সম্ভব ছোট হয়ে সামনের দিকে গুড়ি মেরে থাকবে। (খ) "লম্বা গাছ"—এই আদেশ পেলেই ছাত্ররা তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াবে এবং বুড়ো আঙুলের ওপর ভর দিয়ে দু'পাশে হাত উঠিয়ে দাঁড়াবে। এই খেলাটি হবে খুব দ্রুত তালে। বসা ও দাঁড়ানো পূর্ব-বর্ণিত ভঙ্গিমায়।

৩। (ক) শুয়ে ঘুমানোর ভঙ্গীতে চোখ বুজে থাকতে হবে। (খ) তারপর ধীরে ধীরে চোখ মেলে উঠে বসতে হবে। (গ) পুনরায় শুয়ে প'ড়ে, ঘুমানোর ভান করতে হবে।

৪। (ক) হাত দুখানি খুব দ্রুত উপরে উঠাও (আঙুলের ডগাগুলি যতদূর সম্ভব উপরে উঠবে)। (খ) পুনরায় পূর্বাবস্থায় হাত রাখ।

৫। শিক্ষক যেখানেই যাবেন, তাঁর পিছু পিছু ছেলেরা ছুটবে এবং তাঁকে ধরতে চেষ্টা করতে হবে।

৬। পাখীর বাসা বদল' একটি খেলা। প্রত্যেক ব্যায়ামের শেষে একটি ক'রে খেলা দিতে হয়। এই খেলাটির জন্য শ্রেণীর ছাত্রদের চার ভাগে ভাগ ক'রে নিতে হবে। মাঠের চারধারে একাধিক বৃত্ত আঁকা থাকবে। এগুলিই হবে

পাখীর বাসা। চারটি দলের নাম যথাক্রমে কাক, কোকিল, ময়না এবং টিয়া দিতে হবে। শিক্ষক মহাশয় যখন যে দুটি পাখীর নাম ধরে বলবেন, 'কাক' ও 'কোকিল' বাসা বদল কর, তখন ঐ দুটি দল পরস্পরের স্থান বদল করবে। এই ভাবে খেলাটি চলবে।

পাঠ-টীকা :

এখন জানা দরকার শ্রেণী-পরিচালনার জন্য কিভাবে পাঠ-টীকা রচনা করতে হবে। নিম্নলিখিত বিষয়গুলি পাঠ-টীকার অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। যথা—

(১) **প্রস্তুতি**—কোন্ ব্যায়াম কিভাবে করতে হবে, তার জন্য প্রস্তুত হ'তে হবে। (২) **উপকরণ**—যে যে খেলা বা ব্যায়াম দেওয়া হবে, তার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ করতে হবে। (৩) **উপস্থাপন**—কেমন ক'রে ব্যায়ামটিকে ছেলেদের সামনে উপস্থাপিত করতে হবে, তার উপায় উদ্ভাবন করতে হবে। (৪) **বিষয়-বস্তু**—কোন্ কোন্ অঙ্গের জন্য কি কি ব্যায়াম দিতে হবে। (৫) **ব্যাখ্যা**—ব্যায়ামের বর্ণনা ও ব্যাখ্যা দিতে হবে। (৬) **ব্যায়ামের মহড়া**—কেমন ক'রে ইহা করতে হবে তা দেখিয়ে দিতে হবে। (৭) **আদেশ**—ইহা তিনটি ভাগে বিভক্ত ; যথা—বর্ণনা—বিরতি—সঙ্কেত। (৮) **অনুশীলন**—পুনরাবৃত্তি দ্বারা ছাত্ররা যাতে ব্যায়ামগুলি রপ্ত করতে পারে, সেজন্য অনুশীলনের বিশেষ প্রয়োজন। (৯) **উদ্দেশ্য**—শিশুর দৈহিক ও মানসিক বিকাশ-সাধন, কর্মতৎপরতা লাভ, শক্তি ও সামর্থ্য অর্জন প্রভৃতি। (১০) **আত্ম-বিশ্লেষণ**—এটি হচ্ছে পাঠ-টীকার শেষ পর্যায়।

এখানে বিচার-বিবেচনা ক'রে দেখতে হয়, পাঠ-পরিকল্পনার উদ্দেশ্য কতখানি সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে। যদি পাঠদান ও ফলাফল আশানুরূপ না হয়ে থাকে, তবে বিশ্লেষণ ক'রে দেখতে হবে কেন এবং কি কি কারণে তা সম্ভবপর হয়নি, ইত্যাদি।

ক্রীড়া-কেন্দ্র সংগঠন :

ক্রীড়া-কেন্দ্র গঠনের জন্য একটি সুপরিকল্পিত পরিকল্পনার প্রয়োজন। বিশেষ ক'রে শিশু ক্রীড়া-কেন্দ্র সংগঠনের জন্য। আমাদের দেশে সত্যিকার শিশু ক্রীড়া-কেন্দ্রের একান্ত অভাব। বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানের অধীনে যে সমস্ত শিশু ক্রীড়া-কেন্দ্র আছে, সেগুলি শিক্ষণ-প্রাপ্ত কোন শিক্ষকের দ্বারা পরিচালিত হয় না। কলিকাতা কর্পোরেশনের অধীনে যে সমস্ত শিশু ক্রীড়া-কেন্দ্র আছে, সেগুলিতে কতকগুলি সরঞ্জাম ছাড়া আর কিছু নেই। কোন কোন অঞ্চলে হয়তো কর্পোরেশনের নিযুক্ত দু'একজন শিক্ষক আছেন, তাঁরা কালেভদ্রে এসে ক্রীড়া-কেন্দ্রগুলি

দেখা-শোনা করেন। এভাবে কিন্তু শিশু ক্রীড়া-কেন্দ্রের সংগঠক হ'তে পারে না। তার জন্য বিশেষ শিক্ষা-প্রাপ্ত বিশেষজ্ঞ শিক্ষকের প্রয়োজন।

পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে শিশু ক্রীড়া-কেন্দ্র নেই বললেই চলে। অথচ, গ্রামের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের খেলাধূলারও কোন ব্যবস্থা নেই। কাজেই, গ্রামে গ্রামে শিশু ক্রীড়া-কেন্দ্রের একান্ত প্রয়োজন।

প্রত্যেকটি ক্রীড়া-কেন্দ্রে থাকবে এমন সব খেলার উপকরণ এবং ব্যবস্থা, যাতে ঘরে-বাইরে বসে, মাঠে-ময়দানে ছুটে,—সব ঋতুতেই ছেলেমেয়েরা কিছু-না-কিছু খেলাধূলা করতে পারে। মাঠটি দূর্বা ঘাসের তৈরী, ভেল্‌ভেটের মতো কোমল ও সবুজ হওয়া উচিত। ক্রীড়া-কেন্দ্র-ভবনে থাকবে **শিশু পাঠাগার, পড়ার ঘর, অভিনয় মঞ্চ, রেডিও, প্রদর্শনী গৃহ, শিশু চলচ্চিত্র দেখানোর ব্যবস্থা, বিশ্রামাগার, প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা, স্বাস্থ্যকেন্দ্র** প্রভৃতি।

এ ছাড়া থাকবে **সাঁতার কাটার পুকুর, সুদৃশ্য ফল-ফুলের বাগান, কৃষিভূমি, 'প্রকৃতি-কোণ', স্নানাগার, পায়খানা** ইত্যাদি। খেলার স্থায়ী সরঞ্জাম মাঠের এক কোণে এমনভাবে স্থাপন করতে হবে, যাতে কোন কারণে মাঠে কোনরূপ স্থানাভাব না হয়।

ক্রীড়া-কেন্দ্রের সুষ্ঠু তত্ত্বাবধানের জন্য একটি পরিচালকমণ্ডলী থাকা চাই। তাঁদের ব্যবস্থাপনাকে কার্যকরী করার জন্য থাকবেন একজন বিশেষ শিক্ষণ-প্রাপ্ত শিক্ষক, একজন ধাত্রী, একজন শিশু-চিকিৎসক, মালী, পাহারাদার প্রভৃতি।

আর থাকবে নিম্নলিখিত খেলার স্থাবর সরঞ্জাম এবং নানাবিধ অস্থাবর উপকরণ। যথা—(১) সী-শ, (২) দোলনা, (৩) নাগর-দোলা, (৪) মেরিগো-রাউণ্ড, (৫) জংলা বার, (৬) নীচু বার, (৭) সুড়ুঙ্গ, মই, ভারসাম্য রক্ষার সরঞ্জাম প্রভৃতি।

অস্থাবর উপকরণের মধ্যে থাকবে—(১) বীনব্যাগ ৮টি (আকার ৬″×৮″) (২) ছোট রবারের বল—১০টি, (৩) আট হাত লম্বা দড়ি—২টি, (৪) স্কিপ করবার দড়ি—১৬টি, (৫) কাঠ বা বাঁশের ব্যাট্—৮টি, (৬) লোহা বা বাঁশের চাকা—৪টি, (৭) বাঁশের ছোট মুগুর—৪টি, (৮) ভারী বল—৪টি, (৯) ফুটবল ৪নং—৪টি, (১০) লাঠি তিন হাত লম্বা—৪টি, (১১) ওজন-যন্ত্র ও লাফানোর দণ্ড, (১২) মাদুর দুহাত—৪০টি, (১৩) পিংপং ব্যাট্—৬টি, লুডো, ক্যারাম বোর্ড—২টি ক'রে ৪টি, (১৪) বড়-ছোট ৪টি ড্রাম, একটি বিউগিল, ফ্লুট বাঁশী এবং (১৫) গান-বাজনার সরঞ্জাম প্রভৃতি।

শৃঙ্খলার প্রয়োগ-পদ্ধতি :

শিশুরা সাধারণতঃ বাঁধা-ধরা নিয়মের মধ্যে ধরা দিতে চায় না। তাদের অবাধ স্বাধীন মন আছে, সেই মন যেন কিছুতেই নিয়ম-কানুনের গণ্ডি মানতে চায় না। কিন্তু মজার ব্যাপার এই যে কাজে শিশুরা আনন্দ পায়, যে আলোচনায় তারা তন্ময় হয়ে যায়, সেখানে শ্রেণী-শৃঙ্খলার জন্য কোন ভাবনাই ভাবতে হয় না।

উপযুক্ত কাজের অভাব থেকেই শিশুদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। শিশুদের মধ্যে নিয়ম-নিষ্ঠা ও সময়-বোধের চেতনা জাগিয়ে তোলার জন্য শৃঙ্খলার বিশেষ প্রয়োজন। শৃঙ্খলা-বোধ শিশুদের ভবিষ্যৎ জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে। জোর ক'রে শিশুদের মনে শৃঙ্খলা-বোধ জাগিয়ে তোলা যায় না। প্রসঙ্গক্রমে শিশুদের মনে যে সময়-নিষ্ঠার ধারণা জন্মে, আপনা থেকেই শিশুরা যে নিয়ম-নিষ্ঠা চায়, সেই শৃঙ্খলা-বোধই শিশুর জীবনকে সুনিয়ন্ত্রিত করে।

কাজেই, শিশু-শিক্ষার ক্ষেত্রে শৃঙ্খলার প্রয়োগ-পদ্ধতি হ'বে সম্পূর্ণ পৃথক ধরনের। বয়স্কদের কাছে সেটা বিশৃঙ্খলার নামান্তর ব'লেই মনে হবে। কাজেই শিশু-শ্রেণীর শৃঙ্খলা কি ভাবে বজায় রাখা যায়, সে সম্পর্কে শিক্ষাবিদ্‌রা নিম্নলিখিত পদ্ধতির নির্দেশ দিয়েছেন :—

(১) শিশুদের সামান্য অসদাচরণকে উপেক্ষা করতে হবে। (২) শিশুদের মৌখিক শাসন করতে হবে। (৩) কোন ক্ষেত্রে কোনও দৈহিক সাজা না দেওয়াই ভালো। (৪) ছেলেদের অকারণে সাজা না দিয়ে শাস্তির ভয় দেখাতে হবে। (৫) পরিহাসছলে ছাত্রদের দোষ-ত্রুটির সংশোধন করতে হবে। (৬) শাস্তিস্বরূপ শিশু-বিশেষকে কোন অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে হবে। (৭) শ্রেণীর নানা কাজ থেকে দুষ্ট ছেলেদের বাদ দিতে হবে। (৮) অসঙ্গত বা উদ্ধত ব্যবহারের জন্য শিশু-বিশেষকে সমস্ত শ্রেণীর সামনে ক্ষমা চাওয়াতে হবে। (৯) শিশুদের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য দৃঢ়তার সঙ্গে নির্দেশ জারি করতে হবে। (১০) ভালো কাজের জন্য পুরস্কার ঘোষণা করতে হবে। (১১) শিশুদের স্বভাবসুলভ আগ্রহকে জাগিয়ে তুলতে হবে।

এই শৃঙ্খলা-পদ্ধতি শিশু-বিদ্যালয়ে অনুসৃত হ'লে, শিশু-বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলার জন্য কোন পরিদর্শকেরই প্রয়োজন হবে না। সেটাই হ'বে শিশু-ছাত্র-সমাজের পক্ষে এক কল্যাণকর অকৃত্রিম শৃঙ্খলা।
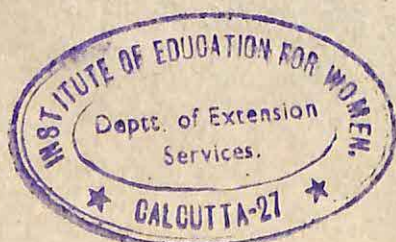
বাংলা ভাষায় লেখা শারীরিক শিক্ষার এই প্রথম এবং প্রামাণিক গ্রন্থ। পুস্তকখানি স্বয়ংসম্পূর্ণ।

এমন ব্যাপকতর দৃষ্টিভঙ্গীর পরিপ্রেক্ষিতে এরূপ বিস্তৃততর সামগ্রিক আলোচনা ইতিপূর্বে হয়নি। সৃষ্টির দিক থেকে গ্রন্থটি সত্যই অভিনব।

গ্রন্থটি যে কেবল বহু দিনের বহু অনুভূত অভাব দূর করবে তা নয়, শারীরিক শিক্ষার ক্ষেত্রে এক নূতন আলোকপাত করবে।

আলোচনার সরসতায়, ভাষার মাধুর্যে পুস্তকখানি আগাগোড়াই আশ্চর্য ও সাবলীল হ'য়েছে। এই গ্রন্থটি স্কুল, কলেজ ও সমস্ত শিক্ষণ-প্রতিষ্ঠানের পক্ষে অপরিহার্য্য হবে ব'লেই আমাদের বিশ্বাস।